তোমাকে
নিমাই
ভট্টাচার্য

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

প্রতিভাস
কলকাতা

প্রথম প্রতিভাস প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড,
কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, সুকুমার দে কর্তৃক বাসন্তী প্রেস,
১৯/এ, ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

এই পাইন গাছের আলোয়-ছায়ায় ঘুরে ঘুরেই কেটে গেল সারাটা দিন। কেটে গেল পাখির ডাক শুনে আর দূরের শিবালিক পাহাড় দেখে।

বেশ লাগল। অনেক দিন পর মনটা সত্যি খুশিতে ভরে গেল। বেশ হালকা মনে হলো নিজেকে।

এই পৃথিবী বড় বিচিত্র। তিন ভাগ জল থাকা সত্ত্বেও বড় নিষ্ঠুর। বড় নির্মম। সব কিছু থেকেও কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে গেছে। সেই অদৃশ্য অজ্ঞাত ছিদ্র দিয়েই মানুষকে হারাতে হয় কত কিছু। মাঝে মাঝে ভাল লাগলেও সুর কেটে যায় বড় বেশি। রঙিন বসন্তের পাশে-পাশেই শীতের জড়তা।

আজ কিন্তু বেশ লাগছে। গণ্ডীবদ্ধ সংসারের বাইরে উদার সবুজ প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেশ লাগছে। এই মৌন প্রকৃতি যেন সিদ্ধপুরুষ। সর্বত্যাগী মহাসন্ন্যাসী। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের জোয়ার-ভাঁটা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। একটা মিষ্টি পরিতৃপ্তিতে আমার মনটা ভরে গেল।

বোটানিক্সের পাশ দিয়ে ঘুরতে বেশ লাগছিল। একটা কাঠবেড়ালী সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ। একেবারে আমার মুখোমুখি। হয়ত আগন্তুক দেখে খবর নিতে এসেছে। একবার যেন হাসল। লেজ নাড়তে নাড়তে হাসল। বিদ্রূপের হাসি নাকি? ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমিও হাসলাম। ব্যস! কাঠবেড়ালীটা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল বনের মধ্যে।

আমি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। অপলক দৃষ্টিতে ওর পথের দিকে চেয়ে রইলাম। ছোট্ট একটা জীব। কতটুকুই বা ওর প্রাণ! তবু কত প্রাণচঞ্চল। কত হাসিখুশি। বিদ্যা-বুদ্ধি বিবেচনা থাকা সত্ত্বেও আমরা কি অত প্রাণচঞ্চল হতে পারি? অত সহজ সরল?

আশপাশের গাছপালা আর ঐ দূরের শিবালিক আরো ভাল লাগল। ভাল লাগল নিজেকেও। পর পর কয়েকবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সারা বুকটা ভরিয়ে নিলাম।

কাঠবেড়ালীটার পথ চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হয়ত কয়েক মিনিট, হয়ত আরো বেশি। পেছন থেকে গাড়ির হর্ন শুনে সরে দাঁড়ালাম। গাড়িটা চলে গেল। আমিও হাঁটতে শুরু করলাম।

বোটানিক্স পেছনে ফেলে এলাম বিরাট সবুজ মাঠের মাঝে। দূরে এফ আর-আই-এর মেন বিল্ডিং। পাষাণে গাঁথা অত বড় বিল্ডিংটাকেও খারাপ লাগল না।

বেসুরো মনে হলো না। মনে হলো এই বিরাট সবুজ প্রান্তর আর চারপাশের অজস্র বনানীর দ্বাররক্ষক।

পেছন রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এফ-আর-আই-এর মেন বিল্ডিংকে ডানদিকে রেখে এসেছি টের পাইনি। সামনেই বোধহয় হোস্টেল। আবার দাঁড়ালাম। ছোট্ট রাস্তা কিন্তু ভারী সুন্দর। দু পাশে ক্রিস্টমাস ট্রির মত গাছগুলি সাজান। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। সারাদিনের শেষে পাখির দল ফিরে এসেছে নিজেদের আস্তানায়। ওদের উত্তেজনার কলগুঞ্জন ভেসে এলো গাছের ফাঁক থেকে।

কতদিন পরে পাখির কিচির-মিচির শুনলাম! বেশ লাগল।

গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। লাউঞ্জ পার হয়ে ডানদিকে কোণার ঘরে চলে গেলাম। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরালাম। সিগারেট টানতে টানতে ডানদিকে তাকাতেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলাম। বার বার দেখলাম। ভাল লাগল।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে গেলাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার হাসলাম। বাঃ বেশ লাগছে তো!

দরজায় নক করে বেয়ারাটা ঘরে আসতেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

'সাব চায়'।

চায়ের ট্রে টেবিলের ওপর রেখে বেয়ারা চলে গেল।

আমি আবার আয়নার সামনে ফিরে এলাম। মনে হলো বহুদিন পর নিজেকে দেখছি। বেশ ভালই লাগল।

আয়নার সামনে কয়েক মিনিট থাকার পরই বুঝলাম, আমার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। সেই দুশ্চিন্তা আর হাহাকার ভাব নেই কোথাও। চোখ দুটো আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখলাম। বিউটি কনটেস্টের মেয়েদের মত ঘুরতে ঘুরতে নিজেকেই নিজে পরীক্ষা করলাম।

আরো ভাল লাগল নিজেকে। ভাল করে বাঁচার নেশায় হঠাৎ আমি পাগল হয়ে উঠলাম। হব না? কত দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে অবহেলা করেছি! দেহ মনের প্রতি অবিচার আর অত্যাচার করেছি বছরের পর বছর। পথভ্রষ্ট পথিকের মত অন্ধকার অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। মাথাটাও কি ঠিক ছিল? সব কিছু গোলমাল হয়েছিল। ওলট-পালট হয়েছিল সব হিসাব-নিকাশ। ভেবেছিলাম ঘটনার স্রোতে ভেসে যাব। এতদিন কিভাবে বেঁচে ছিলাম জানি না। জানি না কিভাবে সেই অন্ধকার দিনগুলো কাটালাম। আজ এই আয়নায় নিজেকে দেখে বুঝলাম সেই অন্ধকার অরণ্যে বিচরণ করেও বেঁচে আছি।

অনেকদিন নিজেকে ভালবাসিনি বলে আজ সত্যি নিজেকে বড় ভাল লাগল। নিজেকে ছাড়া আর কাকেই বা ভালবাসব এই দুনিয়ায়? মানুষকে তো একটু কিছু

নিয়ে বাঁচতে হবে। আমি ছাড়া আমার আর কে আছে?

আজ নয়, অনেকদিন আগে একবার মনে হয়েছিল বাঁচব কি? কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। শুধু এইটুকু জেনেছি মৃত্যু হলেই পরাজয় হবে। সব কিছুর পরাজয়। তাইতো মরতে চাইনি, মরতে পারিনি। মরতে আমি চাই না! মরতে আমি পারব না। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার আগে মৃত্যু? অসম্ভব।

দরজায় নক করার আওয়াজ হলো। ঘুরে দাঁড়ালাম।

'সাব চায় পি-লিয়া?'

'নেই।'

একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চা খেতে গেলাম। বেয়ারাটা চলে গেল।

চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কি যেন ভাবছিলাম, এমন সময় চৌকিদার এসে বললো, 'সাব, আপকা টেলিফোন।'

আমার টেলিফোন? অবাক হলাম। 'হামারা টেলিফোন?'

'হা, সাব।' চৌকিদার একটু থেমে বলল, 'দো-নাম্বার সাব আপকে বুলায়া।'

'দো নাম্বার সাব কোন্ হ্যায়?'

'বাঙালী রয় সাব।'

আর কথা না বাড়িয়ে উঠে গেলাম। টেলিফোন তুলে বললাম, 'হ্যালো।'

'নমস্কার। আমি রয় কথা বলছি...'

'আমি ঠিক সন্ধ্যার আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনি বোধহয় একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন'

'আপনি এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট আই সুড হ্যাভ মেট ইউ আর্লিয়ার বাট..'

অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলাম। যাঁর সাহায্যে ও সহযোগিতায় আমাকে এখানে কাজ করতে হবে আমারই আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য ছিল কিন্তু...

'ছি ছি, আপনাকে এত কষ্ট দিলাম'।

—ভাবছিলাম মার্জনা চাইব কিন্তু সেকথা বলার আগেই মিঃ রয় বললেন, 'ইফ্ ইউ্ আর নট বিজি চলে আসুন না আমার এখানে। মোটে তো সাড়ে ছটা বাজে।'

'না, না, বিজি আর কি। তবে ছুটির দিনে আপনাকে বিরক্ত করব?'

ডেরাডুন রওনা হবার আগে প্ল্যানিং কমিশনের ডক্টর চৌবে বলেছিলেন, 'ডোন্ট ওরি। ইউ উইল গেট অ্যান একসেলেন্ট জেন্টলম্যান টু হেলপ ইউ।'

দু একজনের মুখে রাই-রয় শুনেছিলাম। কিন্তু তিনি পাঞ্জাবি না ক্রিশ্চিয়ান বুঝতে পারিনি। এত দূরদেশে এসে যে বাঙালী মিঃ রায়কে পাব, তা সত্যি আশা করিনি। তাছাড়া জানব কেমন করে বাঙালীকে সর্বত্র পাওয়া যায়? ছেলেবেলা থেকে তো শুনে আসছি বাঙালী মাত্রেই মায়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকে,

সে গান গায়, কবিতা লেখে বিপ্লবী হয়, কেরানী হয়, জেলে যায়, ফাঁসীতে চড়ে কিন্তু ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না।

মুসৌরী এক্সপ্রেসে আজ সকালে এসেছি। রবিবার। ছুটির দিন। নিজের খুশি মত ঘুরে বেড়িয়েছি। ছুটির দিনে খোঁজখবর করে কোন অফিসারকে বিরক্ত করতে সাহস হয়নি, মনও চায়নি। কিন্তু আগে থেকে যদি জানতাম উনি বাঙালী তাহলে হয়ত-একবার ঘুরে আসতাম। আবার না যেতেও পারতাম। একে প্রবাসী বাঙালী তারপর অফিসার। কি বিচিত্র তাঁর মনোবৃত্তি তা জানা অসম্ভব। প্রবাসী বাঙালী খুব বেশি দেখিনি। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা পুরো সাহেব নয়ত বাংলাদেশের বাঙালীর চাইতেও খাঁটি বাঙালী। মাদ্রাজী আই-সি-এস-এর বাড়িতে মাদুরে বসে গল্প করা হয় কিন্তু বাঙালী এল-ডি-সি ডাইনিং টেবিলে চচ্চড়ি না খেলে লজ্জায় সমাজে মিশতে ভয় পায়। ব্যতিক্রম আছে বৈকি। কিন্তু মিঃ রায় যে ব্যতিক্রম, তা জানব কেমন করে?

দূরে ছাই! একলা-একলা থেকে শুধু আজে-বাজে আলতু ফালতু চিন্তা করতে শিখেছি। মানুষের ভিড়ের মধ্যে থাকলে এত আজেবাজে চিন্তার অবকাশ থাকে না। তাছাড়া প্রাণ খুলে কথা বলার কাউকে পেলে নিজের মনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা জমতে পারে না। কতকাল প্রাণ খুলে কথা বলি না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে না? গৌরচন্দ্রিকাতেই তো নাটক-সমাপ্ত হলো।

বুশ সার্টটা চেঞ্জ করে নিলাম। অবিন্যস্ত চুলের ওপর দিয়ে চিরুনিটাকে টেনে নিলাম। তবুও যেন ঠিক হলো না। দুটো হাত দিয়ে ঠিক করলাম। তোয়ালে নিয়ে মুখটাকে ভাল করে পরিষ্কার করলাম। সুটকেশ থেকে একটা পরিষ্কার রুমাল বের করে প্যান্টের পকেটে পুরলাম। ফাইন্যাল চেক্ আপের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে হাতের ঘড়িটায় নজর পড়ল। চমকে উঠলাম। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম।

সুন্দর পিচের রাস্তা! কিছু দূরে ইলেকট্রিক আলো। তবুও রাস্তাগুলো বেশ অন্ধকার। দুপাশেই গাছপালা! মাঝে মাঝে অফিসারদের বাংলো। কাঁচের জানালায় পর্দা দেওয়া সত্ত্বেও একটু একটু আলো দেখা যায়। নতুন কনে বৌ-এর মত আলোগুলো যেন ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। এত গাছ পালার মাঝে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে দ্বিধা করছে।

এমন রাস্তা দিয়েও কেউ বেড়াতে চায় না? এই আবছ আলো, এই পরিবেশে কি দুজনে মিলে বেড়াতে কারুর ইচ্ছা করে না? এখানে কি কোন মেয়ে নেই, যে গান গাইতে পারে, ভালবাসতে পারে? একলা গিয়ে পুরীর জগন্নাথ দর্শন করা যায় কিন্তু দীঘার সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র-সৈকতে কি একলা বেড়ান যায়?

এফ-আর-আই-এর রাস্তা দিয়েও ঠিক একলা হাঁটতে ভাল লাগে না। বড়

বেমানান বড় বেসুরো মনে হয় নিজেকে। আমারও মনে হলো। কিন্তু আমি তো অসহায়। আমার শূন্যতা তো পূর্ণ হবার নয়। তা তো জানি। তবু এই মুহূর্তে এই সুন্দর আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন চাইল পূর্ণ হতে।

জানি যে পূর্ণতা আমি চাই, তা কোনোদিন পাব না। পেতে পারি না। যে অন্ধ, যে দৃষ্টিহীন, সে তো জানে এই রঙিন পৃথিবীর কিছুই সে দেখতে পাবে না, পেতে পারে না। তবুও ইচ্ছা তো হয়। মনে মনে স্বপ্ন তো দেখে। চিরদিন চিরকালের জন্য না হোক, একবার একটি মুহূর্তের জন্যও যদি সে রঙিন পৃথিবীর দেখা পেত তবুও তার সান্ত্বনা থাকত। কলকাতার ফুটপাতের পাশে ছেঁড়া ন্যাকড়া মুড়ি দিয়ে যারা জীবন কাটায়, তারা যদি মাত্র একটি রাত্রির জন্যও ঐ মনুমেন্টের সমান বড় বড় প্রাসাদ বাড়িতে ঘুমুতে পারত। আহাহা জীবন সার্থক হতো। জন্ম সার্থক হতো।

আমি তা চাই না। চাইতে পারি না। তবুও মনে হলো এই মুহূর্তে যদি কেউ পাশে থাকত, যদি একটু হাসত, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত আমার বুকের ওপর। অথবা? অথবা শুধু আমার হাতটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে গাইত...

ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভব সব বুঝি। সবাই বোঝে। তবুও মানুষের মন তো। সে তো মুক্ত বিহঙ্গ। উড়ে বেড়ায় মহাকাশের কোলে। কোন শাসন নেই, কোন নিয়ম নেই, যত্রতত্র তার বিচরণ। তাইতো পুত্রশোকাতুরা জননী স্বপ্ন দেখে যদি তার প্রাণের দুলাল একটিবার, মাত্র একটিবারের জন্য দেখা দিত, মা বলে ডাকত। শোকাতুরার মত আমিও কি যা তা ভাবছি?

সামনের বিরাট বারান্দাতেই মিঃ রায় আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন, আসুন।'

বারান্দার ডান দিকে মিঃরায়ের স্টাডি। সে ঘরেই আমরা গেলাম। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেওয়ালের চারপাশ বইতে ভর্তি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলেও অনেক কাগজ-পত্তর বই-টই রয়েছে। দুটো-একটা ছবিও নজরে পড়ল। স্বদেশের নয়, বিদেশের।

মিঃরায় টেবিলের সামনের চেয়ারে বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন। আমি না বসে একবার ঘরের চারপাশ ঘুরে বই-পত্তর দেখে নিলাম। ইংরেজি, বাংলা সাহিত্যের বই প্রচুর। ছবি কটাও দেখলাম। একটা লন্ডনের বুঝতে অসুবিধা হলো না। চেহারা দেখেই বুঝলাম ছাত্র-জীবনের ছবি। বুঝলাম আমার মত শিলচর গুরুচরণ কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ওর শিক্ষাজীবন শেষ হয়নি।

'আরে বসুন বসুন। কি দেখছেন?'

'বাঃ। আপনার তো ভারী সুন্দর কালেকশন।'

'কি আর কালেকশন করেছি একসেপ্ট সাম বুকস অ্যান্ড এ ডিভোটেড ওয়াইফ...'

মিঃ রায় হো হো করে হেসে উঠলেন। আমিও না হেসে পারলাম না। ভারী মজার লোক তো! আমাদের দেশে সাধারণত বিদ্বান-পণ্ডিতরা রসিক হন না, আবার রসিকেরা বিদ্বান হন না। যারা জীবন উপভোগ করতে পারেন রসিকতা তাদেরই। তাইতো পশ্চিমের পণ্ডিতরা রসিক। আমাদের-দেশের পণ্ডিতরা হাসতেও দ্বিধা করেন।

'আপনি তো বেশ হাসতে পারেন।'

হাসতে হাসতেই মিঃ রায় বললেন, 'হাসব না কেন?'

'আমাদের দেশের গুণীজ্ঞানীরা ঠিক হাসতে জানেন না।'

'আমি তো, গুণী-জ্ঞানী নই।'

'শুধু গুণী-জ্ঞানী কেন, আমাদের দেশে যাঁরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরাও হাসতে জানেন না।'

হাসি হাসি মুখেই মিঃ রায় জানতে চাইলেন, 'আমাকে কি খুব গুণী-জ্ঞানী বা সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'মাই গড।' মিঃ রায় আবার হাসতে শুরু করলেন।

আমিও হাসলাম।

একটু পরে উনি আবার বললেন, 'পঁচিশ বছর চাকরির পর ষোল শ পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত?'

আজকের যুগে আমেরিকান বা রাশিয়ান আর্মির গোপনতম খবর সংগ্রহ সম্ভব, কিন্তু পুরুষের মাইনে বা মেয়েদের বয়স জানা প্রায় অসম্ভবই থেকে গেছে। যে পুরুষ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে নিজের মাইনে বলতে পারে, তার চাইতে সরল মানুষ পাওয়া আজ দুষ্কর। বুঝলাম, মিঃ রায় শুধু হাসতেই জানেন না, প্রাণ খুলে কথাও বলতে পারেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনার এখানে এসে মনে হচ্ছে সত্যি আমার বৃহস্পতির দশা শুরু হলো।'

'কেন বলুন তো?'

'সময়টা ভাল কাটবে বলে মনে হচ্ছে...'

'কেন এর আগে কি রাহুর দশা ছিল?'

'আপনি জ্যোতিষীও জানেন নাকি?'

মিঃ রায় হেসে ফেললেন। 'আপনি দেখছি নামকরা ক্রিমিন্যাল ল' ইয়ারের মত ন্যাকা ন্যাকা প্রশ্ন করে আমার সব সিক্রেট জেনে ফেলার চেষ্টা করছেন।'

বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ মজা লাগল ওর কথা শুনে। 'তার মানে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে ভেতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মিঃ রায় একটু জোর করেই ডাক দিলেন, 'শুনছ?'

কোন সাড়াশব্দ নেই। আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম।

ছেলেবেলায় মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গমে থিয়েটার দেখার কথা মনে পড়ল। রাজপ্রাসাদের দৃশ্য। মন্ত্রী, সেনাপতি থেকে শুরু করে নর্তকীর দল পর্যন্ত স্টেজে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন অথচ কারুর মুখে একটি শব্দ নেই। এমনকি কেউ হাত-পা পর্যন্ত নাড়ছেন না। চোখে পাতাও পড়ছে না কারুর। কোন মহানায়কের প্রত্যাশায় ওরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। শুধু কি তাই? ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বেহালার একটু ক্ষীণ শব্দও শুনতে পেতাম না। মনে হতো কুমারটুলির কোনো শিল্পীর তৈরি রাজ-দরবারের দৃশ্য দেখছি। তারপর হঠাৎ রাজবেশে, ভূপেন রায় বা নির্মলেন্দু লাহিড়ী অথবা রাজমহিষীর বেশে সরযূবালার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজদরবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত। পেছনে থেকে ভেসে আসত সুমধুর সঙ্গীত। শুরু হতো নাটক।

মিসেস রায়ের আগমন হতেই আমরা দুজনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

আনন্দে খুশিতে হাসিমুখে মিঃ রায় বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললাম, 'আমি সাগর চট্টোপাধ্যায়।'

মিঃ রায়ের মত মিসেস রায় ততটা ফর্সা না হলেও বেশ সুন্দরী। বয়স চল্লিশের ঘরের শেষের দিকে হলেও দেহে বেশ একটা বাঁধুনী আছে, মুখে লালিত্য আছে। তার চাইতেও বড় কথা চোখের কোণায়, ঠোঁটের পাশে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে আছে। মাধুর্য আর গাম্ভীর্য মিলে মিসেস রায়কে প্রথম দর্শনে বেশ লাগল।

মিসেস রায় হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আপনার নামটি তো ভারী সুন্দর।'

আমি মাথা নিচু করে একটু মুচকি হাসলাম। বললাম, 'দোকানের সুনাম না থাকলেই সাইনবোর্ডটা একটু বড় আর জমকালো করতে হয়।'

মিসেস রায় হাসলেন।

মিঃ রায় বললেন, 'লাভলি।'

মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম কে রেখেছিলেন?'

'আমার মা।'

'হঠাৎ সাগর নাম রাখলেন?'

আমি একটু হাসলাম। দুঃখের হাসি কিন্তু ওরা ঠিক বুঝলেন না। অনেক দিন কোন সন্তান না হওয়ায় মা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তারপর কোন এক সাধু নাকি ওকে বলেছিলেন, 'পৌষ সংক্রান্তিতে সাগর-মেলায় গিয়ে পুজো দিতে...'

মিঃ রায় মাঝপথে জানতে চাইলেন, 'আপনার মা গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ'। ঠিক পরের বছর পৌষ সংক্রান্তির ভোরেই আমার জন্ম'

আমার বলা শেষ হয়নি। পরের কাহিনীটুকু বলবার আগেই মিসেস রায় একটা

ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি আশ্চর্য।'

মিঃ রায় বললেন, 'রিয়েলি?'

'হ্যাঁ।' এক মুহূর্ত থেমে একবার নিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'আর সেই পৌষ সংক্রান্তির সন্ধ্যাতেই আমার মা মারা গেলেন।'

স্বামী-স্ত্রী দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'সে কি?'

ঘরের থমথমে আবহাওয়া কাটতে একটু সময় লাগল।

মিসেস রায় আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাবেন না কফি?'

'যা হয়।'

'কোনটা পছন্দ করেন?'

'পছন্দ?' একটু না হেসে পারলাম না। 'ঠিক পছন্দ-অপছন্দ করতে তো শিখিনি।'

'যে কদিন এখানে আছেন সে কদিন অন্তত পছন্দ-অপছন্দের পূর্ণ অধিকার রইল আপনার।'

আমি মাথা নিচু করেই আছি। মিসেস রায় আবার জানতে চাইলেন, 'চা আনব, না কফি?'

'কফি।' আমি ছোট্ট উত্তর দিয়ে আবার মাথা নিচু করে রইলাম। বুঝলাম মিসেস রায় ভেতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ মিঃ রায়ও চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনার বয়স কত?'

'পঁচিশ।'

'ওনলি? আপনি তাহলে ঠিক আমার ছেলের বয়সী।'

'তাই নাকি?'

বুঝলাম মিঃ রায়ের ছেলে আছে কিন্তু এই বাংলো-বাড়ির শান্ত আবহাওয়া দেখে মনে হলো এখানে ওরা দুজনেই থাকেন।

মিঃ রায় এবার আমার কাজকর্মের খবর নিলেন। 'প্ল্যানিং কমিশনে কতদিন আছেন?'

'মাত্র ছ-মাস।'

'ছ' মাস?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে কি করতেন?'

'টুকটাক ছোটখাট অনেক চাকরি-বাকরি করেছি।'

'প্ল্যানিং কমিশনে ঢুকলেন কি করে?'

'আমার এক পুরাতন অধ্যাপক একবার প্ল্যানিং কমিশনের অনুরোধে কলকাতার একটা সোসিও-ইকনমিক সার্ভে করেন। তখন আমিও ওঁর সঙ্গে কাজ

করছিলাম। সেই অধ্যাপকের সুপারিশেই প্ল্যানিং কমিশনে ঢুকেছি।'

মিঃ রায় চশমাটা ঠিক করে আবার প্রশ্ন করলেন, 'তা আপনাদের সোসিও ইকনমিক স্পেশাল সার্ভে ইউনিটের কাজ কি?'

পঞ্চাশ জনকে নিয়ে এই ইউনিট। আমরা এক-একজনের দুটো তিনটে বা চারটে এরিয়ার কাজ করব। প্রথমে দেখব এই এক-একটা এরিয়ার গত দশ বছরে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ প্ল্যানের ইমপ্যাক্ট কি হয়েছে, কি হতে পারত এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া দরকার।'

'তাহলে তো বেশ দায়িত্বপূর্ণ ও ইন্টারেস্টিং কাজ।'

আমি হেসে বললাম, 'ঐ যা বলেন আর কি।'

'আপনি কোন্ কোন্ এরিয়ায় কাজ করবেন?'

'এই ইউ পি-র ডেরাডুন বেল্ট ছাড়া মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর—সাঁতরা প্রতাপগড় এরিয়া।'

'আর কোথাও?'

'তারপর বোধহয় উড়িষ্যায়।'

'এই এরিয়াগুলো আপনি নিলেন কেন?'

মিসেস রায় ঘরে ঢুকলেন। পেছনে পেছনে ট্রে হাতে চাকর। টেবিলে কফি আর মিষ্টির প্লেট নামিয়ে রাখলেন।

আমি মিঃ রায়কে বললাম, 'এই এরিয়াগুলোতে নানা ধরনের লোক পাব বলে'।

'যেমন?'

'ডেরাডুন ইজ অ্যান ইমপর্ট্যান্ট বিজনেস সেন্টার। বড় বড় ব্যবসাদার পাব। মিলিটারি একাডেমীর জন্য হাই অ্যান্ড লো মিলিটারি অফিসার পাব, আপনাদের এফ-আর-আই. পাম্পের অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে টেকনিসিয়ান্স, সাইনটিস্টস আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাব। তাছাড়া সাধারণ অফিস কর্মচারী ছাড়াও ভ্যালি, প্লেন ও হিল এরিয়ার বহু লোক পাব।'

'দ্যাটস্ রাইট।' মিসেস রায় কফি আর মিষ্টির প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন 'এই নিন।' প্লেটে চারটে বড় বড় রসগোল্লা দেখে বললাম, 'এখন এত মিষ্টি খাব না।'

'মোটেই এত না।'

মিঃ রায় এগিয়ে এলেন স্ত্রীকে সাপোর্ট করতে, 'ওকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কক্ষনো কিছু বলবেন না। সব কিছু নিজের হাতে তৈরি। সুতরাং না বললেই মোশান অব নো কনফিডেন্স বলে মনে করবে।'

আমি কি বলব? শুধু হাসলাম। আমি আর মিঃ রায় খেতে শুরু করলাম। মিসেস রায় টেবিলের একপাশে একটা চেয়ারে বসলেন। আমাদের মিষ্টি খাওয়া

হলে কফি এগিয়ে দিতে দিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

'তিন-চার মাস।'

'গেস্ট হাউসেই থাকবেন?'

'হ্যাঁ, তাইতো ব্যবস্থা হয়েছে।'

কফি খাওয়া শেষ হলো।

মিসেস রায় এবার জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনাকে নাকি অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে?'

'বেশি দূরে যেতে হবে না। তবে কাছাকাছির মধ্যে কিছু ঘোরাঘুরি করে অনেক লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে।'

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, 'মেয়েদেরও ইন্টারভিউ করবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'পুরুষদের সঙ্গে কথা বললেই তো ফ্যামিলির আয়-ব্যয় বা স্টান্ডার্ড অব লিভিং এর সব খবর জানতে পারবেন। তাহলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কি দরকার?'

'নানা কারণে দরকার। পুরুষদের যে ইনকামই হোক না কেন, অ্যাকচুয়াল স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং—আই মীন অব দি ফ্যামিলি জানতে হলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাছাড়া পুরুষের পুরো ইনকাম ফ্যামিলিতে নাও আসতে পারে।'

মিসেস রায় বললেন, 'তার মানে?'

'আয় বেশি হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের ব্যয়ের রাস্তাও বাড়তে পারে। তারা ফ্যামিলিতে খরচ না করে সিনেমা দেখতে পারে, মদ খেতে পারে, চরিত্রহীন হতে পারে, দামি জামাকাপড় পরতে পারে বা আরো অনেক কিছু হতে পারে....'

মিসেস রায় সমর্থন জানালেন আমার বক্তব্যকে, 'ঠিক বলেছেন।'

'তাছাড়া আরও অনেক কারণে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

মিসেস রায়ই প্রশ্ন করলেন, 'আর কি কারণ?'

'হেলথ্, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, ফুড হ্যাবিট বা ফ্যামিলি প্লানিং নিয়েও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, 'কিন্তু মেয়েরা কি আপনাকে এসব কথা বলবে?'

'সবাই নিশ্চয়ই বলবেন না। তবে লোক্যাল দোকানদার, কেমিস্ট শপ, ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল, স্কুল, রিক্সাওয়ালা, ট্যাকসির ড্রাইভার, পুলিশ স্টেশন থেকেও অনেক কিছু জানা যাবে।'

ওরা-স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাসলেন। মিসেস রায় মন্তব্য করলেন, 'আপনি তো দেখছি অনেকের অনেক গোপন কথা জেনে যাবেন।'

'গোপন খবর ঠিক নয়, ফ্যামিলি প্যাটার্ন কিছুটা জানব। অফিসে গিয়ে খোঁজ করলেই জানা যায় কার কত মাইনে কে কত লোন বা অ্যাডভান্স নিয়েছেন।

দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায় কে, কত টাকার জিনিস কেনেন বা কে ধারে, কে নগদে কেনেন। সব মিলিয়ে লোকের প্যাটার্ন অব লিভিং জানা যাবে, জানা যাবে গত দশ বছরে কোন্ ধরনের লোকের ভাল হয়েছে বা মন্দ হয়েছে।'

মিঃ রায় এবার জানতে চাইলেন, 'আপনি কি ম্যারেড ছেলেমেয়ে বা যাঁরা চাকরি-বাকরি করেন তাঁদেরই ইনফরমেশন জোগাড় করবেন?'

'না, না, তা কেন করব? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে গ্রোন-আপ ছেলেমেয়েদের খবরই বরং বেশি দরকার।'

ডান হাতের ওপর মুখের ভর রেখে মিসেস রায় বললেন, 'কেন?'

'ভবিষ্যতের সব পরিকল্পনাই তো মুখ্যত ওদের নিয়েই হবে।'

মিঃ রায় এবার ওঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাগো, আর এক কাপ কফি দেবে নাকি?'

আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না, না, আর কফির দরকার নেই এবার আমি উঠি। আপনাদের অনেক দেরি করে দিলাম।'

মিঃ রায় হাসলেন। মিসেস রায় বললেন, 'কথা না বলে আমার তো বোবা হবার উপক্রম।'

'কেন? এখানে তো বহু লোক আছেন।'

মিঃ রায় বললেন, 'তা ঠিক। তবে অধিকাংশই ইনক্রিমেন্ট, ডিয়ারনেস অ্যালউন্স আর ট্রান্সফার প্রমোশনের গল্প করতেই পছন্দ করেন। তাই লোক্যাল কলিগস্ বা ফ্রেন্ডদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক আনন্দ পাই না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সব সরকারি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলোনীরই এই এক দোষ। দুর্গাপুরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা মিউজিক কনফারেন্সেও জেনারেল ম্যানেজার সভাপতিত্ব করবেনই।'

'ঠিক বলেছেন', মন্তব্য করলেন মিঃ রায় আর হাসি হাসি মুখে সমর্থন জানালেন ওঁর ডেডিকেটেড ওয়াইফ।

মিসেস রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বসুন। আর এক কাপ কফি খেয়ে যান।'

আর এক কাপ কফি খেয়েই উঠলাম। বিদায় নেবার সময় মিঃ রায়কে বললাম, 'সকালেই আপনার অফিসে আসছি।'

'আমি বরং অফিস যাবার পথে আপনাকে তুলে নেব।'

'আপনি আবার কেন ঘুরতে যাবেন?'

মিসেস রায় হেসে ফেললেন, 'রোজ দেড় মাইল করে গাড়ি চললে তো ব্যাটারীর চার্জ থাকে না, তাই সুযোগ পেলেই...'

মিঃ রায় শত্রু-বিমানকে বাধা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ফাইটার নিয়ে উড়লেন।

'কেন ? গাড়ি নিয়ে কি শুধু অফিস যাতায়াতই করি ? তোমাকে নিয়ে বেরোই না ?'

'আমাকে না নিয়ে বেরুলে তোমার গাড়ি ধাক্কা দেবে কে ?'

বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে আমি বিধানসভা লোকসভার স্পীকারের মত গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলাম, 'হাউস অ্যাডজর্নস টিল টুমরো ইভনিং।'

মিসেস রায় হাসলেন। মিঃ রায় প্রায় চীৎকার করে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

হাত জোড় করে মিসেস রায়কে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'চলি।'

'আসুন'।

যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই পথ দিয়েই ফিরে এলাম। সেই আবছা অন্ধকার রাস্তা, সেই নির্জনতা, সেই শান্ত পরিবেশ। দুপাশে সেই গাছপালা। কত শত পাখি আছে এইসব গাছের ডালে ডালে, কিন্তু সবাই মহাশান্তিতে বিশ্রাম করছে। যেন কারুর কোন অভিযোগ নেই, কারুর জীবনে কোন হাহাকার নেই। আমি শুধু একা-একা হেঁটে চলেছি। হয়ত ওদের শান্তি নষ্ট করছি।

তাছাড়া বড় বেমানান মনে হলো নিজেকে। নিঃসঙ্গতার যেন কোন স্থান নেই এই পরিবেশে, এই দুনিয়ায়।

অফিসারদের বাংলোর আলো আরো কমে গেছে। দুটো একটা জানালাতেই আলো দেখা যাচ্ছে। তাও বেশ কম আলো। পর্দার মধ্যে দিয়ে ঠিক ধরতে পারছি না। তবে মনে হলো অনেকের ঘরে রঙিন আলো জ্বলছে। যাঁরা সারাদিন ডিয়ারনেস-ইনক্রিমেন্টের নেশায় পাগল ছিলেন, তাঁরাও বোধহয় এখন নেশায় মশগুল।

ঐ আলো দেখতে দেখতে আমি আস্তে আস্তে চলেছিলাম গেস্ট হাউসের দিকে। বেশ লাগছিল ঐ বাংলোগুলোর বেডরুমের আলো দেখতে।

এই পথ দিয়ে যখন গিয়েছিলাম তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। আর এখন বেশ রাত হয়েছে। ল্যাম্প-পোস্টের আলোর পাওয়ার কমে যায়নি, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। তাই রাস্তাতেও আরও বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে। যখন এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম, তখন বিশেষ কোন মানুষ দেখিনি, এখনও দেখছি না। তখনও কোন হৈ হুল্লোড় ছিল না, এখনও নেই। তবু মনে হলো রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে আরো শান্তি, প্রশান্তি অনুভব করতে পারছি। আমি একলা-একলা হাঁটছি। আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। আমি নিজেকে আরো ভালো করে দেখতে পারছি। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যতটা দেখতে পেয়েছি, তার চাইতে যেন আরো ভাল করে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। আরো স্পষ্ট করে নিজের হৃদয়-স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আমি কথা বলছি না, তবু মনে হচ্ছে আমার অন্তর থেকে কিছু বেদনা শুনতে পাচ্ছি। বেশ স্পষ্ট বেশ জোরেই যেন শুনতে

পাচ্ছি। শুধু বেদনা কেন? আমার মনের মধ্যে কত অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা বোধহয় চাপা পড়েছিল। এই রাত্রির অন্ধকারে আমাকে এক পেয়ে সেই সব আকাঙ্ক্ষা যেন আমার হৃদয় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কী আশ্চর্য ঐ আবছা-আবছা রঙিন আলোগুলো যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ গেস্ট হাউসের কথা মনে হলো। মনে হলো বেয়ারাটা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে আছে। গেস্ট হাউস তো ফাঁকা। আমার ডিনার খাওয়া না হলে তো ওর মুক্তি নেই।

একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। রাত্রির এই নিবিড়তার মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করল আমার। এমন মুক্তির আনন্দ, এমন শান্তি যেন জীবনে অনুভব করিনি। মায়ের স্নেহের মত রাত্রির অন্ধকার আমার চারিদিক ঘিরে রয়েছে। এতদিন মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকেও ভয় করেছে কিন্তু আজ এই রাত্রিতে, এই অন্ধকারে কোন ভয় সঙ্কোচ নেই আমার।

মানুষ নিঃসন্দেহে সব চাইতে নিজেকে বেশি ভালবাসে। এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে আমি শুধু আমাকেই কাছে পাচ্ছি। সমাজ সংসারের অসংখ্য পরিচিত-অপরিচিতরা আমার কাছে ভিড় করে নেই, আমার দৃষ্টিকে ঝাপসা অন্তরের ভাবভঙ্গিকে বেসুরো করতে পারছে না। প্রাণপ্রিয় আমি এখন নিঃসঙ্গ হলেও পরিপূর্ণ।

আস্তে আস্তে হাঁটছি। মুখ দিয়ে কোন গান গাইছি না কিন্তু একটা মিষ্টি সুর শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু একি! সুরটা অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। ঐ যে পাহাড়ের উপরের লাল লাল রক্তবর্ণ স্যান্ডস্টোনে মোড়া ফতেপুর সিক্রি আগ্রা ফোর্টের মধ্যে থেকে যেমন দরবারী কানাড়ার মিহি মিষ্টি সুর ভেসে আসত দূরের গ্রাম-গ্রামান্তরে, যমুনার পাড়ে, ঠিক তেমনি একটা সুর যেন বহু দূর থেকে আমার বুকের মধ্যে খোঁচা মারছে।

খোঁচা মারছে?' তবে কি? এখন তো আমি একা। সব কিছু বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি আমার সব আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, অনুভূতি আছে, আকাঙ্ক্ষাও আছে। সুরটা যেন হারিয়ে গেছে। না, না হারিয়ে যাবে কেন? আমি নিজেই তো বেসুরো হয়ে পড়েছিলাম। তাইতো সুর দূরে গেছে। ক্ষীণ হয়ে গেছে।

রায়-দম্পতিকে দেখে এই শান্ত পবিত্র অন্ধকার রাত্রিতে ঐ দূরের বাংলোর আবছা রঙিন আলো দেখে আমাকে যেন সুরের নেশায় মাতাল করে তুললো। যে সুরের মূর্ছনায় আমি পাগল হয়েছি, সে সুরের স্বাদ কি আর পাব?

জানি না। সে সব কিছু জানি না, জানতে আমি পারি না, পারব না।

গুরুচরণ কলেজে পড়ার সময় বরাকর নদীর ধারে বা দূরের অরুণাচলে যে সুর শুনেছি, শিখেছি, ভালোবেসেছি, সেই সুরই কি আজ শুনতে পাচ্ছি?

আরো কিছু দূর এগুলাম। গেস্ট হাউসের আলো দেখতে পাচ্ছি। এইতো আর একটু গেলেই গেস্ট হাউসের কম্পাউন্ডে ঢুকব। কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না, এ সেই সুর, নাকি অন্য সুর?

গেস্ট হাউসে ঢুকে পড়েছি। পোর্টিকোর পাওয়ারফুল আলোটা বড় বেশি চোখে লাগছে। আর ভাবতে পারছি না। তাছাড়া আমি যেন আমাকেই হারাচ্ছি। হারাব না? আমি তো এখানে একা নই।

চৌকিদার সেলাম দিল। দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিল। আমি যে অন্ধকারের মানুষ অন্ধকারই ভালবাসি, তা তো ও বেচারা জানে না।

কোথা থেকে বেয়ারাটাও হাজির হয়ে সেলাম দিল। 'সাব খানা তৈয়ার।' আমি কোন জবাব না দিয়ে সোজা ওকে অনুসরণ করে ডাইনিং রুমে গেলাম। খেলাম। সামান্য কিছুই খেলাম।

ফিরে এলাম ঐ ডান দিকের কোণার ঘরে। একটা সিগারেট খেলাম। তারপর জামা-কাপড় বদলে একটা পায়জামা-গেঞ্জি পরলাম। আবার চেয়ারে বসে একটা সিগারেট খেলাম। সারাদিন অনেক ঘুরেছি। ক্লান্ত লাগল। উঠে গিয়ে আলো অফ করে শুয়ে পড়লাম।

আবার চারদিক অন্ধকার। একেবারে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে দিকে নজর পড়ল। দূরের অন্ধকার শিবালিক পাহাড়ের গলায় মুক্তোর মালা দেখলাম। মনে হলো অন্ধকার শিবালিক পাহাড় যেন আমাকে নর্তকী সেজে ডাকছে। ইসারা করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিবালিক পাহাড় আমাকে বশীকরণ করে ফেললো। আমি জানতেই পারলাম না ঐগুলো মুসৌরীর আলো।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে গেস্ট হাউসের সামনের লনে ঘুরে ঘুরে সিগারেটটা শেষ করতেই মিঃ রায় গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন।

আমি এগিয়ে আসতে আসতেই মিঃ রায় গাড়ি পোর্টিকোতে পার্ক করে নেমে এলেন। 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।'

'রাত্রে ঠিক মতো ঘুম হয়েছিলো তো?'

'প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও পরে ঠিকই ঘুমিয়েছিলাম।'

মিঃ রায় একটু উতলা হয়ে উঠলেন, 'কি অসুবিধে হলো বলুন তো?'

আমি হেসে বললাম, 'একে এত সুন্দর বাংলো, তারপর স্প্রীং-এর খাট আর ফোমড্ রাবারের গদী। এত আরামে কি ঘুম আসে?'.

সকাল বেলায় মিষ্টি রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে মিঃ রায় প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন. হাসি থামলে, বললেন, 'ইউ আর এ ভেরী গুড টকার। ভারী মজা লাগে আপনার

কথা শুনতে।'

'এক্ষুনি যাবেন না কি, একটু সময় আছে?'

'কেন বলুন তো?'

'সময় থাকলে এক কাপ কফি খাওয়া যেত।'

'নিশ্চয়ই' বলে মিঃ রায় চৌকিদারকে বললেন, ইধার দো পেয়ালা কফি দেনে বোলাও।'

চৌকিদার দৌড়ে ভেতরে গিয়ে কফির অর্ডার দিয়ে দু-হাতে দুটো গার্ডেন চেয়ার নিয়ে বাইরে এলো। লনের এক ধারে দুটো চেয়ার রেখে আবার ভেতরে গেল, বেরিয়ে এলো একটা টিপাই নিয়ে। আমরা চেয়ারে বসলাম। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। কলকারখানায় সাইরেন বাজে কিন্তু এই ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কেন? একটু অবাক না হয় পারলাম না।

'এমন সুন্দর পরিবেশে সাইরেনের আওয়াজ শুনতে বিশ্রী লাগে না?'

'সকালের সাইরেন সত্যি বিশ্রী লাগে কিন্তু বিকেলে ছুটির সাইরেনটা বিসমিল্লার সানাইয়ের মত মিষ্টি লাগে।'

না হেসে পারলাম না। হাসি থামলে বললাম, 'অনেকের হয়ত সকালের সাইরেনই মিষ্টি লাগে।'

মিঃ রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'ইউ আর পারফেকটলি রাইট।'

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। আমি একবার চুমুক দিয়ে কাপটা নাবিয়ে রাখলাম। উনি কফির কাপে চুমুক না দিয়েই বললেন, 'জানেন মিঃ চ্যাটার্জি, ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের চাইতে বড় ট্রাজেডি হতে পারে না। তাছাড়া আমাদের সোসাইটিতে তো ডিভোর্সের চলন নেই। প্রতিদিনই তিক্ততা বাড়ে, দুঃখ বাড়ে।'

'ঠিক বলেছেন।'

'বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তো দেখছি, বড় দুঃখ লাগে, বড় কষ্ট হয়।' মিঃ রায় একটু চুপ করে আবার বললেন 'আন-হ্যাপি ম্যারেড লাইফের জন্য কত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে মেয়ের লাইফ যে নষ্ট হচ্ছে তা ঠিক-ঠিকানা নেই।'

ওর বক্তব্যের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলাম না। আমার মতামত পরে বলবো। কফির কাপ হাতে তুলে হাসতে বললেন, 'অল রাইট, অল রাইট। দি হোল ইভিনিং ইজ ইয়োর্স।'

আমাদের কফি খাওয়া হতে হতেই এফ-আর-আই-এর নির্জন পথ ঘাটের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের পর্ব শেষ। আর কোন অফিসযাত্রীকে সাইকেল চড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে না। আমরাও উঠে পড়লাম।

মিঃ রায় গাড়িতে উঠলেন। আমি তখনও উঠিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ধাক্কা দেব নাকি?'

গম্ভীর হয়ে উত্তর এলো, 'আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারুর সে অধিকার আছে

নাকি ?'

অফিসে এলাম কিন্তু ঠিক অফিস-অফিস মনে হলো না। লোকজনের চেঁচামেচি করিডোরের কোণায়-কোণায় পানের পিচের ছড়াছড়ি. ভাঙা নোংরা টেবিল, শ্মশানঘাটের পরিত্যক্ত কাঁথার মত ফাইলের স্তূপ, না দেখলে ঠিক অফিস বলে মনে হয় না। এখানে সে সব কিছুই দেখলাম না। এত বড় বিল্ডিং অথচ কোথাও একটা পোস্টার নেই! দেয়ালে একটাও শ্লোগান নেইত! আশ্চর্য!

তাই তো আমি বললাম, 'আমাদের ওদিককার লোকজন আপনাদের এই অফিস দেখলে মনে করবে এটা বোধহয় স্যানাটোরিয়াম।'

'তা বটে।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো নানা বিষয়ে। একবার চা খাওয়াও হলো। তারপর কাজকর্মের কথা শুরু হলো।

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, 'কাজকর্ম সম্পর্কে কোন প্রোগ্রাম করেছেন কি ?'

'না।'

'কিভাবে করবেন ভাবছেন ?'

'প্রথম কয়েক দিন চারদিক একটু ঘুরেফিরে দেখব আর কিছু কিছু লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার চেষ্টা করব। তারপর অ্যাকচুয়াল কাজ শুরু করব।'

সোসিও-ইকনমিক সার্ভের রিপোর্ট লেখার জন্য ডুন ভ্যালীর লোকজনের সঙ্গে খাতির ভালবাসার সম্পর্ক দরকার হবে না, তা আমি জানতাম। এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়লেই কাজ শুরু করা সম্ভব। কিন্তু মন তা চাইল না। শেষ রাত্রে বিয়ের লগ্ন হলেও বরযাত্রীরা হাজির হয় সন্ধ্যার পরই। শুধু বিয়ে করাই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে শেষ রাত্তিরে এলেও চলত। শালীদের তির্যক চোখের চাহনি আর বন্ধুদের সরস মন্তব্যও দরকার। ভাল লাগে। পরিবেশ সৃষ্টি করে, মনকে মাতাল না করলেও মদির করে তোলে।

তাই তো আমিও চাইছিলাম এই শিবালিক পাহাড়ের কোলে শাল-পাইনের ছায়ার-ছায়ার ঘুরে বেড়াতে। যে কাঠবেড়ালীটা সেদিন দিন-রাত্রির সন্ধিলগ্নে আবছা-আবছা আলো ছায়ায় আমাকে দেখা দিয়ে ঐ শাল-পাইনের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল, তার সঙ্গে মিতালী করতে ভীষণ ইচ্ছা করছিল।

আর ?

আর ঐ শাল-পাইনের বনে আলো-আঁধারের খেলা দেখতে-দেখতে যারা শৈশব-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব কাটাচ্ছে, তাদের একটু ভালভাবে জানতে চাইছিল আমার মন। যাদের সুখ-দুঃখের বিচার করব সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে, তাদের ভাল করে দেখব না ?

আরো একটা কারণ ছিল। গত রাত্রির অন্ধকারে যেভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছি, নিজেকে ভালবেসেছি, তার স্বাদ আরও একটু ভাল করে

অনুভব—উপভোগ করব না? দিনের বেলা মানুষের হাহাকারে বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস নিলে বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা করে, অতৃপ্তি লাগে। নিখিল ব্যানার্জি সেতারে কোমল রেখাব আশাবরিতে আলাপ করলে মনটা যেমন অব্যক্ত ব্যথায় ভরে যায়, দিনের বেলা মনটায় ঠিক তেমনি ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে? কালকের মত নির্জন নিশীথ রাত্রে? বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে কত ভাল লাগে, কত শান্তি কত আরাম। আঃ। এক্ষুণি যদি সূর্য অস্ত যেত? পৃথিবীটা যদি অন্ধকারে ঢেকে যেত?

আমার প্রায় অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।

মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো?'

'না, কিছু না।'

'তাহলে দু-চার দিন একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিন' একটু থেমে বললেন, 'সেই ভাল। কয়েক দিন একটু প্রাণ খুলে আড্ডা দিই, তারপর কাজকর্মের কথা ভাবা যাবে। কি বলুন?'

মিঃ রায় কথা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন। আমি শুধু হাসলাম। মুখে কিছু বললাম না।

'হাসলেন কেন?'

'বিশেষ কোন কারণ নেই।'

'তবুও?'

'একে আড্ডা তারপর রসগোল্লা—কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করবে তো?' মিঃ রায় হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিক আছে। নো মোর রসগোল্লা বাট ছানার জিলেপী ফ্রম টুডে।'

আমরা এবার উঠে পড়লাম। এফ-আর-আই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একবার ভাল করে নিউ ফরেস্টকে দেখলাম। গাছপালার মধ্যে দিয়েও দুটো-একটা বাংলো নজরে পড়ল। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে নজর পড়ল দূরের বোটানিকস। কাঠবিড়ালীর খেলাঘর।

বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক মনে নেই। খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গেলাম নিউ ফরেস্ট আর তার ছোট্ট বোটানিকসকে পেছনে ফেলে।

চাক্রাতা রোডের পর এসে একটু দাঁড়ালাম। বোধহয় কয়েক মিনিট। ভাবছিলাম কোন দিকে যাব—ডাইনে, বাঁয়ে? মনে আছে গতকাল ডেরাডুন শহর থেকে আসবার সময় বাঁদিক থেকে এসেছি। সেইজন্যই ডানদিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

এফ-আর-আই আর মিলিটারী একাডেমীর প্রান্তে ছোট্ট একটা বাজার। হরেকরকম জিনিসের কয়েকটা ছোটখাট দোকানের মেলা। দোকানগুলোর আশে-পাশে চাক্রাতা রোডের এপাশে-ওপাশে শাকসব্জী সাজিয়ে বসেছে আরো কিছু

লোক। লোকজন বিশেষ দেখতে পেলাম না। আমি সামনের দিকে আরো এগিয়ে চললাম। কিছুদূরে যাবার পর একটা নদী এলো। নদীর উপর পুল। দাঁড়ালাম। চারপাশ দেখলাম। সাদা-কালো ছোটবড় পাথরনুড়ির ভয়ে জলের ধারা প্রায় চোখেই পড়ে না। তবু ভাল লাগল। বরাকর নদীর জলের ভয়ে কাছাড়ের মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়। শত-সহস্র মানুষের চোখের জল দেখে ব্রহ্মপুত্রের পাগলামী আরো বেড়ে যায়। ওখানে মানুষ চোর, নদীর জল থানার দারোগাবাবু। আর এখানে?

পুল পার হয়ে নদীর বুকে নেমে পড়লাম। পাথরনুড়ি তুললাম। দেখলাম, ছুঁড়লাম। যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই ছুঁড়লাম। ভারী মজা লাগল। বহুদিন পর এমন ছেলেমানুষী করার সুযোগ পেয়ে ভারী ভাল লাগল। বহুদিন আগে বিকেলবেলার বরাকর নদীর পাড়ে বেড়াতে গিয়ে আমরা একদল ছেলে ইট-পাটকেল ছুঁড়তাম নদীর বুকে। কেন গুরুচরণ কলেজে ভর্তি হয়ে এমন ছেলেমানুষী করিনি?

গুরুচরণ কলেজের কথা মনে হতেই হাতের পাথরনুড়িটা আর ছুঁড়তে মন চাইল না। হাতটা যেন অবশ হয়ে এলো। সুন্দর সাদা পাথরের নুড়িটা বেশ সযত্নে নীচে নামিয়ে রাখলাম। আমি তাড়াতাড়ি নদীর বুক থেকে রাস্তায় উঠে এলাম। যে নদীর বুকে এতক্ষণ খেলা করলাম, তার দিকে একবার পেছনে ফিরেও তাকালাম না। একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

কতক্ষণ ধরে কতদূরে হাঁটলাম, মনে নেই। হাঁটতে হাঁটতে কটা সিগারেট খেয়েছিলাম, তাও মনে নেই। মনে আছে আবার সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলাম প্যাকেটে একটাও সিগারেট নেই। সামনেই একটা ছোট্ট দোকান দেখতে পেলাম। এগিয়ে গেলাম। দোকানটা ছোট্ট হলেও বেশ ভাল। দোকানদার বৃদ্ধ। মাথায় পাগড়ী।

দু প্যাকেট সিগারেট নিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম। বৃদ্ধ দোকানদার হিসাব-নিকাশ করে আমাকে টাকা-পয়সা ফেরত দিল। সাধারণতঃ সিগারেট কিনে পয়সাকড়ি গুণে নেবার অভ্যাস আমার নেই। তবুও গুণলাম। প্রথম কথা নতুন জায়গা, তারপর সিগারেটের দামটাও জানা দরকার। আমাদের দেশে জিনিস-পত্তরের দামের কোন মাথামুণ্ডু নেই। একই শহরে একই জিনিসের দশ রকম দাম। কলকাতায় যে সিগারেট খেতাম, এখানেও সেই সিগারেট খাচ্ছি কিন্তু দামের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যে-কাজে আমি ডুন ভ্যালীতে এসেছি তাতে জিনিসপত্রের দামের প্রতি আমার নজর রাখতে হবে। তাইতো নানা কারণে টাকা পয়সা বেশ ভালভাবে গুণে নিলাম। কিন্তু একি? কলকাতা ছাড়ার পর তো এই দামে কোথাও সিগারেট পাইনি। দোকানদার বৃদ্ধ। হয়তো চোখে কম দেখে অথবা দোকানের মালপত্তরের দামের হিসাব জানা নেই বলেই কম দাম নিয়েছে।

'আপ পয়সা ঠিক লিয়া হ্যায়'?

বৃদ্ধ যেন চমকে উঠল, 'কিউ সাব? জাদা লে লিয়া?'

'না না, তা বলছি না কিন্তু কম নাওনি তো?'

বৃদ্ধ হাসল। বেশ মধুর আত্মতৃপ্তির হাসি। 'না সাব। কমবেশি নেবার অভ্যাস নেই।'

আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। দিল্লি, মীরাট, মজঃফরনগর, রুরকি, ডেরাডুনে সিগারেট কিনেছি। কোম্পানির দামের চাইতে বেশি দাম নিয়েছে। কেউ পাঁচ পয়সা, কেউ আট পয়সা, কেউ আবার দশ পয়সা। ডেরাডুন শহর থেকে এত দূরে এই গ্রামের বৃদ্ধ দোকানদার আরো বেশি দাম নিলেও আমি আপত্তি করতাম না বা অসন্তুষ্ট হতাম না। বরং স্বাভাবিকই মনে হতো।' কিন্তু...

হাতে টাকা-পয়সা নিয়ে বোধ করি কয়েক মিনিট চুপ করেই দাঁড়িয়েছিলাম। হাজার হোক বৃদ্ধ মানুষ। আমার চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তাইতো আমার মনের দ্বিধার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন।

'আপ ইধার পহেলে আয়ে হ্যায়?'

'হ্যাঁ।'

'নোকরি পেয়ে এসেছেন, নাকি বেড়াতে?'

'এখানে চাকরি করি না, তবে চাকরির কাজেই এসেছি।'

আমি প্যাকেটে থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালাম। একটা টান দিয়ে বললাম, 'অনেকদিন পর একজন অনেস্ট দোকানদার দেখলাম।'

বৃদ্ধ একটু ত্রস্ত হয়ে দুহাত জোড় করে বলল, 'আরে সাব। এসব বলবেন না। জীবনে কত অন্যায় করলাম, তার কি ঠিক আছে?'

বৃদ্ধ একটু উদাস হলো। দৃষ্টিটা আমার দিক থেকে সরিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেল। সাধারণ দোকানদারদের শ্রদ্ধা না করে পারলাম না।

'না, না, অন্যায় আবার কি করলেন?'

মাথায় পাগড়ীটা ঠিক করে বৃদ্ধ বললো, 'দুবেলা দু টুকরো রুটির জন্য প্রতি মুহূর্তেই অন্যায় করছি।' বৃদ্ধ একটু চুপ করতেই ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, 'জানি না, খুদার কি মর্জি।'

আমাব কোন কাজ ছিল না। দু-একজন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি। সুতরাং আমি নিজেই পাশের একটা ভাঙা চেয়ার নিলাম।

আমাকে চেয়ার টানতে দেখেই বৃদ্ধ ভীষণ লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ারটা পরিষ্কার করে দিতে দিতে বলল, 'মাপ করনা সাব। আপ মেহেমান হ্যায় আপনাকে বসতে পর্যন্ত বলিনি।'

আমি চেয়ারে বসতেই বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠল, 'কাকা ইধার আনা।'

কাকা? এর আগেও কাকা ডাক শুনেছি কিন্তু মানে বুঝিনি। শহরে নগরে বুদ্ধিমান সাজতে আমাদের ভালই লাগে। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। আজ তাই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকা কিয়া হ্যায়? চাচা?'

বৃদ্ধ হেসে বলল, 'ছোট ছোট লেড়কাদের আমরা আদর করে ডাকি কাকা।'

'আচ্ছা।'

বাড়ির ভিতরে থেকে একজন যুবক বেরিয়ে আসতেই বৃদ্ধ বলল, কাকা, চা পাঠিয়ে দাও তো।'

আমি আপত্তি করলাম, 'না না. চা কি হবে?'

'সাব, আমরা ফ্রন্টিয়ারের লোক। মেহেমানকে আমরা খুদা জ্ঞান করি।' চা খেতে খেতে শুরু হলো গল্প। বৃদ্ধের গল্প।

আমরা পেশোয়ারের লোক। ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের পাঠান।...

গল্প শুরু হতে না হতেই আমার প্রশ্ন, 'আপনারা কি মুসলমান?'

'নেহি সাব, আমরা হিন্দু।'

'তবে এর আগে কথায় কথায় খুদা বলছিলেন কেন?'

বৃদ্ধ হো-হো করে হেসে উঠল 'খুদা কী ভগবান নয়?'

সংস্কারমুক্ত বৃদ্ধের হাতে আমি যেন একটা থাপ্পড় খেলাম।

'জানো সাহেব, তখন মানুষের হাতে এত পয়সা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না কারুর। তাছাড়া তখন মানুষ অনেক উদার, অনেক সৎ ছিল। আমাদের দেশের সাধারণ গরীব মানুষ লেখাপড়া শিখতে পারত না, কিন্তু মানুষকে অবিশ্বাস করতেও শিখত না।

বৃদ্ধ যেন কতকগুলো কেতাবী বুলি বলে গেল আমাকে। আমি হয়ত বিশ্বাস করলাম না ভেবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলতে শুরু করল, 'আমি যখন বারা সালের তখন পিতাজীর সঙ্গে ফোর্ট স্যান্ডেমান গিয়ে জীবনে প্রথম তালা দেখলাম।'

'সে কি?'

'হাঁ সাব। আমাদের গাঁওতে কেউ ঘরে-দোরে তালা-চাবি লাগাত না। তালা-চাবি লাগাবার মতলব তো পড়শিদের অবিশ্বাস করা। সে কি কখন সম্ভব?'

'চুরি হতো না?'

'চুরি? গাঁওতে? কভি নেহি। গাঁওকা সব আমদী ভাই-রিস্তেদার হতো। তারা তো চুরি করতেই পারে না...'

'বাইরের লোক এসেও তো চুরি করতে পারত?'

বৃদ্ধ আবার হাসল। বললো, 'বাইরের লোকের এতনা সাহস কাঁহাসে হোগা? তাছাড়া চোর পাকড়ালেই তো তার জান খতম।'

'জান খতম?'

'জি হাঁ সাব। গুস্সামে জরুর কেউ না কেউ মেরে দেবে।' বৃদ্ধ একটু থামল। একটু ভাবল। আবার শুরু করল, 'পাঠান লোক বহুত ঠাণ্ডা হয় কিন্তু গুস্সা হলে সবকিছু করতে পারে।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ নিজের কথাই বলে গেল। আমার কথা কিছুই শোনেনি, জানেনি। এবার বোধহয় খেয়াল হলো।

'সাব, আপ কাঁহাকা রহনে বালা?'

আমি একটু দ্বিধা-সঙ্কোচে বললাম, 'আমি বাঙালী।'

'আপনি নেতাজীর দেশের আদমী? আপনারা সত্যি ভাগ্যবান।'

নেতাজীর মত আমিও বাঙালী সত্যি কিন্তু শুধু সেজন্য আমার গর্ব করার অধিকার আছে কি নেই, তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি চুপ করে রইলাম।

বৃদ্ধ যেন থামতে পারছিল না। 'বাঙালকা আদমী খুব শরীফ হয়। তাছাড়া পাঠানদের মত আপনারাও দুষমনকে বরদাস্ত করতে জানেন না। আপনারা অনেক পড়াই-লিখাই করেন বলে আমাদের মত গুস্‌সা আপনাদের নেই।'

বাঙালীকে এত শ্রদ্ধা করার কারণ আছে কিনা তা আমি জানি না। তবে এই সদ্য-পরিচিত বৃদ্ধ পাঠানের মুখে নেতাজীর প্রতি ভক্তি, বাঙালীর প্রতি শ্রদ্ধা শুনে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে মাত্র দু' একজন খদ্দের এসে সামান্য কিছু নিয়েই চলে গেল। বৃদ্ধ পাঠান তাদের প্রতি বিশেষ নজরও দিলেন না। আগের মতই আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। মনে হলো অনেকদিন কারুর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেন না বা বলার সুযোগ পাননি। তাইতো আমার মত শ্রোতা পেয়ে বড় খুশি।

'নেতাজী আপনা লাইফ কোরাবাণী দেবার জন্যে সবসে পহেলে এগিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া দুসরা হিন্দুস্থানী সেনাদের মত বিলকুল ঝুটা মিঠা মিঠা বুলি দিতেন না। সাফ সাফ সবাইকে বলতেন আংরেজকে হটাতে হলে তোমাদের খুন দিতে হবে, কোরবাণী করতে হবে জান-প্রাণ।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই একটু থামলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'পাঠানরা সিধা বাত বলতে ও শুনতে পছন্দ করে। তাইতো পাঠানরা নেতাজীকে পসন্দ্ না করে পারেনি। হাজার হাজার পাঠান আজাদ হিন্দ ফৌজে নাম লিখিয়েছিল, খুন দিয়েছিল, কোরবাণী দিয়েছিল প্রাণ।'

বৃদ্ধ পাঠানের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন আমার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেল। লক্ষ্য করলাম, চোখ দুটো শূন্যতায় একটু ঝাপসা হয়ে শিবালিক পাহাড়ের কোলের অন্ধকার অরণ্যে হারিয়ে গেল।

চাক্রাতা রোডের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দুটো-একটা গাড়ি চলে গেল। বৃদ্ধ তার দূরের দৃষ্টিকে কাছে গুটিয়ে এনে একটু উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইম্ফলের নাম শুনেছেন?'

'খুব শুনেছি।'

'কভি ইম্ফল গিয়েছেন?'

'খুব কাছেই থাকতাম, কিন্তু যাওয়া হয়নি।'

'আপনি কি মণিপুরে থাকতেন?'

'না। তবে মণিপুরের শিলচরে থেকেছি অনেকদিন।'

'তবু ইম্ফল যাননি? বড়া আফশোসের কথা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

একটু পরে বৃদ্ধই ভেজা ভেজা গলায় বললেন, 'ঐ ইম্ফলের কাছেই মৈরাং পাহাড়ে আমার ভাই জান দিয়েছিলো লড়াই করতে করতে। এক বেইমান অফিসার যদি আংরেজকে খবর না দিত, তাহলে হিন্দুস্থানে কাহিনী বদলে যেত।'

বাড়ির ভেতর থেকে যুবকটি বেরিয়ে আসতেই বৃদ্ধ আর এগুতে পারল না। আমারও খেয়াল হলো অনেকক্ষণ বসে আছি, হয়ত ওদের কাজের অনেক ক্ষতি করলাম। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'আচ্ছা নমস্তে। আজ চলি।'

বৃদ্ধ করজোড়ে নমস্কার করে বললো, 'নমস্তে সাব। মেহেরবাণী করে আবার দর্শন দেবেন।'

'জরুর'।

আমি উঠতেই বৃদ্ধ বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

মা মারা যাবার পরই নিঃসন্তান মামা-মামী আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। আমার দিন ভালই কাটছিল কিন্তু নিঃসঙ্গতার জ্বালা বাবা বেশি দিন সহ্য করতে পারলেন না। বছর দেড়েকের মধ্যেই আবার টোপর মাথায় দিয়ে কলাতলায় দাঁড়ালেন। শৈশব, কৈশোরে বাবার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া-মামা-মামী আমাকে বড় বেশি কাছে রাখতে চাইতেন। চিরকাল। অফিস থেকে ফিরেই মামা আমাকে না দেখলে শান্তি পেতেন না। বেশিক্ষণ আমাকে না দেখলে মামীও অস্থির হয়ে উঠতেন। তাইতো খেলাধূলার জন্যও বাইরে যেতে পারতাম না।

কলেজে ভর্তি হবার পরই মামা মারা গেলেন। তখন মামী আমাকে আরো বেশি আঁকড়ে ধরলেন।

কলেজে বেরুবার ঠিক আগে বইখাতা ঠিক করতে করতে আমি আমার ঘর থেকে চীৎকার করতাম, 'মাগো! আমি যাচ্ছি।'

খ্যাপা পাগলের মত মামী ছুটতে ছুটতে এসে আমার গালে হয়ত একটা চড় বসিয়েই বলতেন, 'হতচ্ছাড়া ছেলে! আবার যাচ্ছি যাচ্ছি করছিস। বল আসছি।'

'তুমি কি পাগল? আসছি বললে, কি যাচ্ছির মানে বোঝায়?'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মাগো দপ্ করে জ্বলে উঠতেন, 'ফের যদি আমার সঙ্গে তর্ক করবি তো আরেক থাপ্পড় লাগিয়ে দেব।'

বইখানা হাতে নিয়ে মাগোকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলতাম. 'আসছি'।

'আজ তো বুধবার। তোর সওয়া একটায় ক্লাশ শেষ। দেড়টার মধ্যে আসিস

কিন্তু।'

আমি হেসে ফেলতাম। 'কে বলল সওয়া একটায় ক্লাশ শেষ।'

মাগোও হাসত। 'তুই কি মনে করিস, তোর রুটিন আমার মনে নেই?'

তর্ক করে মিথ্যা কথা বলে লাভ হতো না। আমি জানতাম আমি না ফিরলে, মাগো খেতে বসবেন না। দেড়টা বাজতে না বাজতেই আমাকে ফিরতে হতো।

এইভাবে বড় হয়েছি বলে খুব বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ আমি পাই নি। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও লোকজনের সঙ্গে ছাড়া কথাবার্তা বলতেও আমার ভাল লাগত না। যেখানে-সেখানে যার তার সঙ্গে বক-বক করাও আমি পছন্দ করতাম না, আজও করি না। 'মাগোকে' হারাবার পর জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলাম বৃহত্তম সমাজে পরিচিত হবার প্রয়োজন। তাছাড়া ইতিমধ্যে আরো বিপর্যয় আসায়, নিঃসঙ্গতার জ্বালা প্রায়ই আমাকে অস্থির করে তুলছিল। তবুও যার-তার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে ভাল লাগত না, আজও লাগে না।

বরাকর নদীর পাড়ের শিলচর থেকে বহু দূরে এসেছি। পার হয়ে এসেছি কুশিয়ারা, মেঘনা, পদ্মা, গঙ্গা। সে অযোধ্যা নেই, রামও নেই। বরাকর নদীর পাড়ে আমি আছি, কিন্তু হারিয়েছি সেই পরিবেশ ; সেই মনের মানুষগুলো আমার অতীত দিনের আনন্দ, স্বপ্ন, আমার মনের সুর ছন্দ—সব কিছু হারিয়েছি। আমি নিজেই কি সেই আমি আছি? একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে আমি কত পাল্টে গেছি। একদিন ছিল যখন আমার একান্ত নিজস্ব দুনিয়ার মানুষগুলোকে ছাড়া আর কারুর প্রয়োজন উপলব্ধি করতাম না। তারপর দীর্ঘদিন নিজেকেই নিজে সমাজ-সংসার থেকে নির্বাসিত করেছিলাম। প্ল্যানিং কমিশনের এই চাকরিটা নেবার পর ইচ্ছে করছে কিছু কিছু মানুষের কাছে আসতে।

বৃদ্ধ পাঠানের কাছ থেকে গেস্ট হাউসে ফিরে লাঞ্চ খেয়ে শুয়েছি। শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম। আমি কি শুধু কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই? ঘনিষ্ঠ হতে চাই? নাকি আমি চাইছি কিছু মানুষ আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোক? পরিচিত, ঘনিষ্ঠ হলেই কি আমি খুশি হবো?

এইসব ভাবছি আর একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছি।

সিগারেট খেতে এত ভালবাসি অথচ মাঝে মাঝে সেই সিগারেট খেতেও ভাল লাগছে না। উইলস্ ফিল্টারে এক টান দিলে কত ভাল লাগে কিন্তু এখন ঠিক তত আরাম বা আনন্দ পাচ্ছি না কেন? শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিতেই ভাল লাগছে। সে ভাল লাগার স্থায়িত্ব কতক্ষণ? কয়েক মিনিট পরেই আবার সিগারেট ধরাচ্ছি।

বালিশ দুটোকে নিয়েও কত কি করছি। কিছুতেই যেন ঠিক হচ্ছে না। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আমার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। আশ্চর্য! কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি মানুষের ভালবাসা চাইছি। মনের মানুষের ভালবাসা

চাইছি, চাইছি ভালবাসতে। ঠিক অতীত দিনের মানুষ, শিলচরের মানুষ, আমার মামা, আমার মাগোর ভালবাসা তো আর পাব না, পেতে পারিও না! তবুও অনেকটা ওদের মতই আপনজনের ভালবাসাই হয়ত চাইছি।

অন্য কিছু নয়ত? অত-শত বিচার-বিবেচনা করার মত মনের ক্ষমতা আমার নেই। ঠিক কি চাইছি, কি চাইছি না, তা বুঝতে পারলে তো বেঁচে যেতাম।

আবার একটা উইলস্ ফিল্টার ধরালাম। পর পর কয়েকটা টান দিলাম একটু থামলাম, একটু ভাবলাম। বেশ কিছুক্ষণ ভাবলাম এতক্ষণ পরে শুধু এইটুকু বুঝলাম, আমি কিছু চাইছি। চাইছি প্রাণ-মন দিয়ে, সমস্ত অন্তর দিয়ে দেহের প্রতিটি অণু-পরামাণু দিয়ে। কিন্তু যা পাব করেও পাইনি, পেতে গিয়েও হারিয়েছি, তা তো আশা করছি না?

নাঃ! এতগুলো সিগারেট খেয়ে এতক্ষণ চিন্তা করেও ঠিক বুঝতে পারলাম না। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে আর তারপর দীর্ঘদিন শামুকের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রেখে মনের মধ্যে কেমন যেন বিশ্রী জট পাকিয়ে গেছে। নিজের কথা, নিজের মনের কথা, ভাষা, নিজেই বুঝি না।

আপন মনে এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, বুঝতে পারিনি ঘুমের মধ্যে একবার বেয়ারাটা যেন চা দিয়ে বলে গেল, সাব চায়। আমিও বোধহয় উত্তর দিয়েছিলাম, ঠিক হ্যায়। ঘন্টাখানেক পরে বেয়ারা যে চায়ের ট্রে নিতে এসেছিল, তা আমি জানতে পারিনি। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, চৌকিদার পাশে দাঁড়িয়ে। ঘুমের ঘোর একটু কাটার পর স্বাভাবিকভাবেই অবাক হয়ে চৌকিদারের দিকে তাকালাম, মুখে কিছু বললাম না। চৌকিদার শুধু বললো, 'সাব আয়া হ্যায়।'

'সাব?' আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাব কাঁহা হ্যায়?'

'ড্রইং রুম্‌মে।'

চটি পায়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি গেলাম ড্রইংরুমে। দেখি মিঃ রায় বসে আছেন। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ও আমি কিছু বলবার আগেই জানতে চাইলেন, 'নিশ্চয়ই খুব ঘুরাঘুরি করে অনেক বেলায় ফিরেছেন?'

আমিও একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললাম, 'খুব বেশি ঘুরাঘুরি করিনি তবে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল।'

'অফিস থেকে বাড়ি গিয়েই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম...'

'তাই নাকি?'

'শুনলাম আপনি ঘুমুচ্ছেন। তাই ডাকতে বারণ করেছিলাম। এই একটু আগেও ফোন করে জানলাম ঘুমুচ্ছেন তখন আর না এসে পারলাম না।' মিঃ রায় হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকালেন।

ছি ছি কি লজ্জার কথা।'

'ওসব লজ্জাটজ্জা ছাড়ুন মশাই। গেট রেডি। ওদিকে খাবার-দাবার যত ঠাণ্ডা হবে গিন্নী তত বেশি গরম হতে শুরু করবে।'

আমি না হেসে পারলাম না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম 'এত খাবার-দাবারের কি ব্যাপার?'

'এমন কিছু নয়, তবে ইউ আর হ্যাভিং ডিনার উইথ আস টু-নাইট।'

আমি বললাম, 'আই অ্যাম সিওর দিজ ইট নট এ রিকোয়েস্ট বাট এ কমান্ড ফ্রম হার ম্যাজেস্টি।' সুতরাং আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিই। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে জামা-কাপড় পাল্টে নিলাম। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করলাম। ব্যস্! ঘড়ি পরতে গিয়ে দেখি সাতটা বেজে গেছে। ড্রইংরুমে আসতেই মিঃ রায় উঠে পড়লেন ও দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

নিউ ফরেস্ট কলকাতা মহানগরী তো নয়ই, এমন কি কালীঘাট-ভবানীপুরের চাইতেও অনেক ছোট। নিউ ফরেস্টের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত মাইল খানেকের বেশি হবে না। তাছাড়া ভারী সুন্দর শান্ত পরিবেশ। অনেকটা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনস আর পুরনো আমাদের ইডেন গার্ডেন মিক্সচার আর কি! তবুও এখানকার বাসিন্দারা এই পথে এই পরিবেশে হাঁটেন না। কেউ গাড়িতে, কেউ সাইকেলে. আমি অবাক হই; আমার ভাল লাগে না।

মিঃ রায়ের গাড়িতে যেতে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এইটুকু পথের জন্য আবার গাড়ি আনলেন কেন?'

'প্রথম একটুকুই মনে হয়। কিছুদিন পরে আর এইটুকু মনে হবে না।'

কথাটার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না কিন্তু কিছুটা সত্য বৈকি। অধিকাংশ পুরুষের কাছেই বিয়ের রাতে বাসর ঘরে স্ত্রীকে যত ভাল লাগে, অপরূপা, মহীয়সী মনে হয় পরে তা মনে হয় না। দৈনন্দিন জীবনে সংঘর্ষে মনের কিছু কিছু মিঠি সুর, কিছু সত্ত্বা নিত্য আহত হয়, কিছু স্বপ্ন হারিয়ে যায়। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্তের ঘূর্ণি পথে কখনও কিছু হারিয়ে যায়, কখনও কিছু পাওয়া যায়। কোন জমিই চিরকাল উর্বরা থাকে না। জমিকে উর্বরা রাখতে হলে, মাঝে মাঝেই সার দিতে হয়। সংসার জীবনে অনেকেই জানেন না, বোঝেন না এসব চিরন্তন সত্য। যাঁরা এসব জানেন না, পারেন না তাঁদের কাছে সংসার রসহীন মাধুর্যহীন হয়ে পড়ে। সবার তা নয়। বাসর ঘরে যাকে মনোরমা মনে হয়েছিল, সংসার জীবনের চরম দুর্যোগের রাত্রিতে তাকে তো আরো আপন মনে হতে পারে, আরো নিবিড় করে প্রাণ ভালবাসার উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করাও সম্ভব॥

নিউ ফরেস্টের এই শান্ত নিবিড় বনানীর পরিবেশে প্রথম প্রথমই শুধু ভাল লাগবে কেন? তাহলে এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রাঙ্গণে মেলা কি শুধু শৈশবেই ভাল

লাগবে? যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে কি হিমালায়ের রূপ ভাল লাগবে না? আবীর রাঙা গোধূলির মিষ্টি কয়েকটা মুহূর্ত কি নিউ ফরেস্টের মানুষকে আনমনা করে না?

না, না, তা কি করে হয়? তা কি কখনও সম্ভব? এই রাস্তা দিয়ে আমি আগেও গিয়েছি, এখনও যাচ্ছি। এই পরিবেশ কি আমার তত ভাল লাগছে না? গাড়িটা মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই নিজের মনকে নিজেই জেরা করলাম। হাওড়া কোর্টের উকিলের মত কঠোর নির্মম হয়ে জেরা করলাম। কই না তো। আজ তো বেশ লাগছে। বরং বাতাসটা যেন আরও মিষ্টি, আরও স্নিগ্ধ। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি যদি গাড়ি থেকে নেমে পড়তে পারতাম, তাহলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতাম এই আবছা অন্ধকারভরা বনবীথিতে।

গেস্টহাউস থেকে মিঃ রায়ের বাড়ি—কতটুকুই বা পথ? দুতিন মিনিটের পথ। তা হোক! এই দু-তিন মিনিটের মধ্যেই কত কি ভাবছি! ভাবছি রামচন্দ্রের কথা, কৈকেয়ীর কথা। দীর্ঘ চোদ্দ বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন রাম। আশ্রয় নিতে হয়েছিল দণ্ডক মহারণ্যে। রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্য হারাতে হয়েছিল কিন্তু তার বিনিময়ে কি তিনি কিছুই পান নি? রঙিন প্রকৃতির অকৃপণ ঔদার্যের মেলার কি কোন আকর্ষণ নেই? নিশ্চয় আছে। সেদিনও ছিল, আজও আছে। তাইতো আজও শহরের-নগরের মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত হলে ছুটে আসে উদার বিস্তৃত প্রকৃতির কোলে।

মিঃ রায় অ্যাক্সিলারেটারের ওপর থেকে ডান পা তুলে ব্রেক দিয়ে গাড়ি ওর বাংলোয় গেটের মধ্যে ঢুকাতেই আমার ওসব চিন্তা পালিয়ে গেল। আমার খেয়াল হলো, আমি ডিনার খেতে এসেছি।

ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে গাড়ি চলছিল পোর্টিকোর দিকে। গাড়ি থামাবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ রায় হর্ন দিলেন, ঘোষিত হলো আমাদের আগমন বার্তা।

গাড়ি থেকে নেমেই মিঃ রায় বললেন, 'আসুন।'

আমি মিঃ রায়ের পিছনে পিছনে চললাম। আজকে আর স্টাডিতে নয়, সোজা ড্রয়িংরুমে। বিরাট ড্রয়িংরুম। বসবার জন্য, গল্পগুজব করবার জন্য এত বড় ও এই ভাল ঘরের কথা আমি ভাবতেই পারি না। কোনদিন দেখিনি বা উপভোগ করিনি বলে প্রয়োজনও অনুভব করি না। শিলচরে কিছু লোকের বাড়িতে বসার ঘর দেখেছি কিন্তু এত ভাল ড্রয়িংরুম দেখিনি। আমাদের গুরুচরণ কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক চন্দ্র-বাড়িতেই শুধু ড্রয়িংরুম দেখেছি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় হয়ত একটা ড্রয়িংরুম আছে, তবে আমি দেখিনি। সে ড্রয়িংরুম নিশ্চয় এত ভাল নয়। সত্য কথা বলতে কি, শিলচর বা কলকাতায় থাকতে ড্রয়িংরুমের কথা বিশেষ শুনতামই না দেখতামও না। প্ল্যানিং কমিশনের কৃপায় দিল্লিতে এসেই ড্রয়িংরুমের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

মিঃ রায়ের ড্রয়িংরুম দেখে বেশ লাগল। এক পাশে একটা বড় সোফা সেট। ফায়ার-প্লেসের ধারে বেতের সোফা। কার্পেট, টিপাই, সেন্টার টেবিলগুলোও ভারী

মৎকার। ঘরের তিন কোণায় তিনটে লাইট-স্ট্যান্ড। ডিভানের পেছনে একটা াইনীজ স্ক্রল্। আরো ছোট-খাট টুক-টাক্ কি কি যেন আছে।

মিঃ রায়ের পিছনে পিছনে ড্রইংরুমে ঢুকেই বেশ লাগল। শুধু ভাল লাগল? লাভ হচ্ছে নাতো? লোভ? হ্যাঁ হ্যাঁ লোভ। ভাল জিনিস দেখলে লোভ হয় না? সই ছেলেবেলায় মামা আর মাগোর সঙ্গে শিলং বেড়াতে গিয়ে পুলিশ বাজারের দাকানে নানা রকমের খেলনা দেখে আমার লোভ হয়েছিল না? কেন কলকাতায় পাস্ট গ্রাজুয়েট হোস্টেলে থেকে পড়বার সময় চৌরঙ্গী পাড়ায় গেলে কত কি দেখে লাভ হতো না?

সেসব দিন অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। মাঝে ক'বছর প্রায় সাধু হয়ে গয়েছিলাম। নিজের জীবনের প্রতিই কোন আকর্ষণ ছিল না লোভ তো দূরের থা। কিন্তু নিউ ফরেস্টে আসার পর কি হলো? ঐ শান্ত-স্নিগ্ধ শাল-পাইনের ধ্যে ঘোরাঘুরি করে নিজেকে এত ভাল লাগছে কেন। গেস্ট হাউসের ড্রেসিং টবিলের আয়নায় নিজেকে এত সুন্দর মনে হয়েছে কেন? মিঃ রায়ের ড্রইংরুমে সেই বা এত ভাল লাগছে কেন? এই শাল-পাইনের বনে, শিবালিক পাহাড়ের াড়ালে কোন সূর্য লুকিয়ে নেই তো যে আমার জমাট-বাঁধা আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-াসনার বরফ গলিয়ে দেবে?

জানি না। ভগবানের কি ইচ্ছা, তা জানি না। তবে এই ড্রইংরুমে ঢুকে একবার ারপাশ দেখে নিয়েই বললাম, 'হাউ লাভলি।'

খুশি হয়ে মিঃ রায় বললেন, 'ইউ থিংক সো?'

'নিশ্চয়ই।'

মিঃ রায় হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা কথা জেনে রাখুন ়, মনের মত একটা আস্তানা আর স্ত্রী যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এই পৃথিবীর কান সৌন্দর্য কোন আনন্দ উপভোগ করা যায় না।'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস স্যার। ইট ক্যান অলসো পুট ইট দি আদার-ওয়ে। মনের মত স্ত্রী আর ংসার হলে জীবনের সব দুঃখ সব ব্যর্থতা, সব সমস্যার মোকাবিলা করা যায়।'

আমি মুখে কিছু বললাম না, বলতে পারলাম না, বলতে ইচ্ছা করল না। ধু একটু হাসলাম। পাশের একটা সোফায় বসতেই উনি ভেতরে গেলেন, 'বসুন াসছি।'

আমি চুপ করে সোফায় বসে আছি আর ভাবছি, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খা হলো কেন? এর সঙ্গে যত বেশি ঘনিষ্ঠ হচ্ছি, যত বেশি দেখছি আমার তি, আমার জীবনের প্রতি তত বেশি লোভ হচ্ছে। একটা অদম্য চাপা ইচ্ছা ন মাথা ফুঁড়ে বেরুতে চাইছে। গর্তের মধ্যে যেন একটা কামনা-বাসনা লালসার কউটে সাপ লুকিয়ে আছে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার ফোঁস

ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি নাকি?

ড্রইংরুমটা আর একবার ভাল করে দেখলাম। বেশ ভাল লাগল। মনে হলে আমার যদি একটা ছোট্ট সুন্দর ড্রইংরুম থাকত? শীতের সন্ধ্যায় ফায়ার প্লেসে ধারে বসে বই পড়তে পারতাম। না, না, তার চাইতে আরো ভাল হতো যদি গল্প করতে পারতাম। কিন্তু কার সঙ্গে বসে গল্প করব? কে আছে আমার?

প্রায় একই সঙ্গে রায় দম্পতি ড্রইংরুমে এলেন। মিসেস রায় ট্রে থেকে কফি পেয়ালা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'আজ বুঝি খুব ঘুরেছেন?'

'খুব বেশি ঘুরাঘুরি করার লোক আমি না।'

অন্য পেয়ালার কফি স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?

'আমি বড্ড কুঁড়ে।'

মিসেস রায় এবার নিজে এক পেয়ালা কফি নিয়ে আমার পাশের সোফায় বসে বললেন, 'আপনাকে দেখে তো খুব চটপটে স্মার্ট মনে হয়।'

'যা মনে হয় তাকি সব সময় সত্যি?'

এবার মিঃ রায় মুখ খুললেন, 'এই তো ইন্টেলিজেন্টের মত কথা।'

মিসেস রায় শুধু একটু হাসলেন। মনে হলো আমার মন্তব্য উপভোগ করেছেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

আমি এবার মিসেস রায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নিউ ফরেস্ট আপনার কেমন লাগে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, 'খুব ভাল লাগে।'

'কেন বলুন তো?'

'এত সুন্দর জায়গা। ভাল লাগবে না?'

'শুধু সুন্দর জায়গা বলেই ভাল লাগে?'

মিসেস রায় আপনমনেই একটু হাসলেন, 'না, শুধু তা নয়...'

'তবে?'

'নিজেকে দেখার, বোঝার এত ভাল জায়গা বোধকরি আর পাব না—অন্তত আগে পাইনি।'

আমি তারিফ না করে পারলাম না 'বাঃ! ভারী সুন্দর কথা বললেন তো

মিঃ রায় আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, 'ডোন্ট ফরগেট, সী ইজ মাই ওয়াইফ!'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'যদি বলি ইউ আর হার হাসব্যান্ড?'

'প্রতিবাদ করব না।'

ড্রইংরুমে বসে বসে আমরা একটা গাড়ি আসার আওয়াজ পেলাম। পোর্টিকোতে গাড়ি ব্রেক করার সঙ্গে সঙ্গেই হর্ন বাজল। আমি বসে রইলাম ওরা দুজনেই উঠে গেলেন।

আমি ড্রইংরুমে বসেই গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। কথাবার্তা ᅠশুনতে পেলাম একটু-আধটু। কথাবার্তা বলতে বলতেই ওরা দুজনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনিই কি সাগর চট্টোপাধ্যায়?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলার আগেই মিঃ রায় বললেন, 'তুমি তো ঠিক ধরেছ দাদা।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন 'মাধুরী আমাকে যে ডেস্‌ক্রিপশন দিয়েছে, তাতে তো না চেনার কোন কারণ নেই।'

মিসেস রায় হাসলেন। তারপর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমাদের দাদা—ডক্টর এস.পি. সরকার—অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের অ্যাডভাইসার।'

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। ডক্টর সরকার বললেন, 'এরা দুজনে তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ! তা রোজ রোজ এদের এখানে এসে নিজের প্রশংসা না শুনে আমার এখানে চলে আসবেন।'

আমি হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

'এই কাছেই। ওরা ডাইরেকশন দিয়ে দেবে। কাল চলে আসবেন।' এবার মিঃ আর মিসেস রায়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চলি বুঝলে?'

স্বামী-স্ত্রী প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ এক্ষুণি যাব, তার কারণ আমাকে একটু ঘুরে বুলাকে সিনেমা থেকে আনতে হবে।'

মিসেস রায় বললেন, 'বুলা সিনেমায় গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আজ সকালে যখন টেলিফোন করেছিলাম, তখন তো কিছু বললেন না।'

'মুসৌরী থেকে রমা এসেই ওকে নিয়ে সিনেমায় গেছে।'

'রমা আজ থাকবে?' মিসেস রায়ই জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, ও কাল সকালেই যাবে।'

ডক্টর সরকারকে আমরা সবাই বিদায় জানাতে বারান্দায় এলাম। গাড়িতে উঠে উনি আর একবার আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, 'কাল আসছেন তো?'

আমি বললাম, 'আচ্ছা আসব।'

আমরা আবার ড্রইংরুমে ঢুকতে না ঢুকতেই মিসেস রায় বললেন, 'তোমরা বার এখানে বসো না। খেতে খেতেই গল্প করা যাবে।'

মিঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চলুন খেতে খেতেই গল্প হবে।'

'চলুন'। ড্রইংরুমের পাশেই ডাইনিং রুম। টেবিল সাজানই ছিল। আমি আর

মিঃ রায় বসলাম। মিসেস রায় সার্ভ করা শুরু করলেন।

আমি বললাম, 'ডক্টর সরকারকে দেখে ভারী ইন্টারেস্টিং লোক মনে হলো

মিসেস রায় সার্ভ করতে করতেই বললেন, 'দাদার মত মানুষ সত্যি বিরল।

মিঃ রায় বললেন, 'শুধু ডক্টর সরকারই নন, বৌদিও অত্যন্ত ভাল মানুষ দীর্ঘদিন এখানে আছি, কিন্তু এমন মানুষ আর পাইনি।'

সুপ খেতে খেতে শুনলাম, ডক্টর সরকার একজন যশস্বী ভূতত্ত্ববিদ্। কলকা ইউনিভারসিটির ডি-এস-সি ছাড়া বার্লিনের ডক্টরেট। বার্লিনের ডক্টরেট পে পেতেই হিটলার আত্মজ্ঞানশূন্য হয়ে জুলিয়াস সীজার বা আলেকজান্ডারের ম বিশ্বজয়ের নেশায় মেতে উঠেছিলেন। ডক্টর সরকার চলে এলেন লন্ডনে।

চাকরটা সুপ-প্লেট তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রায় বললেন, 'ইণ্ডিয়ান এক প্যাসেজ পাবার জন্য পাঁচ মাস লন্ডনে ছিলেন। ক্যামডেন টাউনে থাকতেন অ রোজ পিকাডিলি সার্কাসে পি অ্যান্ড ও-র দপ্তরে গিয়ে ধর্ণা দিতেন...'

'কেন ?'

দুহাত নেড়ে মিঃ রায় একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, 'জাহাজ কোথায় প্যাসেঞ্জার লাইনারগুলোকে নিয়ে তখনই যুদ্ধের তোড়জোড় লাগান শুরু হ গেছে।'

নতুন ফুল প্লেট এলো, পাশে একটা হাফ প্লেট। ফুল প্লেটে দুচামচ সুপ ফাইন ডেরাডুন রাইস দিতে দিতে মিসেস রায় বললেন, 'দাদা এই পাঁচ মা ক্যামডেন টাউন পিকাডিলি সার্কাস ছাড়া লন্ডনের আর কিচ্ছু দেখেননি।'

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'সত্যি' ?

আমার হাফ প্লেটে ফিস ফ্রাই তুলে দিয়ে মিঃ রায় বললেন, 'রিয়েলী সো

ছোলার ডাল দেওয়া নেওয়া শেষ করে মিসেস রায় মন্তব্য করলেন, 'দা ঐ ধরনেরই লোক। যখন যা মাথায় ঢুকবে, তখন তাই নিয়েই পাগল।'

ছোলার ডাল, ফিস-ফ্রাই খেতে খেতেই জানতে পারলাম, ডক্টর সরকা এখনও কাজ পাগল। একবার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে, ঠিক নেই কখন বেরুবে কেন বাড়িতে ? সায়েনটিস্টদের রিপোর্টের বান্ডিল নিয়ে পড়তে বসলেই হলে বাড়িতে লোকজনই আসুক আর অন্য কোন কাজই থাক, ওকে স্টাডি থেকে বে করা অসম্ভব। চিংড়ির মালাইকারি খাবার সময় মিসেস রায় শোনালেন 'সিনেমা টিকিট আর ডিনারের নেমন্তন্ন স্পয়েল করতে দাদার জুড়ি পাওয়া দায়।'

'তাই নাকি ?'

'তবে কি ? আমি তো কোনদিন দাদাকে খেতে বলি না—কারণ ওঁর আসা কোন ঠিক আছে ? কিছু ভালমন্দ রান্না হলে টিফিন-কেরিয়ারে ভরে পাঠিয়ে দিই

মিসেস রায়ের কথা শুনে হাসলাম কিন্তু পোলাও আর চিকেনকারি দিে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি উড়ে গেল। 'আজ আর সম্ভব নয় বরং কাল দুপুরে..

মিসেস রায় হাসতে হাসতে বললেন, 'কাল দুপুরের চিন্তা কালকেই করা যাবে। এখন তো একটু নিন।'

সংসারে আর কোন বাচ্চাকাচ্চা না থাকায় মাগো আমাকে ভালমন্দ খাওয়াতে কোনদিন ক্রটি করেনি। মামা একদিন মাছ না আনলে মাগো কি ভীষণ বকবকানি করতেন, 'আচ্ছা তুমি কি বলতো?'

মামা বলতেন, 'কেন?

'জান ছেলেটা একটু মাছ না হলে খেতে পারে না অথচ তুমি...'

আমি আমার ঘরে বসে বসেই মামার কথা শুনতাম, 'আজ তেমন পছন্দমত মাছই দেখলাম না।'

আমি পড়াশুনা বন্ধ করে এসব কথা শুনতে শুনতে হাসতাম। মাছ ছাড়া আমি ঠিকই খেতে পারতাম কিন্তু মাগো শান্তি পেতেন না। তাইতো মামাকে শেষে বলতে হতো, এবেলা ডিম-টিম দিয়ে চালিয়ে দাও, ওবেলায় বরং মাছ এনে দেব।

বিকেলবেলা অফিসের পরে মামা বরাকর নদীর পাড়ে জেলেদের আড্ডায় গিয়ে মাছ কিনেই বাড়ি ফিরতেন। শুধু মাছই নয়; মাগো আরো কত কি খাওয়াতেন। তাছাড়া মাগো কত কি রাঁধতে পারতেন। ভাবলেও অবাক লাগে। আমি মাঝে মাঝেই রান্না ঘরে গিয়ে মাগোর সাথে গল্প করতাম। রান্না করা দেখতাম।

পারসে মাছগুলোকে নুন-হলুদ মাখিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখেছেন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'মাগো মাছ কি ওবেলার?'

মাগো অন্য কাজ করতে করতেই উত্তর দিতেন, 'না, না, ওবেলার কেন হবে?'

'তবে যে নুন-হলুদ মাখিয়ে সরিয়ে রেখেছ?'

'নতুন-হলুদ না বসলে মাছের পাতুরী ভাল হয় না।'

আমি অবাক হয়ে বলতাম, 'সে আবার কি?'

মাগো হাসতে হাসতে বলতেন, 'দ্যাখ না কি করে হয়?'

আমি সত্যি চুপ করে বসে দেখতাম, মাগো মাছগুলোকে অল্প ভেজে তুলে রাখলো। তারপর দেখলাম ঐ অল্প অল্প তেলের মধ্যে পেঁয়াজ-লঙ্কা হলুদ বাটা আর নুন ভেজে নিয়ে বেশ ঘন সরষে বাটার জল কড়ার মধ্যে ঢেলে দিলেন। একটু পরেই এসব টগবগ করে ফুটতে শুরু করলেই আমি আবার জিজ্ঞাসা করতাম, 'মাছ দেবে না?'

'ঝোলটা একটু শুকিয়ে গেলেই দেব।'

ঝোল শুকিয়ে গেলে মাছ আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু জল দিত মাগো।

'ঝোল শুকিয়ে যাবার পরে আবার জল দিলে কেন?'

কড়াটা ঢেকে দিতে দিতে মাগো জবাব দিতেন, 'মাছগুলো সিদ্ধ হবে তো।'

আমি আবার পাল্টা প্রশ্ন করতাম 'তা আগে দিলে না কেন?'

'তাতে ঠিক টেস্ট হয় না।'

অল্প অল্প ঝোল থাকতে কঁড়া নামিয়ে মাগো বলত, 'খেয়ে দেখবি নাকি কেমন হয়েছে?

মাগো এইভাবে আমাকে খাওয়াতেন সত্যি, তবে কোনদিনই বেশি খেতে পারি না। মিসেস রায়কে তাই বার বার অনুরোধ করলাম, কিন্তু শেষে দুটুকরো চিকেন নিতেই হলো।

হাতমুখ ধুয়ে ড্রইংরুমে আসার পর হাতে এলো এক প্লেট পুডিং।

শেষ পুডিংটুকু মুখে দেবার পর মিঃ রায় বললেন, 'আমার তো ভয় হয় ডক্টর সরকারের সঙ্গে আলাপ হবার পর আপনি হয়ত আমাদের ভুলেই যাবেন।'

আমি পুডিং-এর প্লেট সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, 'আপনাদের ভুলে গেলেও এমন সুন্দর পুডিং খাবার স্মৃতি তো ভুলতে পারব না।'

মিঃ আর মিসেস রায় হাসলেন।

কফি খাবার পরেও বেশ খানিকক্ষণ গল্পগুজব করা হলো। গল্পে-গল্পে অনেক রাত হয়েছিল। আমি উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার মুখে মিসেস রায় বললেন, 'কাল দুপুরে খেতে আসতে ভুলে যাবেন না।'

আমি ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম সেকথা ইনি এখনও মনে করে আছেন দেখে একটু অবাক হলাম। শুধু সৌজন্য বা ভদ্রতার জন্যে এসব ঠাট্টা মনে রাখতে হয় না।

মিসেস রায়ের আন্তরিকতায় খুশী হলাম, হাসলাম। বললাম, 'ব্যাঙ্কে কিছু জমা দেবার আগেই পর পর কয়েকটা চেক কাটলাম। কিছু জমা না দিয়ে আর চেক কাটা কি ঠিক হবে?'

'আপনার নাম করে যা তুলে রেখেছি, সেসব আর কে খাবে?'

কথাটা শুনেই যেন ইলেকট্রিক শক্ পেলাম। এমন কথা তো মাগো বলত। আমি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। বললাম, 'আসব।'

নিউ ফরেস্টের সেই শান্ত নির্জন প্রায়ান্ধকার রাস্তা দিয়ে গেস্ট হাউসে আসার পথে আবার আমরা মুখোমুখি হলাম। আমি হাঁটছি। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছি। পাশেই শাল-পাইনের বন। স্থিত-প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর মত ওরা অবিচল অপলক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দাঁড়িয়ে পড়েছি, আমার চলা থেমে গেছে, আমি নিজেই টের পাইনি। শাল-পাইনের বন দেখছিলাম। অবাক হয়ে দেখছিলাম। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত একইভাবে মাটির নীচের পাতাল থেকে রস গ্রহণ করে আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই পৃথিবীর অজ্ঞাত অদৃশ্য দুনিয়া থেকে আমিও কেন পথের রসদ সংগ্রহ করছি না? কেন মুক্ত আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছি না?

আবার হাঁটতে শুরু করলাম। একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেট টানতে টানতেই ভাবছিলাম নানা কথা। এই ডেরাডুন, এই নিউ ফরেস্ট আসার আগে তো মিঃ ও মিসেস রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ভাবতে পারিনি এদেব মত দরদী মানুষের সাক্ষাৎ পাব। আচ্ছা আমি যদি ডক্টর সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি? নিশ্চয়ই আর একটা মানুষকে কাছে পাব। এই পৃথিবীতে কখনও অনেক কিছু পেয়েছি, কখনও সব কিছু হারিয়েছি। তা হোক। এ তো জগতের নিয়ম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে আরো অনেকে আমাকে ভালবাসুক আমিও অনেককে ভালবাসি।

সিগারেটটা এখনও টানছি। হঠাৎ বৃদ্ধ পাঠান দোকানদারের কথা মনে হলো। সামান্য সিগারেট কিনতে গিয়ে একজন অপরিচিত দোকানদারের সঙ্গে এত খাতির ভালবাসা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবু হলো। শুধু হলো মানে? দিনে দিনে আমাদের সম্পর্ক নিশ্চয়ই আরো মধুর হবে।

মাগোর ভাষায় এক একটা মৌসুম আসে। এক মৌসুমে নদীর জল বাড়ে, এক মৌসুমে কমে। এক সময় আম হয় এক সময় জাম হয়। এ নিয়ম চলছে, চলবে। কেন ডাক্তারেরা বলে না মানুষ হবারও মৌসুম আছে? অন্য মৌসুমেও হয় তবে কম, অনেক কম। এখন কি আমার ভালবাসা পাবার মৌসুম এসেছে?

গেস্ট হাউসে আমার ঘরে এসেও অনেকক্ষণ ভাবলাম। অনেক কিছু ভাবলাম। ভাবলাম? না, না, ভাবলাম কোথায়? কিছু পাবার আশায় মশগুল হয়ে বসে রইলাম।

শুতে শুতে অনেক রাত হলো। সকালবেলা ঘুম ভাঙলও অনেক দেরীতে। বেয়ারার ডাকাডাকিতে। মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলাম না। চা রেখে গেল, আমিও মুখ বুজে খেয়ে নিলাম কিন্তু মনে মনে ভীষণ রাগ হলো। বিরক্তি হলো। ঘুম থেকে উঠেই কি এই গাড়োয়ালী বেয়ারার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে?

ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা উদ্দেশ্যহীনও বটে। চাক্রাতা রোডের পর এফ-আর-আই-এর মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট খেলাম। একবার ভাবলাম বৃদ্ধ পাঠানের কাছে যাই। আবার ভাবলাম, না না, রোজ রোজ ওর কাছে যাবো কেন? গেলাম না। শহরের দিকেই এগুতে শুরু করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লক টাওয়ারের কাছে পল্টন বাজারে এসে গেলাম। সামনেই থানা পোস্ট-অফিস, দোকান-বাজার, স্কুটার-ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আরো কত কি। ট্রাফিক পুলিশের মত প্রায় রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। হাঁ করে চারদিক দেখছি। সব কিছু দেখছি। শুধু শুধুই দেখছি। লোকজন দেখতে ভালই লাগছে। ওরা ঘুরছে-ফিরছে কেনা-কাটা করছে। কেউ তাড়াতাড়ি হাঁটছে, বন্ধুর সঙ্গে। কেউ হাসছে, কেউ ভাবছে। কেউ সুন্দর,. কেউ কুৎসিৎ। কেউ ধনী, কেউ গরীব। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের সবাইকে দেখছি। মুগ্ধ হয়ে দেখছি।

একটা অটো-রিকসা আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েছিল আর কি! আমি তাড়াতাড়ি

পিছিয়ে গেলাম রাস্তার ধারে গাছের গোড়ায় পান-সিগারেটের দোকানের পাশে। আমি এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশের মানুষ দেখছি আর ভাবছি। ভাবছি, বাহ্যিক দিক থেকে দুটি মানুষের মিল দেখছি না কিন্তু এরা সবাই যেন কোন এক যাদু মন্ত্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।

সিগারেট টানছি, দেখছি আর ভাবছি।

না, না, যাদুমন্ত্র হবে কেন ? মনে হচ্ছে আমার চারপাশের সমস্ত মানুষ যেন একটা কোরাস গান গাইছে। এক সুর, এক ভাষা। জীবন সঙ্গীত। আমি শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি এরা সবাই এক অদৃশ্য সঙ্গীত পরিচালকের নির্দেশে জীবন-সঙ্গীত গাইছে। তাইতো এদের মধ্যে একটা বেশ সুন্দর মিল দেখতে পাচ্ছি সবার মধ্যে। এই ট্রাফিক পুলিশ, ঐ দোকানদার ঐ আর্মি অফিসার আর স্ত্রী। সবাই। জীবনের তাগিদে, বাঁচার আনন্দে এরা সবাই মত্ত। হয়ত প্রমত্ত কেউ কেউ। এদের মধ্যে কেউ ভাল, কেউ মন্দ। তা হোক। এরা কেউ হারছে, কেউ জিতছে। কেউ বিয়ে করার নেশায় ছুটছে। কেউ সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আরো সম্ভোগের স্বপ্ন দেখছে। কেউ হয়তো রুগ্ন মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য ছুটাছুটি করছে। আবার কেউ বা বাবা-মা, হাসিখুশীভরা প্রাণপ্রিয় সন্তানদের জন্য পল্টন বাজারে এসেছে।

সিগারেটটা শেষ করে ফেলে দিলাম।

কিন্তু আমি এখানে কি করছি ? কার জন্য, কি কারণে এসেছি এই পল্টন বাজারের মোড়ে ? ওরা যে কোরাস গান গাইছে, আমি তা গাইতে পারছি না কেন ? আমার জীবনের কোন তাগিদ নেই কেন ? গরু মাঠে যায়, ঘাস খায়, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে কিন্তু ওরাও তো বাছুরকে দুধ খাওয়ায়। আমি ? আমি কি তার চাইতে অধম ?

আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না। রাজপুর রোডের দিকে গেলাম না। ওদিকটা একটু ফাঁকা। পল্টন বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমি একা। তবু আমার পাশ দিয়ে আরো কত মানুষ যাতায়াত করছে, আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। বেশ লাগছে। ওদের গন্ধ স্পর্শ আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই বাজারের মধ্যে অমন সুন্দর স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে ? বিশ্রী লাগল। একটু কান পেতে শুনলাম ওদের ঝগড়া। স্ত্রী বলছে, আমার জুতো কেনার দরকার নেই। তুমি বরং শার্টটা কিনে নাও। স্বামী প্রতিবাদ করছে। বলছে আর শার্ট কি হবে ? তুমি জুতোটা কিনে নাও, হঠাৎ কোনদিন ছিঁড়ে যাবে। আমি আর দাঁড়ালাম না। এগিয়ে চললাম। মনটা একটা বিচিত্র পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল। জানি না জুতো কেনা হলো নাকি শার্ট কেনা হলো। কিন্তু এইটুকু বেশ বুঝলাম, নিজে উপভোগ করার চাইতে প্রিয়জনকে দেবার আনন্দ অনেক বেশী। আমি কি এই আনন্দ, এই তৃপ্তি কোনদিন পাব না ?

আর একটা সিগারেট ধরাতে গিয়েই হাতের ঘড়িতে নজর পড়ল। একটা বাজে।

এফ-আর-আই-এর লাঞ্চের ছুটি হয়ে গেছে। মিঃ রায় নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। পল্টন বাজারের সরু গলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ভিতরে এসে গেছি।

ব্লক টাওয়ারের কাছে ফিরে আসতে বেশ সময় লাগল। তাড়াতাড়ি একটা অটোরিক্‌সা নিয়ে রওনা হলাম। গেস্ট হাউসে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মিঃ রায়ের বাংলোয় হাজির হতে হতে পৌনে দুটো বাজল। গাড়ি দেখতে না পেয়েই বুঝলাম, মিঃ রায় আবার অফিস গিয়েছেন।

মিসেস রায় সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখেই খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আসুন, আসুন।'

'আমার জন্যে বসে আছেন তো?'

'তাতে কি হলো? আমি কি এর আগে খাই?' হাসি হাসি মুখেই মিসেস রায় বললেন।

এই বাড়িতে দিনের বেলা আসিনি। এই প্রথম। দিনের বেলায় মিসেস রায়কেও এই প্রথম দেখছি। সন্ধ্যাবেলায় সব মেয়েরাই একটু আধটু সাজগোজ করে, প্রসাধন চর্চা করে। মিসেস রায়ও করেন। ভালই লেগেছে দেখতে। এখন একটা লক্ষ্ণৌ চিকনের ব্লাউজ আর প্লেন তাঁতের শাড়ী পরেছেন। চুল ভেজা খোপা বাঁধতে পারেন নি। কপালের ওপর সিন্দুরের টিপটা জ্বল জ্বল করছে। আমি একবার দেখলাম।

বললাম, 'উঠলেন কেন? বসুন।'

'উঠব না? আপনার তো নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'

'এমন কিছু ক্ষিদে পায়নি।'

মিসেস রায় বসলেন। আমি একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

'অত দূরে বসছেন কেন? এদিকে এগিয়ে আসুন।'

আমি চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিতে নিতে ভাবলাম, আমি তো আরো কাছে আসতে চাই, চাই ভক্তি করতে, ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে। আমি ভদ্রতা-সৌজন্য রক্ষা করে আপনার কাছে আসছি, হাসছি, গল্প করছি। কিন্তু মনে মনে কাঁদছি। হাউ হাউ করে কাঁদছি। সারা পৃথিবীর সবার সঙ্গে শুধু ভদ্রতা-সৌজন্যের সম্পর্ক নিয়ে কি কেউ বাঁচতে পারে? সুখী হতে পারে?

আমি মাথা নীচু করে বসেছি।

'কি ভাবছেন?'

আমি তাড়াতাড়ি একবার মুখ তুলে বললাম, 'কই কিছু তো ভাবছি না।'

মিসেস রায় বোধ হয় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি সব সময় কি যেন ভাবেন?'

কি আশ্চর্য! কি করে ইনি জানলেন? আমি তো কখনও বলি না ভাবছি, আকাশ-পাতাল ভাবছি। ভাবছি আমার শূন্যতার কথা, তুলনা করছি আশেপাশের

মানুষের সঙ্গে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত।

'কি করে বুঝলেন?'

'যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে পারব না, তবে আপনার চোখ দুটো আর কপালের রেখাগুলো লক্ষ্য করলে মনে হয় আপনি সব সময় কি যেন ভাবেন।'

আমি সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, 'আমি তো বুঝতে পারিনি এত ভালভাবে আমাকে লক্ষ্য করেছেন।'

তখন আর কিছু বলেননি তবে খেতে খেতে উনি বলেছিলেন, 'একা একা থাকলে অনেক রকমের চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসা স্বাভাবিক। তবে অত ভাববেন না। যখন যা পাবেন, তখনই তাই প্রাণমন দিয়ে গ্রহণ করবেন।'

আমি চুপ করে শুনছিলাম। একটু পরে মিসেস রায় আবার বলেছিলেন 'জীবনে যত বেশি বিচার করবেন, তত বেশি দুঃখ পাবেন। জীবনকে একটু সহজভাবে নিলেই দুঃখ কম পাবেন।'

সত্যিই তাই। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিচার-বিবেচনা করতে গেলেই দুঃখ বেশি পেতে হয়। মামা কদাচিৎ কখনও মাগোর' পর রাগ হলে বড় বেশি চেঁচামেচি করতেন। মাগো একটি শব্দ উচ্চারণ করত না। আমি মাগোর কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলতাম, 'মামা শুধু শুধুই তোমাকে বকলেন। তুমি কিছু বললে না কেন?'

মাগো বলত, 'বলে কি লাভ? আমি বলব ও দোষী ও বলবে আমি দোষী। বিচার-টিচার করে লাভ কি বল?'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি আমার মাগোর মত কথাবার্তা বলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালই তো।'

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আর দেরী করলাম না। যাবার সময় বললেন, 'দাদার ওখানে সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই যাবেন।'

'যাব।'

'আর হ্যাঁ, রাত্রে ওখানেই খাবেন।'

'প্রথম দিন গিয়েই খাব?'

'তাতে কি? দাদার কাছে লজ্জা করার কিছু নেই।'

আমি আর কথা না বলে আস্তে আস্তে গেস্ট হাউসের দিকে রওনা হলাম। অনেক দূর এসে একবার পিছন ফিরে দেখি, মিসেস রায় তখনও আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

গেস্ট হাউসে ঢুকতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সিগারেট শেষ। তাই

গেস্ট হাউসে না ঢুকে এগিয়ে গেলাম ট্রেভর রোডের মোড়ে এফ-আর-আই-এর ঐ ছোট্ট মার্কেটের দিকে। বেশি দূর নয় মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম।

এফ-আর-আই-এর এই মার্কেটটা নেহাতই ছোট। মাত্র কয়েকটা দোকান। প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। চাল-ডাল-আটা ময়দা থেকে ওল্ড স্পাইস—উইলকিনসন ব্লেড—হেয়ার রিমুভার পর্যন্ত। একটা রেস্তোরাঁও আছে। এফ-আর-আই-আর মিলিটারী অ্যাকাডেমির ছেলেরাই এর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। আমার নিজেরও এখানে চা খেতে খেতেই ছেলেছোকরাদের সরস আলোচনা কানে ভেসে এসেছে। বুঝেছি, চা খাওয়াটা এদের কাছে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কিছু গোপন আলোচনা করা। এফ-আর-আই-এর প্রেসিডেন্টের ভাইঝিকে অনেকটা বৈজয়ন্তীমালার মত দেখতে বা আই-এম-এর ব্রিগেডিয়াররাও মেজর জেনারেলের ককটেলে গিয়ে মিস সিকদারকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, এসব খবর একমাত্র এই রেস্তোরাঁয় এলেই জানা যেতে পারে। আর কোথাও না।

সকালে-বিকেলে এই মার্কেটে কিছু লোকজন দেখা যায়। দুপুরের দিকে ফাঁকা থাকে। আজও ফাঁকা। তবু রেস্তোরাঁয় কয়েকটা ছেলের জটলা দেখলাম।

আমি কোণার দিকে দোকানে গেলাম। দেখলাম একজন আর্মি অফিসার কিছু কেনাকাটা করছেন। আমি চুপ করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানদার অফিসারকে একটা টুথপেস্ট এগিয়ে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল 'ইয়েস প্লীজ?'

'সিগারেট হ্যায়?'

'জি হাঁ। কোন্‌সে সিগারেট চাইয়ে?'

'দো প্যাকেট উইলস ফিল্টার।'

অফিসার পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বার দিয়ে একটা ফিডিং বোতল চাইলেন। ফিডিং বোতল আর চেঞ্জ পাবার পর অফিসারটি চলে গেলেন। আমিও দু'প্যাকেট সিগারেট নিয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলাম। চেঞ্জ ফেরত দেবার সময় দোকানদারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ আর এ নিউকামার স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'ডু প্লীজ ভিজিট এগেন।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

গেস্টহাউসে ফিরতে গিয়েও ফিরলাম না। বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম। নিউ ফরেস্টের সর্বত্রই শান্ত, স্নিগ্ধ ফাঁকা-ফাঁকা। এদিক আরো ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই চলে। বিকেলের দিকে আই-এম-এর কিছু কিছু ক্যাডেটদের এ পথ দিয়ে সাইকেলে যাতায়াত করতে দেখা যায়। কখনও কখনও ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলা দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। কিন্তু এখন, এই অপরাহ্ণ বেলায় কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

শাল-তমাল-পাইনের মধ্যে দিয়ে সুন্দর মসৃণ পিচের রাস্তা নিজের খেয়াল-খুশি মত ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। আমিও সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। ডান দিক দেখছি, বাঁদিক দেখছি, সামনে দেখছি। কখনও কখনও আবার পিছনে ফিরে দেখছি। ভারী সুন্দর। ভারী ভাল লাগছে। দেখতে দেখতে দুটো চোখ মাতাল হয়ে উঠেছে, স্বপ্নালু হয়ে উঠছে। মাতাল স্বপ্নালু দুটো চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে গলফ কোর্সের কাছে হাজির হলাম। একটু বসলাম। এবার একটা সিগারেট ধরালাম। আমি গান গাইতে জানি না, কিন্তু এখানে বসে সিগারেট খেতে খেতে তরুণ ব্যানার্জির একটা খুব পুরানো গান 'শেষ প্রহরের ভীরু নয়ন ব্যথায় ছল ছল, তবু আমি নীরব কেন একটু কিছু বলো, আপন মনে গাইতে লাগলাম। গানটা আমি জানি না। ঐ প্রথম দুটো একটা লাইনই মনে আছে।

সিগারেট খাওয়া শেষ হলো। আমার গানও বন্ধ হলো। এবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এই গানটা মনে এলো কেন?

কেন?

সেও তো এক ইতিহাস।

আমাদের শিলচরের নাজিরপট্টির আর-ডি-আই হল্‌-এ বছর বছর জলসা হতো। কলকাতা থেকে নামকরা আর্টিস্টরা যেতেন। সারা শিলচর শহর ভেঙ্গে পড়ত ওদের গান শুনতে। শিলচরের যেসব মানুষ কাজকর্ম চাকরি বাকরির জন্য আইজল বা শিলং-এ থাকতেন, তাদের অনেকেই এই জলসা শুনতে আসতেন। করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দি থেকে তো বাস বোঝাই করে লোক আসত আর-ডি-আই-এর জলসা শুনতে। ছেলেবেলায় মাগোর কোলে বসে আমি জলসা শুনেছি কিন্তু সেসব দিনের কথা আমার মনে নেই। শুনেছি আমাদের নাজিরপট্টির এই আর-ডি-আই হল্‌-এ সায়গল, পঙ্কজ, ভীষ্মদেব, জগন্ময়, যূথিকা রায় ও আরো কত নামকরা আর্টিস্ট গান গেয়েছেন। কে. সি. দে শেষবার এসে নাকি গেয়েছিলেন 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান।' কে. সি. দে'র এই গান শুনে সারা শিলচরের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল বলে মাগোর কাছে গল্প শুনেছি।

আমি যেবার বুকে ব্যাচ লাগিয়ে প্রথম ভলান্টিয়ার হলাম তখন বোধহয় সেভেন কি এইটে পড়ি। লাল আর হলুদ রিবনের ওপরে আর ডি-আই-এর রবার স্ট্যাম্প দেওয়া ব্যাচ পরে আমার সে কি উন্মাদনা। কত ছেলেমেয়েদের অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে দ্বিজেন-তরুণ-শ্যামল-মানবেন্দ্র আর সন্ধ্যা-প্রতিমা-ইলার সব সই জোগাড় করে দিয়েছিলাম, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মিলিটারী অ্যাকাডেমির তিন চারজন ক্যাডেট খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল।

এবার আমার খেয়াল হলো, আমি কি ভাবছি? কোন কারণে একবার শিলচরের কথা মনে এলেই হলো। শত সহস্র টুকরো টুকরো স্মৃতির মেঘ আমার মনের

সারা আকাশ ছেয়ে যায়। শিলচর ছাড়া তখন আর কিছু ভাবতে পারি না। কতদিন শিলচর ছেড়ে এসেছি কিন্তু এখনও সেসব স্মৃতি অম্লান। শিলচরের স্মৃতির চাইতে বড় আকর্ষণ আজও আমার নেই। তাইতো এই গল্‌ফ কোর্সে বসে তরুণ ব্যানার্জির ঐ গান গাইতে গাইতে আবার শিলচরের নাজিরপট্টিতে হারিয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। উকিলপট্টির জয়াদি আমার হাতে একটা শ্লিপ দিয়ে বললেন, 'এই মানিক, এই শ্লিপটা তরুণবাবুকে দিয়ে আয় তো।'

উকিলপট্টিকে আমরা অনেকেই শিলচরের বালিগঞ্জ মনে করতাম। জয়াদিদের বাড়ীর একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। এছাড়া শিলচরে জয়াদি একটাই ছিল। রূপ-গুণের জন্য উনি তখন বহু আলোচিতা। আমি তখন স্কুলে পড়লেও মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে টিকর বস্তিতে যেতাম। জি.সি. কলেজের ছেলেরা রাস্তার মোড়ে জটলা করত জয়াদিকে দেখতে, কথা বলতে। এ সব আমি জানতাম, বুঝতাম। সেই জয়াদি যখন লম্বা বিনুনিটা দুলিয়ে প্রায় ছুটে এসে আমার হাতে শ্লিপটা দিয়ে গেল, তখন আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

''শ্লিপটা দিলে উনি কি বলেন আমাকে বলে যাবি। বুঝলি?'

'আচ্ছা।'

আমি স্টেজের পিছনে গ্রীনরুমে গিয়ে তরুণবাবুর হাতে শ্লিপটা দিতে গিয়ে উত্তেজনায় বলেছিলাম, 'জয়াদির রিকোয়েস্ট। রাখবেন তো?'

উনি হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

আমি আনন্দে উত্তেজনায় ছুটে গিয়েছিলাম জয়াদির কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'তরুণদা বললেন, নিশ্চয়ই গাইব।'

সবার সামনে জয়াদি আমার গাল টিপে আদর করে বললেন, 'ভেরী গুড।'

কিন্তু আজ কি সেজন্য আমি এই গানটা গাইছিলাম? না, না। অনেকদিন, অনেক বছর পরে আমি নিজেই এই গানটা শুনতে চেয়েছিলাম। কলকাতায় পোস্টগ্রাজুয়েট হোস্টেলে থেকে এম-এ- পড়ছি। আই. এস-সি. পাশ করে মানসী কলকাতায় এলো ডাক্তারী পড়তে। মানসী মেডিক্যাল কলেজ রি-ইউনিয়নের জলসার একস্ট্রা একটা কার্ড জোগাড় করে আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল সেই জলসাতে। আমি নিজেই ঐ গানটা শুনতে চেয়েছিলাম, শুনেছিলাম। মানসীর পাশে বসে ঐ গানটা শুনতে ভীষণ ভাল লেগেছিল। সেই ভাললাগার স্মৃতি আজও অম্লান?

নিশ্চয়ই!

তা নয়ত নিউ ফরেস্টের এই গলফ্ খেলার মাঠের ধারে একলা বসে বসে ঐ গানটাই মনে এলো কেন? এই অনিত্য পৃথিবীতে কিছুই তো থাকে না। সবাই চলে যায়। কেউ দুদিন আগে, কেউ দুদিন পরে। আমার চার পাশের অনেকেই চলে গিয়েছেন। আমি পড়ে আছি। কিন্তু ক'দিন? যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে আমিও চলে যেতে পারি। ছেলেবেলায় মনে হতো সবকিছু থাকবে। প্রথম জীবনে

মামা আর মাগোর কাছে থাকবার সময় ভেবেছি এসব আনন্দ চিরদিন উপভোগ করব। কিন্তু পারলাম কি? কেউ পারে? মামা বেঁচে থাকার সময় একটি দিনের জন্যেও ফাটক বাজার যাইনি। যাবর প্রয়োজন হয়নি. তাগিদ বোধ করিনি। মামা মারা যাবার পর সেই আমি রোজ থলি হাতে করে ফাটক বাজার গিয়েছি, দরদস্তুর করে আলু পটল-কুমড়ো বেগুন কিনেছি। যে আমি বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন মাছ খেয়েছি, মামা মারা যাবার পর সেই আমি মাগোর পাশে বসে মাছ খেতে ভয় পেতাম, ঘেন্না করতাম।

কত কথা মনে পড়ছে। একলা একলা থাকবার এই হচ্ছে বিপদ। এই হচ্ছে মজা।

মামা মারা যাবার পর সামান্য কিছুদিনের জন্য আমি আর মাগো বাবার কাছে গিয়েছিলাম। আমি মাছ খেতাম না দেখে আমার ছোটমা—বিমাতা অস্বস্তি বোধ করতেন। মাছ খাবার জন্য উনি আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। আমি ভীষণ বিরক্ত হতাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতেই মনে হলো, কি আবোল-তাবোল ভাবছি? কোন মাথা নেই মুণ্ডু নেই। কি ভাবতে কি ভাবছি।

ভাবছিলাম, মানুষ চলে যায়, থেকে যায় স্মৃতি। টুকরো টুকরো স্মৃতি। কখন, কিভাবে কি কারণে সে স্মৃতি মনে পড়বে কেউ জানে না, জানতে পারে না।

সন্ধ্যাবেলায় ডক্টর সরকারের বাড়ীতে গিয়ে 'বেল' বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন ওঁর মেয়ে। মিসেস রায়ের কাছে ওর নাম শুনেছি। বুলা নিশ্চয়ই ডাকনাম। ভাল নাম জানি না। শুধু ভাল নাম কেন, ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না।

পর্দা সরিয়ে হাসি মুখে বললেন, 'আসুন।'

ঘরের ভিতরে যেতেই বললেন, 'বসুন।'

বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডক্টর সরকার আসেন নি?'

বুলা আমার সামনের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললো, 'আপনি চা খেতে খেতেই বাবা এসে যাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সত্যি আসবেন তো?'

বুলা হাসল। আঁচল টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন এলো, মানসীও ঠিক এমনি করে গলায় আচল জড়াতে জড়াতে হাসতো না? লেক রোডে ওর মাসীর বাড়ীতে গেলে ঠিক এমনি করে হাসতে হাসতেই বলত না, কি ক্ষিদে পেয়েছে নাকি সিনেমার টিকিটের টাকা কম পড়েছে?

বুলার হাসি দেখে এসব কথা মনে পড়ছে কেন? আজকাল তো অনেক মেয়েই গলায় আঁচল জড়ায়। এটাই তো ফ্যাশান। কিন্তু তার জন্য অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় করছে কেন?

আমি মানসীকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'গলায় আঁচল না জড়ালে বুঝি ঠিক স্টাইল হয় না?'

'আমার সব কিছুতেই তো তুমি স্টাইল দেখ।'

'তবে কি?'

'ডি-সেক্সন করার সময় আঁচল লুজ থাকলে কাজ করা যায় না। তাই অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'মড়া কাটার সময় গলায় আঁচল জড়িয়ে ছুরিকাঁচি চালাও বলে এখন জড়াচ্ছ কেন?'

'কেন খারাপ লাগে?'

'না না, খারাপ লাগবে কেন? বরং...'

আমি থেমে যেতাম। মানসী থামতে দিত না। 'বরং কি?'

'না কিছু না।'

'না বললে কিচ্ছু পাবে না।'

আমি উঠে গিয়ে ওর কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলতাম, 'বরং ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে। ইউ লুক ভেরী অ্যাট্রাকটিভ।'

ডক্টর সরকারের মেয়ে বুলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ক্ষণিক মুহূর্তের জন্যই মনে হলো আমার সামনে সেই মানসীই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু এক টুকরো মুহূর্তের জন্যই মনে হলো। পরমুহূর্তেই দেখলাম, মানসী নয়, বুলাই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বোধ হয় একটু হাঁ করেই বুলাকে দেখলাম। ভারী ভাল লাগল। স্মৃতির ঝড় কেটে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাসছেন কেন?'

'এর মধ্যেই পিসী সব বলে দিয়েছেন।'

'খারাপ কিছু বলেন নি?'

'তা জানি। পিসীর ধারণা বাবার মত লোক হয় না আর বাবা বলেন মাধুরীর মত মেয়ে হয় না।'

আমি হাসলাম।

'বসুন। চা আনছি।'

বুলা ভিতরে চলে গেল। আমি একলা ড্রইংরুমে বসে রইলাম। একলা বসে আছি অথচ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না। বরং ভালই লাগছে।

একটু পরে একটা ছোকরা চাকর এক প্লেট পাকোড়া আর নাটস এনে আমার সামনে রেখে চলে গেল। দু-এক মিনিট পর বুলা এক কাপ কফি দিয়ে বলল, 'কফি দিলাম। আপনি তো কফিই বেশী পছন্দ করেন।'

'এর মধ্যেই সে খবর জানা হয়ে গেছে?'

বুলা একটু হাসল। তারপর বলল, 'আসলে খুব বেশী লোকের সঙ্গে এখানে ঘনিষ্ঠতা হয় না বা হতে পারে না। এই লিমিটেড সোসাইটিতে নতুন কেউ এলে

তার সম্পর্কে জানাজানি হতে সময় লাগে না।' প্লেট থেকে একটা নাটস মুখে দেবার পর খেয়াল হলো বুলা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি বসবেন না?'

'এই ত বসছি।' বুলা সামনের সোফায় বসল।

'আপনার কফি?'

'একটু আগেই চা খেয়েছি, এখন আর কফি খাব না।'

'তাহলে নাটস আর পাকোড়া নিন। ওগুলো আপনার জন্যই এনেছি।'

'তা তো জানি কিন্তু আপনি একটু না নিলে আমিও শান্তিতে খেতে পারছি না।'

কফি-নাটস-পাকোড়া খাওয়া শেষ হলো।

'আপনার মাকে দেখছি না তো?'

বৌদির ছোট্ট বাচ্চা সামলাতে মা কলকাতায় গিয়েছেন।'

'আপনার দাদা কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

কথা বলতে বলতেই পকেট থেকে সিগারেট বের করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খেতে পারি?'

'বাই অল মিনস।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সিগারেট ধরালাম।

'কই আপনার বাবা তো আসছেন না?'

'আমি টেলিফোন করছি।'

বুলা টেলিফোন করতে ভিতরে চলে গেল। আমি পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সিগারেট টানছি। সেই ছোট্ট চাকরটা ট্রে নিয়ে এসে কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে গেল। সিগারেট টানতে টানতে অনেকটা পুড়ে গিয়েছে। খেয়াল হলো আসট্রে তো নেই ড্রইংরুম থেকে উঠে সামনের বারান্দায় গিয়ে ছাই ফেলে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বুলা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'কেন? আসতে দেরী আছে নাকি?'

'না।'

বুলার পিছন পিছন আমি ভিতরের একটা ঘরে গেলাম। টেলিফোন তুলে নিলাম। 'আমি সাগর বলছি।'

ডক্টর সরকার ওপাশ থেকে বললেন, 'তুমি সাগর। সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পার কিন্তু আমি তো সরকার। অনেক নিয়মকানুনে বাঁধা।'

আমি হাসলাম।

'একটা চিঠি টাইপ হচ্ছে। এটা সই করেই আসছি। ডোন্ট্ মাইন্ড।'

'না, না, মনে করার কি আছে?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ড্রইংরুমটা নেহাতই সাধারণ। ভাবতে পারিনি ভিতরের ঘর এত সুন্দর হবে।

'চমৎকার।'

'কি চমৎকার?'

'আপনাদের এই ঘরটি।'

বুলা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

'এই ঘরটা বুঝি আপনার বাবার?'

'এটা আমার ঘর।'

'কনগ্রাচুলেশন ফর ইওর টেস্ট।'

বুলা আবার হাসল। 'ঘরটাকেই সবাই পছন্দ করেন, মানুষটাকে না।'

কথাবার্তার ধরণটাও অনেকটা মানসীর মত। নতুন শাড়ি পরেই একবার মাগোকে দেখাতে আসত। মাগোকে দেখাবার পর আমার ঘরে আসবেই। কোন কথা না বলে চুপটি করে আমার পড়ার টেবিলের পাশে দাঁড়াত।

'বাঃ! সুন্দর শাড়িটা তো?'

'শাড়িটা সুন্দর আর আমি কুৎসিত, তাই না?'

আমি বলতাম, 'তোমার মত ইয়ং সুন্দরী মেয়েকে আমার মত হ্যান্ডসাম ইয়ং ছেলের প্রশংসা করা কি ঠিক?' বুলাকেও ঐ রকম একট উত্তর দিলেই ভাল হত, কিন্তু দিলাম না, পারলাম না।

'আপনাকে ভাল মন্দ বলার অধিকার তো আমার নেই।'

ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় বুলা বলল, 'এ ঘরেই বসুন না কেন।'

'আজ থাক।'

ড্রইংরুমে ফিরে আসার পর বুলার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। একটু পরেই ডক্টর সরকার এলেন।

ঘরে ঢুকেই গাড়ির চাবিটা মেয়ের হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, 'আই অ্যাম সো সরি! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আজ ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ফিরব, কিন্তু কিছুতেই হলো না।'

'আজ তো বরং তাড়াতাড়ি ফিরেছেন। সুতরাং আমিই আপনাকে ধন্যবাদ জানাব!'

বুলা হেসে ফেলল। 'দেখেছ বাবা, তোমার কি রেপুটেশন?'

ডক্টর সরকার মিষ্টি হাসলেন। 'মাধুরী অমনিই বলে।'

বুলা বলল 'তোমরা চা খাও! আমি গাড়িটা তুলে আসি।'

'আরে না না। গাড়ি তুলিস না। সাগরকে ছেড়ে আসতে হবে তো!'

আমি আপত্তি করলাম, 'আমাকে ছাড়তে যেতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব।'

ডক্টর সরকার আমার আপত্তি গ্রাহ্যই করলেন না, 'এই রাত্তিরে তুমি হেঁটে যাবে, তাই না?'

চা খেতে খেতে ডক্টর সরকার বললেন, 'আমি এমন গাড়ি চালাই যে সাইকেল রিকসাও আমাকে ওভারটেক করে চলে যায়, বাট বুলা? একসেলেন্ট ড্রাইভ করে।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি? আমি তো আমার ছেলে-মেয়ের কাছেই গাড়ি চালান শিখেছি।'

'তাই বুঝি?'

'তবে ঐ সেকেন্ড কি থার্ড গিয়ার পর্যন্ত। টপ গিয়ারে গাড়ি চালিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।'

আমি না হেসে পারলাম না।

'তুমি ড্রাইভ করতে পার?

'না।'

'শিখে নাও। বুলা দুদিনের মধ্যে তোমাকে শিখিয়ে দেবে।'

বুলা ভিতরে ছিল! একটু পরে ড্রইংরুমে এলে ডক্টর সরকার বললেন, 'হ্যাঁরে বুলা সাগরকে ড্রাইভ করা শিখিয়ে দিবি তো!'

বুলা মজা করে জানতে চাইল, 'এখুনি শিখবেন?'

'আঃ! তুইও তো তোর মা'র মত কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিস।'

আমি বুলার দিকে তাকালাম, বুলা আমার দিকে তাকাল। দুজনেই হাসলাম।

ডক্টর সরকার এবার প্রসঙ্গ পাল্টালেন। 'আমার স্ত্রী কলকাতায়।'

'হ্যাঁ, তাই শুনলাম।'

আমার নাতি হয়েছে। খবর পেয়েই আমরা সবাই গিয়েছিলাম। আমি আর বুলা চলে এলাম, উনি থেকে গেলেন।'

ডক্টর সরকার একটু পরে আবার বললেন, ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে বৌমার পক্ষে কলেজ টলেজ করা মুশকিল। তাই ওকে কিছু দিন কলকাতায় থাকতেই হবে।'

'আপনার বৌমা কি পড়ছেন?'

'বৌমা মুরলীধর গার্লস্ কলেজের লেকচারার।'

বুলা আর একবার ভিতর থেকে ঘুরে ড্রংইরুমে এলো। 'তুমি জামা-কাপড় চেঞ্জ করবে না?'

'হ্যাঁ এই যাচ্ছি। ডক্টর সরকার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন 'তুমি একটু বুলার সঙ্গে গল্প কর, আমি আসছি।'

ডক্টর সরকার চলে গেলেন। আমি একবার হাতের ঘড়ি দেখলাম।

'আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে?'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কেউ তো আমার জন্যে বসে নেই, সুতরাং দেরী হবার কিছু নেই।

কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত বোধ করলাম। আমার নিঃসঙ্গতার বেদনা প্রকাশ করতে চাই নি, কিন্তু তবুও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

'তাহলে ঘড়ি দেখছেন কেন?'

'ওটা অভ্যাস।'

'আমাদের এখানে আসার আগে ঘড়িটা খুলে আসবেন।'

আমি শুধু হাসলাম।

'বাবার সঙ্গে গল্প করতে বসলে ঘড়ি টড়ি দেখা চলবে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' বুলা একটু থেমে আবার বলল, 'খুব বেশী লোকের সঙ্গে বাবা গল্প-গুজব করতে পারেন না কিন্তু যাঁদের পছন্দ করেন তাঁদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাবেন।'

'আমাকে পছন্দ-অপছন্দ করার সময় তো এখনও আসেনি।'

'পিসী যখন রেকমেন্ড করেছেন তখন আর চিন্তা নেই।'

খাবার টেবিলে বসেও বেশ গল্প হল। মাঝে একবার বুলা মন্তব্য করল, 'আপনার মাগো বা পিসির মত রান্না করতে আমি জানি না। সুতরাং'—

'আপনি মাগোর কথাও শুনেছেন?'

'পিসী যতটুকু জানেন ততটুকুই জেনেছি।'

খাওয়া-দাওয়া পর ডক্টর সরকার বলেছিলেন, 'যে ক'দিন এখানে আছ, রোজ একবার করে ঘুরে যেও। তাছাড়া শহরে যাতায়াতের পথে আমার বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হবে।'

ডক্টর সরকার আর বুলা দুজনে এসেই আমাকে গেস্ট-হাউসে ছেড়ে গেলেন। আমি নেমে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালাম।

বুলা বলল, 'কাল আসবেন।'

ঘরে ঢুকেই মনে হলো, আমি পাল্টে গেছি। ঠিক যে সাগর চট্টোপাধ্যায় ডক্টর সরকারের বাড়িতে ডিনার খেতে গিয়েছিল, আমি যেন সেই সাগর নই। যে চৌকিদার সেলাম দিয়ে আমার ঘরের দরজা খুলে দিল, ঘরের আলো জ্বেলে দিল, খাবার জলের ফ্ল্যাস্ক রেখে গেল, তার কাছে আমি ঠিকই আছি। একটুও বদলাই নি। কিন্তু আমি নিজেই যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

অস্বস্তি?

না না অস্বস্তি কেন হবে? চাপা দুঃখের জ্বালা বোধ করছি না তো?

একটু ভাবলাম। বসে বসে, আবার পায়চারী করতে করতে ভাবলাম। না,

তা নয়। তবে কি আনন্দ? ডক্টর সরকার আর বুলা যথেষ্ট আদর-যত্ন করেছেন ঠিকই। দুজনের সঙ্গেই গল্পগুজব করে ভাল লেগেছে তবে

তবে কি?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

চেয়ারে বসে জুতো পরা পা দুটো টেবিলে তুলে দিলাম। এবার পকেট থেকে আমার পুরনো বন্ধু সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা ধরালাম।

ঘুমের মধ্যে গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন নেবার পর ঘুম ভাঙলে যেমন একটু বেশী সতেজ প্রাণবন্ত মনে হয় অথচ কারণটা বুঝা যায় না—আমার কি সেইরকম কিছু হলো?

মহা আনন্দে সিগারেট টানছি আর ভাবছি, ভাবছি আর সিগারেট টানছি। আমি তো নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম, ঘুমাবার অবকাশ পেলাম কোথায়? আমি তো মহাপ্রাণ মহাত্মা নই। আমি সাগর। মাগোর মানিক, মামার মানিক, জয়াদির মানিক, মানসীর মানিকদা....

সিগারেট টানতে গিয়েও টানলাম না। বুলার চালচলন কথাবার্তার ধরণ অনেকটা মানসীর মত। তাই না?

এবার সিগারেটে টান দিয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, তা বেশ একটু মিল আছে। আস্তে আস্তে অল্প অল্প কথা বলা, ঠোঁট চেপে একটু একটু হাসি। মানসী কোনদিন একসঙ্গে বেশী কথা বলত না, বুলাও বলে না। ছোট ছোট কাটা কাটা কথা।

শেষবারের মত সিগারেটে টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিতে দিতে মনে পড়ল, সব চাইতে বেশী মিল হাঁটাতে। লম্বা বিনুনিটা দুলিয়ে দুলিয়ে বুলা যখন হাঁটছিল, আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। আমি নেহাত জানতাম যে ও ডক্টর সরকারের মেয়ে বুলা। হঠাৎ অন্য কোন মেয়েকে পিছনে থেকে অমন হাঁটতে দেখলে হয়ত ভুল করে ডাক দিতাম-মা-ন-সী।

শিলচরে আমাদের বাড়িতে সারা নাজিরপট্টির মেয়েরা আসত। উকিলপট্টির থেকেও বহু মেয়ে আসত। মাগো আমাকে পেয়ে অনেক দুঃখ ভুলেছিল, কিন্তু বড় শখ ছিল একটা মেয়ের। সারা পাড়ার মেয়েরা এসে কি উৎপাতই করত। বাপরে বাপ। তবু কিছু বলার উপায় ছিল না। না আমার, না মামার। আমি আমার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মেয়েদের দেখতাম কিন্তু একটাও মানসীর মত হাঁটতে চলতে পারত না। পুকুরের জলে হাঁস ঘুরে বেড়াবার সময় যেমন পিছন দিকে ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ঢেউ তুলে যায়, মানসী হেঁটে গেলেও যেন ঠিক ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ঢেউ উঠত। আর সেই ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের আঘাতেই আমার নাকটা কেঁপে কেঁপে উঠত। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম, চাঞ্চল্য বোধ করতাম। আমার ভাল লাগত। বেশ ভাল লাগত।

কোন কারণে মানসী যখন আমার ঘরে আসত আমি ওকে বলতাম, 'হাউ গ্রেসফুলি ইউ ওয়াক।'

'তার মানে?'

'তুমি হাঁটলে ভারী সুন্দর লাগে।'

'কেন, এখন সামনা-সামনি বুঝি খারাপ লাগছে?'

'তা তো বলছি না।'

আমি আর কিছু না বলে শুধু ওর দিকে তাকাতাম। ও কি বুঝত জানি না, তবে মুখে বলত, 'আজকাল বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছ দেখছি।'

আমি তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি। সত্যি ওস্তাদ হতে সুরু করেছি। কিন্তু ও তো তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সবই বুঝত।

আমি না হয় অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতাম, কিন্তু মাগো?

'মানসীকে দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি জানতে চাইতাম, 'কেন মাগো?'

'আমার যদি অমন একটা মেয়ে হতো?'

আমি মজা করে বলতাম, 'ওর চাইতে অনেক ভাল মেয়ে তোমার পুত্রবধু হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মাগো বলত, 'ওর চাইতে আবার ভাল হবে কে রে?'

মানসীর রূপ-গুণের বর্ণনা করার শেষে মাগো বলত, 'মেয়েটার হাঁটা-চলা কথাবার্তা কি সুন্দর। সব কিছুতেই একটা সৌন্দর্য আছে।'

শুধু রূপ যৌবনই নয়, মেয়েদের হাঁটা-চলাও যে সৌন্দর্য তা জয়াদিকে দেখে প্রথম বুঝেছিলাম। আমি জয়াদির চাইতে অনেক ছোট ছিলাম, তবু ওর হাঁটা-চলা দেখতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। কলেজ টিলার মোড়ে মোড়ে কলেজের বড় বড় ছেলেরা কি এমনি এমনি জটলা করত? আমি তখন কলেজে না পড়লেও বেশ বুঝতাম ওরা জয়াদিকে দেখত। জয়াদির হাঁটা-চলা দেখত।

বুলাকে দেখে বুলার হাঁটা-চলা দেখে এত কথা মনে পড়ল।

তাই কি আমার এই চাপা আনন্দ? উত্তেজনা? অস্বস্তি?

একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। তবে বুলার কথা ভাবতে ভাল লাগছে। বেশ সহজ সরল আলগোছা হয়ে মিশতে পারে। কোন আধিক্য নেই, চাঞ্চল্য নেই অথচ বেশ নিবিড়। শুধু সৌজন্য নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু। এই আরো কিছুটাই যেন ওর বৈশিষ্ট্য।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করলে বেশ হতো। ওরা দুজনেই তো বার বার বলেছিলেন। আমিই তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম। এত তাড়াহুড়ো করে না এলেই ভাল হতো।

চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। ঘরের মধ্যেই একটু পায়চারী করলাম। তারপর কি মনে হলো। ড্রইং-রুম পার হয়ে সামনের লবিতে এলাম। দরজা বন্ধ। চৌকিদার

দরজা বন্ধ করে পোর্টিকোতে বেঞ্চি পেতে শুয়েছে। দরজার পাশেই টেলিফোন।

টেলিফোন।

একবার টেলিফোন করব? এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের কাছে। কিন্তু নম্বর? নম্বর তো জানা নেই। তাতে কি হলো? ঐ তো পাশেই টেলিফোন ডাইরেকটরী। আর ডাইরেকটরীতে যদি না থাকে তবে এনকোয়ারীতে জেনে নিলেই হবে। কিন্তু—

এত রাত্রে টেলিফোন করব? একটু আগে করলেই ভাল হতো। টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবছি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে বসে আকাশ-পাতাল না ভেবে একটা টেলিফোন করলেই ভাল হতো। মজা হতো। আবার ভাবছি, একবার কানেকশন দিয়েই দেখা যাক না কি হয়? বুলার বিছানার পাশেই তো টেলিফোন। আমি তো মোড়াটায় না বসে ওই বিছানায় বসেই টেলিফোনে ডক্টর সরকারের সঙ্গে কথা বললাম। টেলিফোনের বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ও রিসিভার তুলে কথা বলে তাহলে তো ঠিকই আছে। যদি দেখি বেল বেজে যাচ্ছে তাহলে টেলিফোন নামিয়ে রাখব।

কিন্তু এত রাত্রে? এতক্ষণে মনে পড়ল হাতের ঘড়িটা দেখলেই হয়। মোটে সওয়া দশটা। এমন আর কি রাত হয়েছে।

আমার চিন্তা-ভাবনা লণ্ডভণ্ড করে হঠাৎ আমার সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি চমকে উঠলাম, কিন্তু কি যেন কি কারণে রিসিভার তুলে নিলাম, 'হ্যালো।'

'চ্যাটার্জী সাব হ্যায়?'

মেয়েলী গলা শুনে আমার প্রায় মূর্ছা যাবার হলো। কোনমতে সামলে নিয়ে বললাম 'কথা বলছি।'

'আমি বুলা।'

মনে মনে বললাম, দেখছ আমার মনের শক্তি? প্রাণের টান? তোমার কথাই ভাবছিলাম....

'বলুন কি খবর?'

'টেলিফোন বাজতে না বাজতেই আপনি ধরলেন কি ব্যাপার?'

এতক্ষণে আমি স্বাভাবিক হয়েছি। মজা করে বললাম, 'আমি জানতাম এক্ষুনি আপনার টেলিফোন আসছে।'

'জানতেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'গেস্ট হাউসে গিয়েই বোধহয় আপনার খেয়াল হয়েছে?'

কি বলছে ও? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

'খেয়াল আর কি হবে?'

বুলা যেন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে এখনও খেয়াল হয়নি?'

'কি খেয়াল হবে বলুন তো?'

'বেসিনে হাত ধোবার সময় আংটি খুলে রেখেছিলেন মনে আছে?'

এতক্ষণে বুঝলাম।

আমি তাড়াতাড়ি ডান হাতটা দেখে নিয়ে বললাম, 'তাই তো।'

আংটিটা আমার নয়। মাগো বলত, 'এখন তুই এটা পর কিন্তু তোর বউ এলে তারই হবে।' আমি বলতাম, 'তোমার ট্রাংকে যে গহনাগুলো আছে সেগুলো তোমার বউকে দেবে না?'

মাগো হাসত।

নীচের ট্রাংকের গহনাগুলো আর নেই। সংসারের প্রয়োজনে সেসব গিয়েছে। শুধু এই আংটিটাই আছে। এটা আমি কিছুতেই হাতছাড়া করি না। সত্যি যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে...

'শুতে যাবাব আগে বেসিনে জল খেতে গিয়ে দেখলাম আংটিটা পড়ে আছে। আপনারই হবে।'

'আপনি শুয়ে পড়েছেন?'

'না, তবে বিছানায় বসে বসেই টেলিফোন করছি।'

'আপনার বাবা শুয়েছেন?'

বুলা হাসল। 'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবা শুয়ে পড়েছেন!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ! বাবা বেশি রাত জাগতে পারেন না।'

'আপনি বুঝি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন?'

'অনেক রাত নয়, তবে বাবার মত খাওয়া-দাওয়ার পরেই ঘুমুতে পারি না।'

এতক্ষণ কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে?

'যাই হোক, অশেষ ধন্যবাদ। এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ধন্যবাদের কি আছে? কাল সকালে এসে আংটিটা নিয়ে যাবেন।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবলাম শুধু আংটিটা আনতে যাব তোমার কাছে? আংটিটা তোমার কাছে থাকলেই বা ক্ষতি কি? আমি যাব তো নিশ্চয়ই। হয়তো রোজই যাব। সম্ভব হলে সকাল-বিকেল যাব—যাব তোমাকে দেখতে, তোমার হাঁটা-চলা দেখতে, তোমার কথা শুনতে।

ঘরে এসে পায়চারী করতে করতে ভাবলাম, আর কোন কারণে তোমার কাছে যাব না তো? একটা বিরাট শূন্যতার বোঝা আমার বুকের ওপর চেপে আছে। বাইরের দুনিয়ার কেউ সে বোঝা দেখতে পারে না, বুঝতে পারে না, কিন্তু আমি তো জানি। আমি তো নিত্য তা অনুভব করছি, জ্বালা বোধ করছি। মাঝে-মাঝে মনে হয় কেউ যদি আমাকে এই থেকে মুক্তি দিত?

তাছাড়া এই নিউ ফরেস্ট এসে এই শাল পাইনের রৌদ্রছায়ায় কাঠবেড়ালীটাকে দেখার পরই শূন্যতার জ্বালা যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। বড় বেসুরো মনে হচ্ছে নিজেকে। চারদিকে একটা ছন্দ, একটা সঙ্গীত, একটা সুর! আমার সঙ্গে এদের কারুর মিল নেই সঙ্গতি নেই। আমি এই পৃথিবীর মানুষ হলেও এই পৃথিবীতে আমার কোন দাবী নেই। আমি আছি, কিন্তু আমার কোন সত্ত্বা নেই। আমি যেন তার-বিহীন সেতার।

পায়চারী করতে করতে বিছানায় বসে পড়লাম। সিগারেট ধরালাম। পা দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট টানছি আর ভাবছি।

মিসেস রায়ের কাছে বোধহয় ধরা পড়েছি? তাই না। বুলার কাছেও ধরা পড়িনি তো?

জামা-কাপড় বদলে নিলাম। পায়জামা আর গেঞ্জি পরে একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম।

শিলচরেও আমার ঘরে একটা বড় আয়না ছিল। মাঝে মাঝেই আমি সে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। নিজেকে দেখতাম। নিজের সঙ্গে কথা বলতাম। মাগো হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লে আমি মাগোকে জড়িয়ে ধরে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। বলতাম, দেখছো মাগো তোমাকে আর আমাকে কি ওয়ান্ডারফুল দেখায়?

কথা ছিল এমনি একটা ফটো তোলা হবে, কিন্তু তা আর হয়নি। সেন্ট্রাল রোডের দেব স্টুডিও-র পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি, ভিতরে ঢুকে ছবি তোলা হয়ে ওঠেনি।

মাঝে মাঝে মাসীও ঢুকে পড়ত ঘরে। আমাকে আয়নার সামনে দেখেই হেসে ফেলত। আমি তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতাম। ও বলত, 'নিজেকে সুন্দর বলে এত দেখার কি আছে।'

আমি ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলতাম, 'যে ফুলে মৌমাছি আসে না, যে নদী সমুদ্রে হারিয়ে যায় না, তার কি সার্থকতা?' আচ্ছা এই গেস্ট হাউসে আমার ঘরে এই ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় বুলা আসবে না তো?

এখন তো অসম্ভব, কিন্তু অন্য কোনদিন? অন্য কোন সময়?

শিলচরে মাঝে মাঝে ডায়েরী লিখতাম। কলকাতায় পোস্টগ্রাজুয়েট হোস্টেলে থাকার সময়ও লিখেছি। মাগোর কথা মামার কথা, মানসীর কথা লিখেছি। লিখেছি আমার কথা, আমার মনের কথা। মনের গোপন কথা—যে -কথা কাউকে বলা যায় না, অথচ নিজের মধ্যে চেপে রাখাও যায় না, সেই সব কথা।

আমি বরাবরই কেয়ারলেস। ডায়েরীটা প্রায়ই পড়ার টেবিলের উপর পড়ে থাকত। আমি জানতাম মানসী ঘরে এসেই ডায়েরীটা পড়তে বসত। বইপত্তর গোছাতে গোছাতে মাঝে মাঝে মাগোর হাতেও পড়ত নিশ্চয়ই।

যাক্‌গে সব কথা। সে-সব দিনের ইতিহাসের কি শেষ আছে?

আজ আবার ডায়েরী লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেন ? তাতো জানি না, তবে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে কিছু অব্যক্ত কথা লিখতে পারলে ভাল লাগত।

সত্যি সত্যিই কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। কি লিখতে কি লিখলাম জানি না, তবে অনেক কিছু লিখলাম। ঘুম না পেলে হয়ত আরো লিখতাম।

ডুন ভ্যালীতে আমি উপন্যাস লিখতে বা উপন্যাসের নায়ক হতে আসি নি। এসেছি প্ল্যানিং কমিশনের হয়ে স্পেশাল সোসিও ইকনমিক সার্ভে করতে।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই সামনের টেবিলে ছাপান ফর্মের বিরাট বিরাট বান্ডিল দেখেই মনে হলো অনেক কাজ করতে হবে। ভেবেছিলাম মিঃ রায়কে টেলিফোন করে ডক্টর সরকারের বাড়ি নেমন্তন্ন খাবার কথা বলব, কিন্তু তা আর হলো না। পর-পর দু-কাপ চা খেয়ে সিগারেট টানতে টানতে টেবিলের ওপর থেকে একটা বান্ডিল খুলে কয়েকটা ছাপান ফর্ম বের করলাম। ফর্ম নয়ত, প্রশ্নের জঙ্গল।

পুরো নাম-ঠিকানা না হলেও চলবে, কারণ পুরো নাম ঠিকানা জানাবার পর এতগুলো ব্যক্তিগত ও গোপনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে কেউই রাজী হবেন না। তাছাড়া নামে ধামে আমাদের কি দরকার। কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যবসা করা বা কোন স্বার্থসিদ্ধি করা আমার বা প্ল্যানিং কমিশনের কাজ নয়। নাম-ধাম গোপন রাখলেও আর সব খবর জানতে চাই।

সব খবর মানে ?

মানে সব খবর। বাবা মার বয়েস ও শিক্ষা, কজন ভাই বোন, তাদের বয়স ও কি করে ইত্যাদি ইত্যাদি ধরনের বেশ কিছু পারিবারিক খবর জানার পর শুরু হবে ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার বয়স ? কতদূর লেখাপড়া করেছেন ? চাকরি করেন কি ? কত বছর চাকরি করেছেন ? প্রথম কোথায় চাকরি করতেন ও কত মাইনে পেতেন ? মাইনে ছাড়াও কি অন্য কোন আয় ছিল ?

আচ্ছা এসব প্রশ্নের কি সঠিক উত্তর পাব ? পেতে পারি ? সবাইকে অবশ্য বলব এসব খবর ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট তো দূরের কথা প্ল্যানিং কমিশনের স্পেশাল সার্ভে টিমের বাইরে কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু তবু লোকে কি বলবে ?

মনে একটা খটকা লাগল।

তারপর ?

ডুন ভ্যালিতে কত বছর আছেন ? চাকরি নিয়েই কি এখানে এসেছিলেন ? তখন কত মাইনে পেতেন ? এখন কত মাইনে পান ? ব্যবসা করেন কি ? কি ধরনের ব্যবসা ? ব্যবসা কি নিজেই করেছেন নাকি চালু ব্যবসা কিনেছেন ? প্রথম কত আয় ছিল ? এখন আয় কত ? গত দশ বছরে আয় বেড়েছে নাকি কমেছে ? গত দশ বছরে ব্যয় বাড়বার পাঁচটি কারণ কি ? সরকারী বাসে চড়েন ? আপনার সাইকেল-স্কুটার-মোটরগাড়ি আছে ? দশ বছর আগে কিভাবে যাতায়াত করতেন ?

সরকারী বাস-সাইকেল-স্কুটার মোটরের জন্য আনুমানিক ব্যয় কত?

এতদূর পড়েই আমি যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। বেয়ারাকে ডাক দিলাম আবার চা দেবার জন্য। আবার পড়তে শুরু করলাম।

আপনি কি ভাড়া বাড়িতে থাকেন? কত ভাড়া? দশ ও পাঁচ বছর আগে কত ভাড়া দিতেন? দশ ও পাঁচ বছর আগে কখানা ঘরের বাড়িতে থাকতেন? এখনকার বাসায় কখানা ঘর?

নিজের বাড়িতে থাকলে এসব খবর তো চাইই, তার সঙ্গে জানতে হবে কত জমি, কবে তৈরী করেছেন, কত খরচ হয়েছে, ভাড়াটে আছে কিনা, প্রতি বছর বাড়ির ট্যাক্স ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত খরচ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি বেশ আরো কিছু প্রশ্নের পর শুরু হবে ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

আপনি কি কোন ক্লাবের সভ্য? সেখানকার বার্ষিক চাঁদা কত? কি ধরনের লোকেরা ঐ ক্লাবের সভ্য? কয়েকজনের বয়স, পেশা ও আনুমানিক আয় বলতে পারেন কি? ক্লাবে খেলাধূলা বা চিত্তবিনোদনের কি কি ব্যবস্থা আছে? আপনি কোন কোন বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন? সপরিবারে না একলা ক্লাবে যান? বন্ধু বা বান্ধবীদের নিয়ে কি ক্লাবে যাওয়া যায়? আপনি কি বন্ধু বা বান্ধবীদের নিয়ে যান? ক্লাবে কি মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে? আপনি কি মদ্যপান করেন? প্রতিদিনই কি আপনি মদ্যপান করেন?

আপনি কি সিগারেট খান? কোন সিগারেট ও কত প্যাকেট খান? কতদিন ধরে সিগারেট খাচ্ছেন? বরাবরই কি আপনি এই সিগারেট খান?

বেয়ারা চা নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে একটা সিগারেট ধরালাম। কোশ্চেনেয়ারের পাতা ওল্টাতে গিয়ে মনে হলো মিঃ রায়কে একবার টেলিফোন করা উচিত ও দরকার।

'হ্যালো, আমি সাগর বলছি।'

মিঃ রায় উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন কেমন আছেন?'

'ভালই।'

'কাল কেমন গল্পগুজব হলো?'

'বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'ডক্টর সরকার বলেছিলেন বেশিক্ষণ থাকেন নি নাকি?'

আরো দু চারটে টুকটাক কথাবার্তার পর জানালাম, কাজকর্ম করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে এসেছি।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া আর দেরী করলে শুরু করাই মুশকিল হবে।'

মিঃ রায় হাসলেন। 'সন্ধ্যার দিকে আসছেন তো?'

'কাগজপত্র নিয়ে শহরের দিকে বেরুব ভাবছি। তাড়াতাড়ি ফিরলে নিশ্চয়ই

যাব।'

ফিরে এসে আবার কোশ্চেনেয়ারের পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম।

..আপনি কি দর্জিকে দিয়ে জামা তৈরি করান, না কি রেডিমেড জামা কেনেন? সুতী না টেরিলিনের জামা ব্যবহার করেন। এর আগে কি ধরনের জামা-কাপড় ব্যবহার করতেন?

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

...সংসারের জিনিসপত্র কি নগদ কেনেন? কতদিন নগদ কিনছেন? ধারে কতদিন কিনছেন? প্রতি মাসেই কি পাওনা শোধ করেন? চিকিৎসার খরচ কি নিজেকেই বহন করতে হয়? কজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করান? বাড়ির মেয়েদের বা বাচ্চাদের জন্য কি কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেন? ডাক্তারের কত ফি দেন?

আস্তে আস্তে পর্দা সরাতে সরাতে এবার অন্দরমহলে প্রবেশের পালা।

...আপনি কি বিবাহিত? কতদিন বিয়ে করেছেন? আপনার স্ত্রীর বয়স কত? কটি ছেলেমেয়ে? তাদের বয়স কত? সন্তান কম না বেশি চান? সন্তান নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন? কে আপনাকে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন? বরাবর কি এই ব্যবস্থা চলছে? আপনার স্ত্রী কি এই ব্যবস্থায় বা আগের ব্যবস্থার পরিবর্তনে খুশি? সংসার পরিচালনায় আপনার স্ত্রীর কি ভূমিকা? ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা বা পড়াশুনা কে তদারক করেন? সংসারের কাজকর্ম করার জন্য কি চাকর আছে? কতদিন চাকর রেখেছেন? ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য প্রতি মাসে কত ব্যয় করেন? দশ ও পাঁচ বছর আগে কত ব্যয় করতেন?

বাপরে বাপ! আমি নিজেই যেন পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে উঠেছি! আরো দুপাতা? সবগুলো প্রশ্ন পড়লাম না, এক ঝলক দেখে নিলাম। আত্মীয় বন্ধু দর্শন বা অন্য কোন কারণে ডেরাডুনের বাইরে যান কি? বছরে কতবার? ট্রেনে বা বাসে যান? ট্রেনে কোন্ ক্লাসে যান্? এর আগেও কি যেতেন? কোন্ ক্লাসে? জীবনবীমা আছে? কত টাকার? ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন কি? প্রতি মাসে কত করে জমা দিতে পারেন?

আর পড়লাম না। বান্ডিলটা সরিয়ে রাখলাম। এবার আর দুটো বান্ডিল টেনে নিলাম। একটি মেয়েদের জন্য, অপরটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এদের কোশ্চেনেয়ার দীর্ঘ নয়, কিন্তু—

কিন্তু কি? বিবাহিতা বা অবিবাহিতা মেয়েদের কিভাবে জিজ্ঞাসা করব তা স্বামী বা অভিভাবকের কথা? তার একান্ত নিজস্ব কথা? তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কথা? স্বাস্থ্য সম্পর্কে গোপন প্রশ্ন? পরিবার পরিকল্পনার কোন্ ব্যবস্থা তার পছন্দ?

কোশ্চেনেয়ার পড়তে পড়তেই আমার মাথা ধরে গেল। বেশ বুঝলাম, বেশ

দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। কয়েক শ লোকের সঙ্গে ইন্টারভিউ করে রিপোর্ট তৈরি করা নেহাত সহজ হবে না।

যাই হোক তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহরের দিকে। ডক্টর সরকারের বাড়ি ছাড়িয়ে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে। তার পি-এর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিলাম। অনুরোধ করলাম, 'আই উড্ লাইক টু সী হিম ফর ফিউ মিনিটস।'

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা হলো! নিজের নাম ধাম পরিচয় ও ডুন ভ্যালীতে আসার কারণ জানিয়ে বললাম, 'স্যার আই নীড ইওর কো-অপারেশন।'

ভদ্রলোক আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বাট হু হ্যাজ সিলেকটেড ডুন ভ্যালী?'

'আমি নিজেই।'

'কেন?'

'এখানকার মত মিক্সড পপুলেশন খুব কম জায়গায় পাব।'

'দ্যাটস রাইট।'

পেতলের চকচকে পেপার কাটারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ডেপুটি কমিশনার সাহেব আপন মনে কি যেন ভাবছিলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

'চাকরি করতে গিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরলাম, কিন্তু এমন ইন্টারেস্টিং জায়গা আর দেখিনি।' একটু চুপ করে আবার বললেন, 'ট্রেনিং পিরিয়ডে ছ মাস শিলং-এ ছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল..'

শিলং-এর নাম শুনেই আমি একটু পুলকিত না হয়ে পারলাম না। 'স্যার, আমি আসামের ছেলে।'

'তাই নাকি?'

'কোথায় আপনার বাড়ি?'

'শিলচর কাছাড়।'

প্রবীণ ডেপুটি কমিশনার সাহেব হেসে বললেন, 'আমি শিলচর গেছি।'

আমি আরো খুশী হয়ে হেসে ফেললাম। 'আপনি কি শিলচরে পোস্টেড ছিলেন?'

'না, পোস্টেড হইনি তবে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখার জন্য ডিব্রুগড়, শিলচর আর মিজো হিলস্ ঘুরেছিলাম।'

'কতদিন শিলচরে ছিলেন, 'স্যার?'

'কয়েকদিন। আই ওনলি রিমেম্বার রিভার বরাট।' কথাটা শেষ করেই উনি হাসলেন।

'স্যার ইট ইজ রিভার বরাক।'

'আই অ্যাম সরি। অনেকদিন হয়ে গেল তো। নাম-টাম ঠিক মনে নেই।'

কথার মোড় ঘুরল।

'আই মাস্ট থ্যাঙ্ক ইউ ফর সিলেকটিং ভ্যালী। ভারি ইন্টারেস্টিং জায়গা। এত ছোট জায়গায় এত ভ্যারাইটি দুর্লভ।...'

'তাই মনে হয় স্যার।'

'ইয়েস, ইয়েস। মানী, পভার্টি, ক্রাইম, রিলিজিয়ান, ট্যুরিস্ট, ট্রাইবাল—সব আছে।'

ডেপুটি কমিশনার সাহেব আবার পেপার কাটারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'আমি নিজে লিটারেচারের ছাত্র। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের লেকচারার ছিলাম কয়েক মাস। সাহিত্য-টাহিত্য ভুলে গেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে বইপত্তর পড়ার সময় মনে হয় ডুন ভ্যালী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে হতো।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'হোয়াই নট রাইট স্যার?'

'না না, ওসব আর পারব না। এখন শুধু সি-আর-পি-সি অব ল অ্যান্ড অর্ডারের চিন্তা।'

আমি আবার হাসলাম।

এবার কাজের কথা।

'আপনি বরং কিছু কোশ্চেনেয়ার আমাকে দিয়ে যান। আমি অফিসার আর স্টাফদের দিয়ে দেব। ওরা নিজেরাই ফিল-আপ করে দেবেন। তারপর দরকার মনে করলে ইউ ক্যান মীট দেম্...'

'দ্যাট উড্ বি ফাইন স্যার।'

'এনিথিং মোর?'

'আমি তো নিউকামার তাই কাইন্ডলি আপনি যদি কিছু লোক্যাল লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন...'

'ডাইরেকটলি খুব বেশি লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াটা ভাল হবে না, বাট ইন এনি কেস, লেট মী থিংক ইট ওভার।'

'সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার!'

তারপর উনি একবার কি যেন ভেবে বললেন, 'সী মী আফটার ফিউ ডেজ।'

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম।

'দরকার মনে করলেই চলে আসবেন। ডোন্ট হেসিটেট। এমন একটা সার্ভেতে আমি নিজেও ইন্টারেস্টেড।'

আমি তখন দাঁড়িয়ে।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব ঘণ্টা বাজাতেই বেয়ারা এলো, 'পি-এ সাব কো বোলাও।'

মুহূর্তের মধ্যে সর্টহ্যান্ড নোটবই আর পেন্সিল হাতে পি-এ এলেন।

'মাঝে মাঝে চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

'ইয়েস স্যার।'

আবার নমস্কার করে আমি বেরিয়ে এলাম পি-এর ঘরে। ওকে বেশ কিছু ফর্ম দিলাম।

আমি পি-এ সাহেবকেও ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশ একটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। রাজপুর রোড ধরে বেশ খানিকটা চলার পর মনে হলো ক্ষিদে পেয়েছে।

আরো খানিকটা চলার পর একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম।

রুটি-মাংস খেতে খেতে গত রাত্রের নেমন্তন্নের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বুলার কথা। আংটির কথা।

খাচ্ছি আর ভাবছি, ভাবছি আর খাচ্ছি। ভাবছি আংটিটা আনতে এখনই যাব, নাকি পরে? বিকেলের দিকে নাকি সন্ধ্যার পর? নাকি আজ যাবই না? কাল রাত্রে খাবার পর আজ যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে? না, না, তাতে কি হয়েছে? ওরাই তো আমাকে যেতে বলেছে। বার বার যেতে বলেছেন। তাছাড়া আংটিটা তো নিতে হবে। কিন্তু এই দুপুরবেলা? ডক্টর সরকার শুনলে রাগ করবেন কি?

খাচ্ছি আর ভাবছি আর খাচ্ছি। এখন যাওয়া হয়ত অন্যায় কিন্তু সত্যি যেতে ইচ্ছে করছে। আর একটু ভাল করে ভাবলাম। মনে হচ্ছে বুলাকে দেখতেও ইচ্ছে করছে। ওর হাঁটা চলা দেখতে ইচ্ছা করছে। হয়তো আরো কিছু।

না, না, আরো কিছু আবার কি হবে? তবে হ্যাঁ বুলার সঙ্গে গল্প করলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

খাওয়া হলো। ঘরের কোণায় বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে সামনের ময়লা পড়া আয়নাতেই একবার নিজেকে দেখে নিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই রুমাল দিয়ে খুব ভাল করে মুখ পরিষ্কার করলাম।

একি রুমাল দিয়ে এত ভাল করে মুখ পরিষ্কার করছি কেন?

কাউন্টারে সর্দারজীর কাছে পয়সা দেবার সময় টেবিলের এক পাশে টেলিফোনটা নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'একঠো টেলিফোন কর সকতা।'

সর্দারজী আমার দিকে না তাকিয়েই অনুমতি দিল।

'নমস্কার।'

বুলার মিষ্টি গলা শুনেই ভাল লাগল।

'কি করছেন?'

'বিশেষ কিছুই না।'

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

'অনেকক্ষণ, আপনি খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'গেস্ট হাউস থেকে বলছেন?'

'না। রাজপুর থেকে।'

'ওখানে কি করছেন?'

'ডি-সি'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'দেখা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের এদিকে আসবেন না?' এতক্ষণে আসল প্রশ্নটা করল বুলা।

'এক্ষুণি আসছি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'আসুন।'

আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম টেলিফোন করা কি ঠিক হলো? বুলা কিছু ভাবল নাতো? আমার কোন দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে কি?

নিজেই নিজেকে বোঝালাম, না দুর্বলতা আবার কি? তাছাড়া দুর্বলতা থাকলেও সে খবর ও জানবে কেমন করে?

আবার ভাবছি বার বার দুর্বলতার কথা ভাবছি কেন? দুর্বলতার কোন প্রশ্নই নেই। আলাপ পরিচয় হয়ে ভাল লেগেছে আর কথাবার্তা হাঁটাচলা অনেকটা যেন মানসীর মত। তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং এত মাথা ঘামাবার কি আছে?

কিচ্ছু না!

'স্কুটার?' চীৎকার করে স্কুটার রিকসা থামিয়ে উঠে পড়লাম।

দেখতে দেখতেই পৌঁছব ডক্টর সরকারের বাড়ী। কি আর এমন দূর? শহর থেকে নিউ ফরেস্ট হচ্ছে মাইল তিনেক। ডক্টর সরকারের বাড়ি তার মাঝামাঝি। শহরের শেষ-প্রান্তে। হেঁটেই যাওয়া যায়। এতটুকু রাস্তা হেঁটে যাওয়াই উচিত। নাজিরপট্টি থেকে গুরুচরণ কলেজ যতদূর তার চাইতে সামান্য বেশী হতে পারে। শিলচরে কেউ রিকসা চড়েও অতটুকু রাস্তা যায় না। বৌবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড। সবাই তো সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে। অতটুকু রাস্তার জন্য ট্রাম-বাসেও কেউ চড়তে চায় না।

এইটুকু রাস্তার জন্য আমি স্কুটার-রিকসা চড়েছি। শিলচরের লোক শুনলে হাসবে। ঠাট্টা করবে। জি.সি. কলেজের বন্ধুরা শুনলে তো সন্দেহই করবে।

সন্দেহ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ সন্দেহ। টিকর বস্তির ঐ যে গাছটার তলায় বসে আমরা আড্ডা দিতাম, যেখানে আমি প্রথম সিগারেট খাই সেখানে একবার এই খবরটা পৌঁছলে হয়। অম্বিকা পট্টির কানাই নিশ্চয়ই সব চাইতে আগে লাফিয়ে উঠবে! সুভাষনগরের

সুবোধ হয়ত মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে গাইতে সুরু করবে, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা। প্রাণ চায়...

ঠাট্টা করাটা ওদের অন্যায় হবে না। সেন্ট্রাল রোড দিয়ে সুনীলকে বেশী জোরে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখলেই আমরা পিছনে লাগতাম না?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমার হাসি পেল।

আচ্ছা অমন হঠাৎ চিৎকার করে স্কুটার রিকসা থামিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে চড়ে পড়া কি অন্যায় হয়েছে?

অন্যায় আবার কি? একলা হাঁপিয়ে উঠেছি। আর ভাল লাগে না। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কেউ যদি ভালবেসে যেতে বলে তাহলেও যাব না? নিশ্চয়ই যাব। তাছাড়া এখন তো আমি স্টুডেন্ট নই। চাকরি করছি। সাড়ে তিনশ টাকা বেসিক সব মিলিয়ে পাঁচশ টাকার ওপরে পাচ্ছি। এছাড়াও এখন ফিল্ড অ্যালাউন্স পাব। সামনের মাসে হয়ত সাড়ে ছশ-সাতশ টাকার মত পাব। এত টাকা দিয়ে আমি কি করব? নিজের জন্য কতই বা খরচ? মামা-মাগো থাকলে প্রাণপণে খরচ করতাম। বাবার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। সেই মামা মারা যাবার পর আমি আর মাগো কিছুদিনের জন্য বাবার কাছে ছিলাম। তারপর আর যাই না। আর দেখাশুনাও হয় নি। আমি গেলে হয়ত ওঁর অস্বস্তি হবে। নতুন মা হয়ত সরল হয়ে মিশতে পারবে না। তাইতো যাই না। যেতে মন চায় না। তাছাড়া ওদের কাছে যাবার কোন আকর্ষণও বোধ করি না।

বাবা বড়লোক না ঠিকই, তবে বেশ স্বচ্ছলভাবেই সংসার চালান। ব্যবসাটা নেহাত খারাপ না। দোতলা বাড়ি করেছেন। দুটো বোনের বিয়েতেও নাকি প্রচুর টাকা ব্যয় করেছেন। তাঁকে আমার টাকা পাঠাবার দরকার নেই তবুও পাঠাই মাঝে মাঝে। একশ দেড়শ। যখন যা মন চায়।

স্কুটারের ভাড়া পড়বে আট-দশ আনা। বড় জোর বারো আনা। আমার পক্ষে এই বারো আনা খরচ করা কি অন্যায়?

'এই রোখখে।' এসে গেছি। স্কুটার থেকে নেমে পড়লাম। প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে পার্স বের করে এক টাকার একটা নোট দিয়ে সোজা গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। চেঞ্জ নেবার কথা মনেই হলো না।

একি সামনের বারান্দাতেই বসে? অবাক হলাম। তবে বেশ ভাল লাগল। আমি গেট পার হয়ে লনের মধ্যে ঢুকতেই বুলা হাসতে হাসতে দাঁড়াল।

'একি আপনি বারান্দাতেই বসে আছেন?' আমি হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করলাম।

...বুলা হাসি মুখে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি আরো কয়েক পা এগুতেই ও বলল, 'আসুন।'

বুলা পর্দা ঠেলে ড্রইংরুমে ঢুকল। আমি ওর পিছনে পিছনে ঢুকলাম।

'বসুন।'

বসলাম। বললাম, 'আপনি বসুন।'

বুলা বসল না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল 'সত্যিই আপনি খেয়ে এসেছেন?'

'সত্যি খেয়েছি।'

'মিথ্যা কথা বলছেন?'

'মিথ্যা বলব কেন?'

'হয়ত লজ্জায়?'

বুলা হাসল, আমিও হাসলাম।

'লজ্জা থাকলে কেউ এ সময়ে আসে?'

বুলা সে কথার জবাব না দিয়ে জানতে চাইল 'টোস্ট আর ওমলেট খাবেন?'

'বিশ্বাস করুন আমি এক্ষুনি খেয়ে আসছি! এখন আমি কিচ্ছু খাব না। আপনি বসুন।'

বুলা বসতে বসতে বলল, 'লজ্জা করলে নিজেই কষ্ট পাবেন।'

'কষ্ট পাবার আগেই আপনাকে কষ্ট দেব।'

মিনিটখানেক দুজনেই চুপচাপ ও মুখ নীচু করে বসেছিলাম। আমি একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি যেন ভাবছে। আপন মনে। হয়ত লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু ভাবছে। হঠাৎ মুখটা তুলে বলল, 'কফি করি।'

'না, না, এক্ষুণি কেন? পরে হবে।'

'কফিও খাবেন না?'

'নিশ্চয়ই খাব, তবে পরে।'

আবার একটু চুপচাপ। আমি আবার একবার ওকে দেখে নিলাম। বেশ দেখতে। বেশ লম্বা, দোহারা চেহারা।

রংটা একটু চাপা হলেও চোখ-মুখ বেশ শার্প।

আপনি বাইরে বসেছিলেন কেন?' আমিই জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনি আসবেন বলে...'

আমি একটু অবাক হলাম। চুপ করে রইলাম।

বুলা বলল, 'এখানে একলা থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে গেছি। তাই কেউ এলে ভাল লাগে।'

'কাছাকাছি কোন বাঙালীর বাড়ি নেই?'

'না।'

'আশে-পাশের লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই?'

'ঠিক আশেপাশে আর লোক কোথায়? আর যারাও আছে তারা ঠিক মিশতে চায় না।'

'আপনার বাবা তো সরকারী বাংলোতেই থাকতে পারেন, তবে এখানে আছেন

কেন?'

'বাবা যখন প্রথম আসেন তখন কোন বাংলো খালি ছিল না বলে এই বাড়িটা ভাড়া নেন। এই বাড়িটা বাবার ভীষণ পছন্দ। হয়ত কিনেই ফেলবেন।'

'তাই নাকি?'

হ্যাঁ। তাছাড়া বাবার ধারণা এই বাড়ি ছাড়লে আর পাবেন না।'

'সরকারী বাংলোয় থাকলে আশেপাশে অনেক জানাশুনা লোক পেতেন।'

'কিন্তু বাবা সরকারী কলোনীতে থাকা পছন্দ করেন না। বলেন, সরকারী কলোনীতে থাকলে প্রপার মেন্টাল গ্রোথ হতে পারে না।'

আমি গাম্ভীর্য নিয়ে মন্তব্য করলাম, 'কথাটার পিছনে যুক্তি আছে।'

বুলা হাসতে হাসতে বলল, 'যুক্তি তো আছে কিন্তু একলা একলা থাকতেও তো প্রাণ যায়।'

'আপনিও কি এখানে অনেকদিন?'

'না। আমি গত বছরেই এসেছি।'

'এর আগে কোথায় থাকতেন?'

'কলকাতায় দাদার কাছে থেকেই পড়াশুনা করতাম।'

'আপনি কোথায় পড়তেন?'

'দাদার বাসা থেকে কাছে হতো বলে ব্রেবোর্নেই পড়েছি। তারপর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে।'

'আপনি কি নিয়ে পড়েছেন?'

'মর্ডান হিস্ট্রি।'

'আর পড়লেন না কেন?'

বুলা হেসে ফেলল, 'আর কত পড়ব?'

'কেন রিসার্চ তো করতে পারতেন?'

'আর পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না।'

বুলা হাসল।

'ভাল লাগে না বলে কি কম পড়েছেন?'

বুলা আবার হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বুলাদের বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কি এক ভাই এক বোন?'

'দু ভাই—এক বোন।'

'দাদা কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ। ছোড়দা এম. আর. এস. পি পড়তে এডিনবরা গেছে।'

'আপনিও বাইরে গেলেন না কেন?'

'এখানেই তো বেশ আছি। বাইরে গিয়ে কি করব?'

কথার যেন শেষ নেই। নির্বিবাদে সিগারেট খাচ্ছি আর বকবক করে চলেছি।

'আপনার মা কবে ফিরবেন?'

'মার ফিরতে তিন-চার মাস তো বটেই।'

বুলা একটু চুপ করে আবার বলল, 'মা নাতি পেয়ে আমাদের প্রায় ভুলেই গেছে।'

'সারাদিন কি করেন?'

'সংসারের টুকটাক কাজকর্ম আর কিছু সস্তা উপন্যাস-গল্পের বই পড়েই কাটিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি বুঝি খুব বই পড়েন?'

'কথা বলার লোক পাইনে বলে কি আর করব!"

এত কথা জানার পরও থামতে পারছি না থামতে চাইছি না। বেশ লাগছে ওর সঙ্গে কথা বলে। মানসী ছাড়া আর কোন ইয়ং মেয়ের সঙ্গে এত কথা বলার সুযোগ পাই নি। তাছাড়া অনেকদিন পর। বেশ ভালই লাগছে। কথা বলতে বলতে সুযোগ পেলেই আমি ওকে দেখছি। ভাল করে দেখছি। সামনাসামনি বসেছে যে। একবারে আমার চোখের সামনে। কয়েক হাত দূরে মাত্র। নিঃশ্বাস নেবার সময় ওর বুকটা উঁচু হচ্ছে আমি তাও দেখতে পাচ্ছি। ভাল করেই দেখতে পাচ্ছি। যখন কথা বলছিনা, দুজনেই চুপচাপ থাকছি, তখন ওর নিঃশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি।

কথায় কথায় হাতের ঘড়িটাও দেখতে ভুলে গেছি। খেয়াল হলেও দেখতাম না। দেখলেও ভাল লাগত না। মন খারাপ হয়ে যেত। হিসাব-নিকাশের বাইরে যতটুকু পাওয়া যায় তাতেই আনন্দ। তৃপ্তি। পরিতৃপ্তি।

হিসাব-নিকাশ মত তো আমি কিছুই পাইনি। মাকে পাইনি, বাবাকে পাইনি। ভাইবোনও পাইনি। হিসাব নিকাশের বাইরে মামাকে পেয়েছি, মাগোকে পেয়েছি। প্রাণভরে পেয়েছি। দশ হাতে পেয়েছি। এমন মাগো কজনের অদৃষ্টে জোটে?

আমি যা পেয়েছি হিসাব নিকাশের বাইরেই পেয়েছি। প্রত্যাশার বাইরে পেয়েছি।

কেন মানসীর সঙ্গেও কি এত ভাব হবার কোন কারণ ছিল? বিন্দুমাত্র না! নিতান্তই হঠাৎ আকস্মিক। অপ্রত্যাশিত।

হিসাব নিকাশের বাইরে আমার সব পাওনা। নিজের ব্যাঙ্কে নিজে কিছু জমা দিই না, কিন্তু তবু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আমার থেকেছে। থাকে। এখনও কিছু কিছু আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

না, না আমি ঘড়ি দেখব না।

'মিসেস রায় নিশ্চয়ই প্রায়ই আসেন।'

'সাধারণত ছুটির দিনেই আসেন।'

'আপনারা যান না?'

'যাই তবে রোজ নয়।' বুলা একটু থেমে বলল, 'ঐ পিসীর কাছে ছাড়া আর কোথাও যাই না।'

আবার একটা সিগারেট ধরালাম।

বুলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি এত সিগারেট খান কেন?'

'আপনি বুঝি সিগারেট পছন্দ করেন না?'

'তা নয়, তবে এত সিগারেট খেলে তা শরীর খারাপ হবে।'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'শরীর খারাপ হয়ে কিছুদিন হাসপাতালে থাকলেও তো বাঁচতাম।'

ভ্রূ কুঁচকে বুলা জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

আমি হেসে বললাম 'বোধহয় আই অ্যাম টায়ার্ড অফ মাইসেলফ।'

বুলা যেন বেশ একটু চিন্তিত হলো। 'আপনার আর কোন ভাইবোন নেই?'

আবার হাসতে হাসতে বললাম, 'নিঃসঙ্গ বলতে যা বোঝায় তার প্রতিমূর্তি আমি। সংসারের দীর্ঘ বৃত্তান্ত দিয়ে আর কি করব?'

বুলা এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার আংটিটা নিয়ে আসি।'

'এত ব্যস্ত হবার কি আছে।'

'পরে হয়ত ভুলে যাব!'

'আপনিও ভুলবেন না, আমিও ভুলব না।...'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মাঝপথেও বলল, 'তবুও...'

আমি ওর মুখের কথা কেড় নিয়ে বললাম, 'তবুও আংটিটা থাকলে মাঝে মাঝে বিরক্ত করার সুযোগ পাব।'

বুলা হাসল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসল। 'আংটিটা নিয়ে গেলেও আপনার আসতে বাধা নেই।'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'বেশি আসতে দেখে শেষে আপনার বাবা লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন।'

আমার মনে মনে যে সঙ্কোচ, যে দ্বিধা আছে তা যে এমনভাবে প্রকাশ করে ফেলব, ভাবতে পারিনি। চাইও নি। তবু বলে ফেলে ভালই হলো।

বুলা হেসে ফেলল, 'আমার বাবাকে অত মীন মাইন্ডেড ভাবছেন কেন?'

'না না, মীন মাইন্ডেড ভাবব কেন? তবুও...'

'কোন তবুও নেই। আপনার সম্পর্কে বাবার খুব হাই ওপিনিয়ন।'

'তাই নাকি?'

মনে মনে ভাবলুম, জিজ্ঞাসা করি, আমার সম্পর্কে তোমার ওপিনিয়ন কি? আমাকে তোমার কেমন লাগছে? আরো অনেক কথা। পারলাম না।

এবার বুলা কফি করতে গেল। নিজেই। গত রাত্রে যে চাকরটাকে দেখেছিলাম তাকে দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করছে। অথবা

কোথাও বেড়াতে গেছে। বুলা নিজেই কফি নিয়ে এলো।

'আপনাকে অযথা অনেক কষ্ট করতে হলো।'

দু হাতে দু পেয়ালা কফি নিয়ে এসে বুলা বলল, 'আপনি কি ফর্মালিটি খুব বেশী পছন্দ করেন?'

আমি ফর্মালিটি চাই! নিজের মনে নিজেই হাসলাম। আমি তো এই মুহূর্তে সব ফর্মালিটি বিসর্জন দিয়ে তোমার কাছে থাকতে পারলে বেঁচে যেতাম কিন্তু তা কি সম্ভব? কোন দিন সম্ভব?

এসব কিছুই না বলে শুধু বললাম, 'ফর্মালিটি মোটেই ভাল লাগে না, কিন্তু...'

'এত কিন্তু কিন্তু করবেন নাতো!

বাঁচলাম। বুলার কাছ থেকে এইটুকু প্রত্যাশা পেয়েই মনে হলো নিউ ফরেস্টের ঐ বোটানিক্সের সেই ছোট্ট কাঠবেড়ালিটা নিশ্চয়ই আমার দিকে অমন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাবে না। নিশ্চয়ই বাজারের ভিড়ে আর আমি নিজেকে অত নিঃসঙ্গ মনে করব না।

খুব জোরে প্রাণভরে একটা নিঃশ্বাস নিলাম। বুলা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করল কিন্তু মুখে কিছু বলল না। দুজনেই চুপচাপ কফি খেয়ে নিলাম। এবার হাতের ঘড়িটা দেখলাম। সাড়ে চারটে বাজে।

'এবার চলি।'

'এক্ষুণি কেন? একটু পরেই তো বাবা আসছেন।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার চলি! একদিনে এর চাইতে বেশি সঞ্চয় করা বোধহয় অন্যায় হবে।'

বুলাকে নমস্কার করলাম না। ধন্যবাদও জানালাম না। মানসীকে কি ধন্যবাদ জানাতাম? বারান্দার দিকে পা বাড়ালাম।

পিছন থেকে বুলা অস্ফুটস্বরে বলল, 'আংটিটা...'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে বললাম, 'ওটা থাক।'

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

সেই বল্লুপুর গেট, সেই বোটানিক্স শাল পাইনের মেলা, সেই নিউ ফরেস্টের উদার প্রান্তর পার হয়ে এলাম গেস্ট হাউসে। সবকিছুই যেন পরিচিত মনে হলো। মনে হলো আপন দুনিয়ায় বিচরণ করছি। অপরিচিতের খবর নেবার জন্য প্রথম প্রথম কাঠবিড়ালীটা হঠাৎ সামনে এসে আমাকে দেখত। পরীক্ষা করত। আজ আর আসেনি। আমাকে আর ওরা অপরিচিত মনে করে না।

সীমাহীন আকাশে পাখি উড়ে বেড়ায়। নাবিকেরা ঘুরে বেড়ায় দিগন্ত বিহীন মহাসমুদ্রে। তা হোক তবু ওদের একটা অভিষ্ট আছে। উদ্দেশ্য আছে। ঘরের খবর, বন্দরের ঠিকানা জানা আছে ওদের। এর আগে আমিও ঘুরেছি, বেঁচে থেকেছি

কিন্তু ফেরার টান, ঘরের আকর্ষণ, বন্দরের ঠিকানা ছিল না। যে পৃথিবীতে যে সমাজে বিচরণ করতাম তাকেই সবচাইতে অপরিচিত মনে হতো। আমি যে ওদের, ওরা যে আমার তা কোনদিন অনুভব করতাম না। মনে হতো এই পৃথিবীর সবকিছু সবাই আমাকে বিদ্রূপ করছে অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

শীতের ভোরে ঘন কুয়াশা আশে-পাশের কিছু দেখা যায় না। সবকিছুই থাকে কিন্তু অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। চোখের দৃষ্টি থাকলেও দেখা যায় না। আশ্চর্য! তবু সত্যি।

আমারও যেন অনেকটা সেই রকম হয়েছিল। এবার যেন আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। আগামীকালকে একেবারে শূন্য মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আগামী দিনগুলিতে কিছু পেতে পারি, পাবার সম্ভাবনা আছে। ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারছি না তবু একটা প্রত্যাশার আনন্দ অনুভব করছি।

মানসীর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন থেকে বসন্ত বিদায় নিয়েছিল। হারিয়ে গিয়েছিল ভালবাসা, মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি। আমি এই গেস্ট হাউসে আমার ঘরে চুপটি করে বসে আছি। চারদিকে কোন কল-কোলাহল নেই। নিজের হৃদয়ের স্পন্দনটাও যেন শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আবার হয়ত বসন্ত আসতে পারে, আসছে। গাছে গাছে আবার নতুন পল্লবের ইঙ্গিত না?

বুলার কাছ থেকে ফিরে এসেও ভাল লাগছে। ওর সব কিছু ভাবছি আর মনে মনে অনাগত বসন্তের ইঙ্গিত পাচ্ছি।

একটা সিগারেট ধরালাম।

ওকে বেশ দেখতে, তাই না?

নিশ্চয়ই বেশ একটা চাপা শ্রী আছে। প্রথম দেখার পর আজ যেন আরো ভাল লাগল। আগামীকাল নিশ্চয়ই আরো ভাল লাগবে। ফিল্ম অ্যাক্ট্রেসদের দেখলেই ভাল লাগে, কিন্তু বেশি কাছ থেকে, একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে আর ততটা ভাল লাগে না। ভাল লাগা তো শুধু রক্ত-মাংসের দেহটাকে নিয়েই নয়।

তবু বুলার ফিগারটা কিন্তু বেশ ফাইন। বেশ অ্যাট্রাকটিভ্!

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছি ওর ফিগারের কথা। সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত বেঁটে নয়, বেশ লম্বা। তারপর ভরাট চেহারা। মুখ গলা, হাত।

না, না, আর তো কিছু দেখিনি। দেখব কেমন করে? তবে হ্যাঁ, ফাইন কাঞ্জিভরম শাড়িটা এমন সুন্দর করে পরেছিল যে ভরাট দেহের ইঙ্গিত পেতে আমার অসুবিধে হয়নি। বরং বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। কালকের মত আজকে একটা সাধারণ ডিজাইনের ব্লাউজ পরেনি। একেবারে গলা অবধি উঠে গেছে। রাউন্ড নেক। বোতামগুলো পিছনে।

মনে পড়েছে। মানসীও মাঝে মাঝে অমন ব্লাউজ পরত। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'এই ব্লাউজ পরতে অসুবিধা হয় না?'

'কেন?'

'বোতামগুলো যে পিছনে?'

'তাতে অসুবিধে কি?'

ন্যাকামী করে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'বোতাম আটকাতে অসুবিধে হয় না?'

ও হাসতে হাসতে বলত, 'সেজন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন?'

'দুশ্চিন্তা কেন হবে?' কর্তব্যের খাতিরে জানতে চাইছি।'

'তার মানে?'

'অসুবিধে হলে আমাকে দিয়ে লাগিয়ে নিতে পার।' আমি হাসতে হাসতেই কথাটা বলতাম।

মানসীও হাসতে হাসতে জবাব দিত 'একটি থাপ্পড় খাবে।'

'আগে আটকে দিই, তারপর থাপ্পড় দিও।'

পরে মানসী বলেছিল, 'জান মাণিকদা, এই ব্লাউজের নাম কি?'

'না'

'হাসব্যান্ড ব্লাউজ।'

'তার মানে?'

'হাসব্যান্ডরা বোতাম আটকাবে বলেই বোধ হয়..'

আমি আরো কি যেন বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু বলার আগেই ও দৌড়ে পালিয়েছিল।

আজ বুলাও তো ঐ ব্লাউজ পরেছিল, ওর বোতাম আটকাতে অসুবিধে হয়নি।

আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ভাবছি ওর ব্লাউজের কথা। মানসী মুখে যাই বলুক, আমাকে অনেকদিন ওর ব্লাউজের হুক আটকে দিতে হয়েছে। বুলাকেও দিতে হবে নাতো?

সিগারেটটা ফেলে দিতে দিতে হেসে ফেললাম।

এখন আর কিছু ভাবছি না। ভাবতে ইচ্ছা করছে না। শুধু বুলার কথাই ভাবছি।

আচ্ছা, ওকে কিছু প্রেজেনটেশন দিলে হয় না? প্রেজেনটেনশন দিতে খুব ইচ্ছা করে কিন্তু দেব কাকে? কে নেবে আমার উপহার? আমায় দেওয়া উপহার নিয়ে কি আনন্দ পাবে? খুশি হবে? বুলা হবে না? নিশ্চয়ই হবে। প্রেজেনটেশন পেলে সবাই খুশি হয়, ওরও হওয়া উচিত। কিন্তু আমার প্রেজেনটেশন দেওয়া কি ঠিক হবে? মাত্র দু একদিনের পরিচয়ের পরই প্রেজেনটেশন দিলে কিছু মনে করবে নাতো? মনে করবে নাতো কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলবে উপহার দিচ্ছি?

না না, অত শত ভাববার কি কারণ আছে? পরিচয় দীর্ঘদিনের হলেই কি সব অধিকার জন্মায়? সময়ের হিসাব করেই কি পরিচয়ের গভীরতা?

তাছাড়া কোন প্রিয়জনকে কোন শুভাকাঙ্ক্ষীকে কিছু দিতে ইচ্ছা করছে। দারুণ ইচ্ছা করছে। কিছু দিলে মনটা ভাল লাগত। একটু হাল্কা বোধ হতো নিজেকে।

যা মনে করবে করুক। আমি বুলাকে একটা প্রেজেনটেশন দেবই। যদি রাগ

করে, অসন্তুষ্ট হয়, ফেরত নিয়ে নেব। রাস্তার যে কোন ভিখারীকে দিয়ে দেব আর ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেব। এর বেশি আর কি হবে?

ভাবছিলাম কি প্রেজেনটেশন দেব! বই? ফাউন্টেন পেন? লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ? নাকি শাড়ি? সুন্দর একটি শাড়ি। আমার দেওয়া শাড়ি ও সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রাখবে। সেই তো ভাল। সঙ্গে একটা ব্লাউজ? না, না, ব্লাউজ কি প্রেজেনটেশন দেব? তাছাড়া আমি ওর সাইজ জানব কেমন করে? শুধু শাড়িই দেব।

হাতের ঘড়িটা দেখলাম। আজ আর হলো না। আমি রাজপুর রোডে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া পছন্দমত শাড়ি কিনতে হলে বেশ সময় দরকার। অনেক শাড়ি না দেখলে ঠিক পছন্দসই জিনিস কেনা যায় না। বুলাকে প্রথম শাড়ি দেব; সুন্দর পছন্দসই শাড়ি দিতে হবে। ওর ভাল লাগা চাই, খুশি হওয়া চাই। ওর ভাল লাগলে, খুশি হলে আমারও ভাল লাগবে। মনে শান্তি পাব। আত্মতৃপ্তি পাব।

ঠিক করলাম কাল কিনব। দুপুরের দিকে কিনব। দোকানগুলো তখন ফাঁকা থাকে! তারপর শহরের কাজকর্ম শেষ করে ফেরার পথে ওদের বাড়ি যাব। ও তখন একলা থাকবে। যদি খুশি হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি রাগ করে, অসন্তুষ্ট হয়, আমাকে অপমান করে তাহলেও ভাল। অন্তত আর কেউ থাকবে না। আমার দুঃখের কথা, হতাশার কথা, অপমানের খবর আর কেউ জানতে পারবে না।

কত কি ভাবছি। ভাল মন্দ—দুইই! তবু বেশ লাগছে। বুলা যেন নতুন বসন্তের অগ্রদূত। ওর সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে যেন একটা সুরের, একটা ছন্দের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমার জীবন থেকে যে সুর, যে ছন্দ হারিয়ে গিয়েছিল, যে সুন্দর বিদায় নিয়েছিল, সে যেন আবার ফিরে আসছে। হয়ত ক্ষণিকের জন্য, তবু ভাল।

আমি কতদিনই বা এখানে থাকব? আরো দশ-বারো সপ্তাহ। এরপর তো আর বুলাকে পাব না, পেতে পারি না। পাবার কোন কারণ নেই, দাবী নেই। এ সব জানি, জানি দেরাদুন ছাড়ার সময় মনটা খারাপ হয়ে যাবে। ভীষণ কষ্ট হবে। অথচ কাউকে সে কথা বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না। হয়তো বুলাকেও না। তা হোক। ওর মিষ্টি স্মৃতি তো হারাবে না, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। এবার অন্ধকার নেমে এসেছে। দূরের শিবালিক পাহাড় অস্পষ্ট মত আকাশের কোলে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। গেস্ট হাউসের আলোগুলোও জ্বলছে। বেয়ারাটা আমার ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল। ওকে একটু চা দিতে বললাম।

'সাব ডিনার...'।

'ডিনার ইধারই হোগা।'

বেয়ারাটা চলে গেল। একটু পরেই চা নিয়ে এলো।

চা খেতে খেতে হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, মিঃ রায়ের খবর কি? উনি হয়ত আমারই জন্য বসে আছেন। মিসেস রায় আমার জন্য রান্না করেননি তো?

চা খেয়েই সামনের লবীতে গিয়ে টেলিফোন করলাম। চাকরটাই টেলিফোন ধরল।

'সাব কাহা?'

'সাব মেমসাব বাহার গিয়া।'

'খানাভি বাহার?'

'জি হা সাব।'

নিশ্চয়ই কোথাও নেমন্তন্ন আছে। হয়ত এই নিউ ফরেস্টেই কোন অফিসারের বাড়ি। অথবা শহরে। অথবা অন্য কোথাও।

ডক্টর সরকারের ওখানে যাননি তো?

আশ্চর্য কি!

তাহলে তো ওখানে খুব জোর আড্ডা জমেছে। খাওয়া-দাওয়াও বেশ জব্বর হবে...।

কিন্তু বুলা তো কিছু বলল না।

'তাহলে কি মিসেস রায়ই টিফিন কেরিয়ার ভর্তি করে নিয়ে গেছেন? হতে পারে। কিন্তু... ?

আবার কিছু? আমার চিন্তা-ভাবনায় মাঝে মাঝেই এই একটা কিন্তু এসে হাজির হয়। আমি চলতে চাই সামনের দিকে। পারি না। এই কিন্তু এসে বাধা দেয়, টেনে ধরে।

আমাকে তো ওরা ডাকলেন না? ওরা সবাই মিলে আনন্দ করছেন অথচ আমাকে খবর দিলেন না? ওরা সবাই আমাকে ভালবাসেন। সবাই জানেন আমি একলা। একেবারে একলা। একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত নেই। তবু!

সব ভাবনা-চিন্তার পিছনেই একটা যুক্তি থাকে। অন্তত থাকা উচিত। আমার এইসব ভাবনাব পিছনেও যুক্তি থাকা উচিত। ওরা আনন্দ করলেই যে আমাকে ভাগ দিতে হবে, তার কি কারণ আছে? আমি গেলে যদি ওরা আনন্দ পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই খবর দিতেন। ওদের দুজনেরই তো গাড়ি আছে, খবর দিতে আর কমিনিট লাগত? তাছাড়া টেলিফোন তো আছেই। বুলা যদি টেলিফোন করে ডাকত তাহলেই ছুটে যেতাম। এখন রাত্রি হয়ে গেছে। চাক্রাতা রোডের মোড়ে গিয়েও হয়ত অটো-রিক্সা পাব না। বাসের তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তাতে কি হয়েছে? হেঁটেই চলে যেতাম। একটু জোরে জোরে হাঁটলে কমিনিটের বা পথ? বড় জোর পনের-কুড়ি মিনিটের পথ।

আপন মনে এই সব কথা ভাবছি আর দূরের শিবালিক পাহাড়ের মাথায় মুসৌরীর আলো দেখছি। দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ মুসৌরী বেড়াতে যায়। আনন্দ করতে চায়। আমি তাগিদ বোধ করছি না। কেন যাব ? শূন্য মন নিয়ে কি প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায় ? দেখলেও ভাল লাগে ? সুখে দুঃখে একজন অংশীদার চাই। একলা একলা সুখ বা দুঃখ কোন কিছুই ভাল লাগে না, সহ্য করা যায় না।

বুলার সঙ্গে মুসৌরী যাওয়া যায় না ?

নাঃ। আর না। অনেক হয়েছে। চুপ করে বসে বসে ভাবলে হয়ত এবার বুলাকে নিয়ে শুতে চাইব।

উঠে পড়লাম। ঘুরে দাঁড়াতেই যেন ভূত দেখলাম।

আমার ঘরের দরজায় বুলা দাঁড়িয়ে হাসছে।

ঘরে আলো জ্বলছিল। আমি স্পষ্টই ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তবু ঘাবড়ে গেলাম। ভীষণ ভয় পেলাম।

ভ্রূ কুঁচকে বেশ একটু জোরেই জিজ্ঞাসা করলাম 'কে ?'

বুলা হাসতে হাসতে দুপা এগিয়ে এলো। 'কেন চিনতে পারছেন না ?'

'কল্পনাও করতে পারিনি আপনাকে এমনভাবে দেখতে পাব...'

'কেন আমি কি আসতে পারি না ?'

'আসতে পারলেই যে আসবেন তার কি কারণ আছে ?'

'আপনি তো আমাকে আসতে বলেন নি ?'

একটু লজ্জিত হলাম। 'তা ঠিক, তবে আমি বললেই যে আপনি আসবেন তার কি মানে আছে ?'

'আপনি আসতে বললে আসব না ?'

'আসবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

ভীষণ খুশি হলাম ওর কথা শুনে। সম্ভব হলে ওকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলতাম, 'বুলা তুমি আমাকে বাঁচালে।'

আমি চুপ করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শাড়ির আঁচলটা টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে ও বলল, 'চট-পট তৈরী হয়ে নিন।'

'কেন ?

'আমাদের ওখানে যাবেন।'

'তার মানে ?'

'পিসী প্রচুর খাবার দাবার নিয়ে হঠাৎ হাজির। খুব জোর আড্ডা জমেছে, তাই আপনাকে নিতে এলাম।'

'তা আপনি ?'

বুলা হাসতে হাসতে বলল 'আড্ডা ছেড়ে কেউ নড়তে চান না তো কি করব? অমিই চলে এলাম।'

জিভ দিয়ে ঠোঁটটাকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে এবার জানতে চাইল 'কি এত ভাবছিলেন?'

আমি অবাক হয়ে বললাম 'কই কখন?'

'চেয়ারে বসে এত গভীরভাবে কি চিন্তা করছিলেন?'

এবার আমি হাসলাম। 'চিন্তা করছিলাম নাকি?'

'প্রথমে গাড়িতে বসে বসে হর্ন বাজালাম, তারপর আপনাকে নক করলাম। কোন জবাব নেই। আপনি আপন মনে চিন্তা করছিলেন আর আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম...।'

'তাই নাকি? আমি তো বুঝতে পারিনি।'

'তাইতো বলছি কি এত ভাবছিলেন?'

হাসলাম। মনে মনে কত কথাই বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পারা যায় কি? না। পারলাম না। শুধু বললাম 'হ্যাঁ ভাবছিলাম অনেক কিছু'।

'কোন চিঠিপত্র..'

ওকে কথাটা শেষ করতে দেবার আগেই বললাম, 'আমাকে চিঠিপত্র কে লিখবে?'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। বললাম—'বসুন'।

'আজ চলি আরেকদিন বসব।'

'আজ প্রথম এলেন একটু বসবেন না?'

ও হাসল। 'আপনি ভীষণ সেন্টিমেন্টাল তাই না?'

আমি হাসলাম। মুখে কিছু জবাব দিলাম না।

আর দেরি করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। সামনের পোর্টিকোতে গিয়ে বুলা আগে গাড়িতে উঠল। সামনের বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে ডাক দিল, 'আসুন।'

উঠে পড়লাম।

গাড়ি স্টার্ট হলো। গেস্ট হাউস ছেড়ে, এফ-আর-আইয়ের মেন বিল্ডিং ঘুরে প্রায় বোটানিক্সের কাছে এসে গেছি।

বুলা হঠাৎ পাশ ফিরে বলল, 'আবার কি ভাবছেন?'

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'আপনার কথা।'

স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে টার্ন নিতে নিতে ও বলল, 'আমার কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথা কি ভাবছেন?'

'যা ভাবা যায়, তা কি সব বলা যায়?'

'এমন কি কথা ভাবছেন যা বলা যায় না?'

গাড়িটা আরেকবার টার্ন নিল। চাক্রাতা রোডে এসে গেছি।

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'ভীষণ স্পীডে গাড়ি টাড়ি আসছে, সাবধানে চালান।'

সত্যি পর-পর তিন-চারটে গাড়ি ভীষণ স্পীডে পাশ দিয়ে চলে গেল।

'আরো সাবধানে চালাব?'

আমি হাসলাম। একবার পাশ ফিরে দেখলাম।

'কি দেখছেন?

'আপনাকে।'

'কেন?'

'হাজার হোক বাড়ির ছোট মেয়ে তো। মাথায় বেশ দুষ্টু বুদ্ধি ভরা আছে।'

আর কথা হলো না। আমরা পৌঁছে গেলাম।

ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই ডক্টর সরকার বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা ছেলে।'

আমি হাঁ-করে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

'বিকেলবেলায় শুধু কফি খেয়েই পালিয়ে গেলে?'

'তাতে কি হলো?'

'তুমি জানতে না মাধুরী খাবার-দাবার নিয়ে আসবে?'

আমি কি জবাব দেবো ভাবছি। ওপাশ থেকে মিসেস রায় বললেন, 'না দাদা, আমি কোন খবর দিইনি।'

ডক্টর সরকার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন?'

মিসেস রায় বললেন, 'উনি দুপুরে বেরিয়েছিলেন, সন্ধ্যার দিকে নিশ্চয়ই এখানে আসবেন।'

ডক্টর সরকার মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন 'না না ঠিক করনি। একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক নতুন এসেছে।'

একটু থেমে বললেন, 'ইন্ এনি কেস এসে গেছে। ভালই হলো।'

খুব জোর আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া হলো। অনেকটা পিকনিকের মত আনন্দ হলো। আমার একটা নতুন উপলব্ধি হলো। বুঝলাম, ওরা সবাই আমাকে ভালবাসেন। এই আনন্দোৎসবে আমাকে অংশ না দিলেও চলত কিন্তু না, তা করেননি।

মিসেস রায় বললেন, 'কাজকর্মের পর আমাদের যে-কোন এক বাড়িতে চলে আসবেন। লজ্জা-টজ্জা করার কোন কারণ নেই।'

'না লজ্জা করব কেন?'

পিছন থেকে বুল্যার গলা শুনলাম, 'লজ্জা না করলে চুপচাপ গেস্ট হাউসে বসেছিলেন কেন?'

ওদের সবার সামনেই আমি বুলাকে বললাম, 'আমার বিরুদ্ধে ওকালতি করতে আপনাকে কে বলেছে?'

পাল্টা জবাব এলো সঙ্গে সঙ্গে, 'আপনি মিথ্যা কথা বললেও আপনাকে সাপোর্ট করব এমন গ্যারান্টি কবে দিলাম?'

বেশ রাত করেই ফিরলাম। রায়-দম্পতি আমাকে গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে একটা সিগারেট শেষ করলাম। কি মনে হলো, আরেকটা সিগারেট ধরালাম।

'বুলাকে একটা টেলিফোন করব?'

নট এ ব্যাড আইডিয়া। তবে আর একটু পরে। ও ততক্ষণে নিশ্চয়ই নিজের ঘরে চলে যাবে। ডক্টর সরকার ঘুমিয়ে পড়বেন। সেই ভাল, সিগারেট শেষ করে জামাকাপড় পাল্টে নিলাম। তারপর পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে সামনের লবিতে গিয়ে টেলিফোন করলাম।

টেলিফোনের ঘন্টা বাজতেই বুলার গলা পেলাম, 'এখনও শুতে যাননি?'

'না। ভাবলাম আপনাকে একবার ধন্যবাদ জানিয়ে শুতে যাই।'

'কেন?'

'আপনার জন্য সারাটা দিন বেশ কাটল। অনেক দিন পর এমন আনন্দ পেলাম।'

'তার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কি হলো?'

'সবই তো আপনার জন্য...'

'রিয়েলি?'

'রিয়েলি।'

ডাইনিংরুম থেকে চৌকিদার বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ইসারা করে দেখাল টেলিফোনের তার অনেক লম্বা। আমি ঘরে বসে বসেই টেলিফোন করতে পারি।

বুলাকে বললাম, 'একটু ধরুন। টেলিফোনটা ঘরে নিয়ে যাই।'

চৌকিদার টেলিফোন ঘরে দিয়ে গেল।

আবার কথা বলতে শুরু করলাম, 'আপনার বাবা শুয়ে পড়েছেন?'

'অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।'

'টেলিফোনের রিং বাজলেও ঘুম ভাঙেনি?'

'আমার এ ঘরে টেলিফোন এলে বাবার ওখানে আওয়াজ যায় না। বাবার ঘর তো ঐ কোণায়, তারপর দরজা বন্ধ।'

'তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই?'

বুলা হাসল, 'দুশ্চিন্তার আবার কি আছে?'

'না থাকলেই ভাল।'

'কাল কখন আসবেন?'

'আসব?'

'আসবেন না?'

'কখন আসব বলুন।'

'যখন ইচ্ছে।'

'ঠিক আছে।'

ডায়েরী লিখে শুতে শুতে অনেক রাত হয়েছিল। ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। বেয়ারার ডাকাডাকিতে, ওর বিবেচনায় মনে হয়েছে এত বেলা শুয়ে থাকা, ঘুমোন ঠিক নয়। বেচারা! ও তো জানে না আমার এই ঘুম না ভাঙলেও ক্ষতি ছিল না, কেউ চোখের জল ফেলতো না, কারুর চোখের ঘুম, মনের শান্তি, সিঁথির সিঁদুর বিদায় নিত না। ভাঙতে হতো না কারুর হাতের শাঁখা।

এখানে আসার পর প্রায় দিনই ওর ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভাঙে। ও চাকরি করে দায়িত্ব পালন করেছে। আমি খুশি আমি সন্তুষ্ট। ওর দিক থেকে ও ঠিকই করছে তবে আমার ভাল লাগে না।

ডাকাডাকি না করলে কোনদিনই আমার ঘুম ভাঙে না। সেই ছেলেবেলা থেকে। সংসারের কাজকর্মের জন্য মাগোকে ভোরবেলা উঠতে হতো। আমি উঠেই ঘ্যান ঘ্যান করব বলে মাগো আমাকে বেশ করে চাপাচুপি দিয়ে, দরজা-জানালা ভেজিয়ে রেখে কাজকর্মে লেগে পড়ত। আমি খুব ঘুমাতাম তারপর বেশ একটু বেলা হলে, সকালবেলার ঝামেলা শেষ হলে মাগো আমাকে আদর করতে করতে ঘুম থেকে তুলত। যখন স্কুলে পড়ি তখনও। এত বেলায় ওঠার জন্য আমি নিজেই মাঝে মাঝে গজ গজ করতাম, 'এত বেলায় উঠলে হোম-টাস্ক করি কেমন করে বলতো?'

মাগো বলত, 'রাত্রে করে রাখিস না কেন?'

'রাত্রে কি সব হয়? তুমি সকাল সকাল ডাক না কেন?'

'সকালে উঠলেই তো সর্দি-কাশি হবে।'

'হোকগে! হোম-টাস্ক না করে গেলে কত বকুনি খেতে হয় জান?'

এমনি করে তর্ক চলত। শেষে মাগো বলত, 'অত গরজ থাকে তো তুই সকাল সকাল উঠলেই পারিস!'

ব্যস! আমি চুপ। একেবারে স্পীকটি নট। কি বলল? ডাকাডাকি না করলে আমার ঘুম ভাঙে না। শুধু সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলিতে নয়, কলেজে পড়ার সময়ও। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে বেঘোরে ঘুমোব। মাগো আমার মুখ থেকে চাদর সরিয়ে মাথায় হাত দিতে দিতে ডাকবে, 'মানিক। এই মানিক। উঠবি না বাবা!'

দুচার মিনিট ডাকাডাকির পর আমি পাশ ফিরে শুতাম।

আবার মাগো ডাকত, 'ওঠ বাবা! অনেক বেলা হলো! কলেজ যাবি না? দুকাপ চা নিয়েই মাগো আমার ঘরে আসত। এক কাপ আমার, এক কাপ মাগোর।

আমার ঘুম ভাঙার পর, দুজনে চা খেতাম।

রবিবার ছুটির দিন সকালে মানসী আসবেই। বেশ সকাল-সকাল। মাগোর সঙ্গে সঙ্গে টুকটাক কাজকর্মে ও হাত লাগাত। গল্প করত। মানসীও কম ফাজিল ছিল না। ফাঁক পেলেই জিজ্ঞাসা করত, 'মানিকদা এখনও ওঠেনি?'

'হাতের কাজটা সেরেই ডাকব।'

'এত বেলা পর্যন্ত কেউ ঘুমোয়?'

মাগো সঙ্গে সঙ্গে আমার সমর্থনে এগিয়ে আসত, 'না, না, ওর বেলা করে ওঠাই ভাল। বেশি সকালে উঠলেই ওর সর্দি-কাশি হবে।'

ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে প্রত্যেক মায়েরই কিছু কিছু বিচিত্র ধারণা থাকে। কোন যুক্তি তর্ক সেখানে খাটে না। অন্ধ স্নেহের কাছে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কি হবে? আমার সম্পর্কেও মাগোর কিছু কিছু বিচিত্র ধারণা ছিল। কবে, কোন জন্মে ভোরবেলায় ঠাণ্ডা লেগে আমার একবার সর্দি-কাশি হয়েছিল বলে মাগো কোনদিনই আমাকে ভোরে উঠতে দিত না।

মানসী কি এই নিয়ে কম ঠাট্টা করত?

ছুটির দিন মানসীই আমাকে ডেকে দিত। ও আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকত, 'এই মানিকদা! উঠবে না? অনেক বেলা হলো, শিগগির উঠে পড়।'

আমি আস্তে আস্তে চোখ মেলে ওকে দেখতাম। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে স্বপ্নালু-দৃষ্টিতে দেখতাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতাম।

ও ঝুঁকে পড়েই বলত, 'চা আনব?'

'না।'

'কেন?'

ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে আমার এক ঝলক দৃষ্টি ওর অন্তঃপুরে চলে যেতে দেরি হতো না। বলতাম, 'এমন ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই তোমাকে ভীষণ ভাল লাগে।'

ও সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচলটা টানতে টানতে বলত, 'তুমি আজকাল ভীষণ অসভ্য হয়েছ।'

'এই সকালবেলা উঠেই মিথ্যে কথা বলব? যা ভাল লাগে তা বলব না?'

ও জিভ বের করে ভেংচি কেটে বলত, 'ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এলেন!'

সঙ্গে সঙ্গে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। আমি হাসতাম। শুয়ে শুয়েই হাসতাম।

একটু পরেই তিন কাপ চা নিয়ে মাগো আর মানসী আসত।

মানসী মাগোর হাতে এক কাপ চা এগিয়ে দিতে দিতে বলত, 'আচ্ছা মাসীমা, আপনি এত বেলা চা না খেয়ে বসে থাকেন কেন?'

'মানিক যে ওঠে না।'

'মানিকদা কি শিবঠাকুর যে ওর মাথায় জল না ঢেলে কিচ্ছু মুখে দিতে পারবেন না?'

মাগো হাসত। মানসীও বাঁকা চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসত।

আমি চায়ের কাপে চুমুক না দিয়েই বলতাম, 'দেখছ মাগো, বাইরের মেয়ে এসে কিভাবে সংসারে অশান্তি ঢোকায়?'

মাগো সঙ্গে সঙ্গে বলত, 'আঃ। কি যা-তা বলছিস?'

বেয়ারাটা চায়ের ট্রে পাশের টিপয়ে রেখে দিয়ে চলে যেতেই মনে পড়ল এইসব কথা। রোজ আরো বেশি করে মনে পড়ছে।

অনেক বেলা হয়েছে। বালিশের নিচে থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম সওয়া দশটা বাজে।

বাজুক।

টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতেও ইচ্ছে করছে না। ভাল লাগে না। নিজের মনের মতন এক কাপ চা তৈরি করে দেবার লোকও কেউ নেই।

মিঃ রায় বা বুলাদের বাড়িটাও কাছে হলে না হয় বলতাম...!

কি বলতাম?

মিসেস রায় বা বুলাকে কি রোজ চা দিয়ে যাবার কথা বলতে পারতাম? অসম্ভব। ওদের প্রতি আমার দাবী? কি অধিকার? রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নের ক্লান্ত পথিকদের মত একটু গাছের ছায়ায় বসেছি মাত্র। গাছও আমার নয়, ছায়াও আমার নয়। ওরা কেউই আমার সঙ্গে যাবে না জানি। ক্ষণিকের জন্য হলেও গাছের ছায়ায় বসে শান্তি পাই। পাচ্ছি। ওদের ভাল লাগছে। ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

চাদরটা গলা অবধি টেনে দিয়ে শুয়ে আছি! কুঁড়েমি করে তখনও চা তৈরি করতে শুরু করিনি। হয়ত ঠাণ্ডাই হয়ে গেল। তবুও টি-পটের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি।

দরজায় নক করার আওয়াজ।

নিশ্চয়ই বাবুর্চিটা এসেছে। জিজ্ঞাসা করবে, লাঞ্চ খাব কিনা। শুয়ে শুয়েই বললাম, 'অন্দর আইয়ে!'

ভিতরে আসতে বলতাম না তবুও বললাম। ভাবলাম হতচ্ছাড়াটা এলে বলব চা বানিয়ে দিতে।

দরজার দিকটা দেখতে পাচ্ছি না। ভালই। তা না হলে এতবেলায় ওর বিচিত্র মুখখানা দেখতে পেতাম। ওর মুখ দেখে মনে হয়, আমি এখানে খাওয়া দাওয়া না করলেই ও খুশি।

আবার দরজায় নক করার আওয়াজ।

হয়ত অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুনতে পায়নি। এবার একটু গলা উঠিয়ে

ংরাজীতে বললাম, 'কাম ইন!'

রাত্রে শোবার সময় আমি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করি না। বন্ধ করলেই ভোরবেলা উঠে দরজা খুলে দিতে হবে। কি দরকার ঐ সব ঝামেলায়?

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পরিচিত প্রশ্ন শুনতে পাব। কয়েকটা মুহূর্ত সত্যি কেটে গেল। এখনও শ্রীমানের মুখখানা দেখতে পাচ্ছি না! ও তো প্রায় হুড়মুড় করে এসে পড়ে। আজ কি বৈষ্ণব কাব্যের রাধা বিনোদিনীদের মত...

'আপনি এখনও শুয়ে...'

চমকে উঠলাম, আঁতকে উঠলাম। মেয়ের গলা? বোধ করি একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে?'

আমি মাথাটা ঘোরালাম, বুলাও কয়েক পা এগিয়ে এলো।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। খুশিতে হাসতে হাসতে বললাম, 'বসুন বসুন।'

ও পাশের একটা চেয়ার টেনে বসল। হাসতে হাসতে বসল। বড় মিষ্টি লাগল ওর হাসি।

আমার মুখের হাসি ফুরোয়নি। 'হঠাৎ এই সৌভাগ্য?'

'আমার না আপনার?'

'না বললেও বুঝতে পারছেন, সৌভাগ্য আমারই।'

'শুধু আপনার কেন?'

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই সামনের চায়ের সরঞ্জামের দিকে ওর দৃষ্টি পড়ল, 'একি। আপনার চা খাওয়া হয়নি?'

'অদৃষ্টে আছে আপনার হাতের চা খাওয়া...'

'ব্যস! ব্যস! নো মোর!'

বুলা চা তৈরি করতে শুরু করল! আনন্দে, খুশিতে মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছি। হঠাৎ মনে হলো শুয়ে থাকলেই ভালো হতো। ও নিশ্চয়ই ঝুঁকে পড়ে চায়ের পেয়ালা দিতে আসত। মানসীর মত ওরও...

'এই নিন', বুলা হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ দিতে দিতে বললো—

'আপনি খেয়ে নিন, তারপর হবে এখন।'

'কেন?'

'আ। আপনি তো বড় ব্যস্তবাগীশ!'

এবার আমার নজর পড়ল চায়ের ট্রের দিকে। আর তো কাপ নেই।

আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলাম একটা কাপ জোগাড় করার জন্যে। দাঁড়ান, দাঁড়ান এক কাপ চা নিয়ে আসি।'

আমি এগিয়ে যেতে গেছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ও আমার হাত টেনে ধরে বলল, 'বসুন তো!'

আমার সারা শরীরের ভেতর দিয়ে যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট চলে গেল। আমি আর চলতে পারলাম না। ও তখনও আমার হাতটা ধরে, আমি স্বপ্নালু দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে চাইলাম।

ও হাত ছেড়ে বলল, মোটেও এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আপনি খেয়ে নিন, তারপরই আমি খাব।'

আমি আবার বিছানায় উঠে বসলাম। চা খেলাম। কোন কথা না বলেই। কাপ-ডিস কেড়ে নিয়ে বলল, 'আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?'

আমি জবাব দেবার আগেই ও বাথরুমের দিকে গেল। বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়ে ও থমকে দাঁড়াল, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভিতরে যেতে পারি?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে আমি ওর দিকে তাকিয়ে। ও মিটমিট করে হাসছে, আমিও মিটমিট করে হাসছি।

'হাসছেন যে?' বুলা প্রশ্ন করল।

'আপনিও তো হাসছেন?'

'আপনি হাসছেন বলে।'

'হাসব না? বাথরুমে যাবার জন্য অনুমতি চাইছেন?'

'চাইব না? আফটার অল এ প্রাইভেট চেম্বার!'

আমার উত্তরে অনুমতির অপেক্ষা না করেই বুলা বাথরুমের বেসিনে কাপ-ডিস ধুয়ে বেরিয়ে এলো।

চা তৈরি করতে করতে উত্তর দিল, 'মনে হলো অনুমতি না নিয়েও যেতে পারি।'

সহজ সরলভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে আমার ভাল লাগে। ইচ্ছা করে। সেই ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু পারিনি। হয়ে ওঠেনি। নানা কারণে। মাগো, মামা ব মানসী থাকতে কোন দৈন্য বোধ করতাম না। আমার জীবননাট্যের অন্যান্য চরিত্রের অন্তর্ধান হবার পর ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম, আমি যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছি।

মামা, মাগো, মানসী আর সারা শিলচর শহরটাকে নিয়ে প্রমত্ত ছিলাম। কোন দৈন্য, কোন মালীন্য ছিল না মনে। চারপাশের কোন মানুষের চাইতে নিজেকে হীন মনে হয়নি। বরং বিপরীতটাই মনে হয়েছে। পরে মামা, মাগো, মানসীকে হারাবার পর নিজের শূন্য হৃদয় নিয়ে হাহাকার করে ঘুরে বেড়ালাম! ঝড়টা একটু কমলে, হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি একটু শান্ত হলে, ঘুরে বেড়ালাম জানা অজানা মানুষের কাছে! একটু ভালবাসা পেতে পাগলের মত মেতে উঠেছিলাম। থিন এরারুট বিস্কুট আর চা দিয়ে সৌজন্য দেখালেন অনেকেই কিন্তু মনের তৃষ্ণা, হৃদয়ের হাহাকার কমলো না, মিটল না।

কিছু কাল পরে থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো, নিঃসঙ্গতার অন্ধকার অরণ্যে ীর্ঘদিন ঘোরাঘুরি করতে করতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিষাক্ত পোকা নের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বাসা বেঁধেছে। আর? তিলে তিলে আমাকে দংশন রছে, আমার মনের মাধুর্য, হৃদয়ের বিস্তৃতি নষ্ট করছে। আমি সঙ্কুচিত হচ্ছি।

আশ্চর্য লাগত ভেবে। শিলচরের মানুষগুলো, অতিসাধারণ মানুষগুলোও ালবাসতে পারত। ভালবাসা পেতো। কলকাতায় এসে, ডালহৌসী-এসপ্লানেড- ৌরঙ্গীর অফিস পাড়ায়, লেক রোডের ঐ ফ্ল্যাটে, বৈঠকখানার ঐ গলিতে, াগবাজার স্ট্রীটের মোড়ে আর তা খুঁজে পেলাম না। আরো অনেক জায়গায় পেলাম া। কিছুতেই পেলাম না।

কার্জন পার্কে বসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে ভাবতাম, আমার জীবননাট্যের সঙ্গে সঙ্গে কি সবাই পাল্টে গেল? ওদের জীবন থেকে মামা-মাগো- ানসী চলে যায়নি তবুও কেন ওরা এত নিরস, এত বিবর্ণ মনের মানুষ হলেন?

শামুকের মত সঙ্কুচিত হয়ে রইলাম নিজের মধ্যে।

এই ডেরাডুনে এসে, নীল আকাশের নীচে, শিবালিক পাহাড়ের কোলে ঠাঁই ায়ে শাল-তমালের মৌন সান্নিধ্য পেয়ে আবার নেশা করতে ইচ্ছা করল। দ্বিতীয় ঙ্কের পর পর দুটি দৃশ্যে মিসেস রায় আর বুলাকে পেয়ে নেশা করার নেশা ারো চেপে ধরল। তা নয়ত ঘুম ভাঙার পর কিসের একটা প্রত্যাশার নেশায় ভোর ছিলাম কেন? সঙ্কুচিত আমি প্রসারিত হতে চাইছি, তাই না?

কিন্তু এমন করে...

'কি ভাবছেন?' বুলার প্রশ্নে মনে পড়ল চুপ করে বসে আছি।

'না, তেমন কিছু না।'

'তবুও শুনি।'

'বলার মত কিছু নয়।'

'তাহলে না বলার মতই কিছু ভাবছেন?'

আমি হাসলাম, 'না তা নয়।'

বুলা যেন দাবী জানাল, 'তবে বলছেন না কেন কি ভাবছেন?'

একবার ভাবলাম এড়িয়ে যাব কিছুই বলব না। কি হবে বলে? আবার মনে লো, না, না, ও নিজেই যখন জানতে চাইছে, এগিয়ে আসছে আমার কথা নিতে, তখন বলব না কেন? আমিও একটু একটু করে এগিয়ে যাই। এগিয়ে বার জন্যই তো মনের মধ্যে কি রকম একটা ব্যাকুলতা বোধ করছি। কিছু বললে শ্চয়ই নিজেকে হাল্কা লাগবে। তাছাড়া বলার এমন সুযোগ কি সব সময় পাব?

'সত্যি কথা বলব?'

বুলা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'বললে খুশি হবো।'

ওর খুশি হবার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,

'ভাবছিলাম আপনারই কথা।'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ।'

'কেন।'

'ভাবছিলাম আপনি এসে চা করে দিলে খুব ভাল হতো।'

মুখ নিচু করে বুলা কি যেন ভাবল। মিনিট খানেক। তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ চা দেবার কথা মনে হলো?'

মানসীর কথা চেপে গিয়ে শুধু বললাম, 'মাগো ডাকাডাকি করে রোজ ঘুম ভাঙাত। ডাকাডাকি না করলে কোনদিন ঘুম ভাঙে না। ঘুম ভাঙার পর মাগোই চায়ের কাপটা এগিয়ে দিত...'

বুলা হাসল, 'বেশ আদরেই মানুষ হয়েছেন।'

'হ্যাঁ। খুব বেশি আদরে মানুষ হয়েছিলাম বলেই এমন মরুভূমির মধ্যে ঘুরে মরছি।'

ও আবার মুখ নীচু করে রইল। দাঁত দিয়ে নিচের সুন্দর পাতলা কামড়াল অনেকক্ষণ। আমিও চুপ করে বসে রইলাম।

মুখ নীচু করেই ও জিজ্ঞাসা করল, 'তা আমি চা করে দিলে ভাল হতো বলছিলেন কেন?'

'মনে হচ্ছিল আপনি এসে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলেই ভাল হতো।'

বুলা আর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। এদিক ওদিক দেখল চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।

কয়েক মিনিট পরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ এখন এলেন?'

'অন্যায় করেছি?'

'আমি কি তাই বলেছি?'

এবার বুলা বলল, 'মুসৌরী এক্সপ্রেসে রাশিয়ান ডেলিগেশন আসছে বলে বাবা স্টেশনে চলে গেলেন। লাঞ্চ-ডিনার সব কিছুই বাইরে। তাই একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

'বাড়ি থেকে সোজা এখানে আসছেন?'

'না। পিসীর ওখানে ঘুরে এলাম। কালকের টিফিন কেরিয়ারটা ফেরত দিতে গিয়ে একটু গল্প করাও হলো।'

'এখান থেকে কোথায় যাবেন?'

'চলে যেতে বলছেন?' ঠাট্টা করে বুলা।

কাব্য করে বললাম, 'নিঃসঙ্গ পথিকের পান্থশালা আপনার পদার্পণে ধন্য হলো। আপনাকে চলে যেতে বলব?'

বুলা চলে যায় নি। চলে যাবার জন্যে আসেনি। ও আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করতেই এসেছে। পিসীকে টিফিন কেরিয়ার দেওয়া উপলক্ষ্য মাত্র। এটুকু আমি

বুঝতে পারছি। শুধু পিসীর সঙ্গে গল্প করতে কি এই বয়সে ভাল লাগে। তাছাড়া...

একটু ভাবলাম।

তাছাড়া হয়ত আমার নিঃসঙ্গতার জন্য ও নিজের মনেও কিছুটা বেদনা বোধ করে। আশ্চর্য নয়।(পুরুষের মনের পথ বড় প্রশস্ত, বড় প্রকাশ্য। সেন্ট্রাল এভিনিউ-চৌরঙ্গী। মেয়েদের মনের পথগুলো বড় সরু সরু। অজস্র সুড়ঙ্গ-পথ থাকে ওদের মনের মধ্যে। বাইরে থেকে কেউ তা জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিছুতেই না। আপনজন, প্রিয়জন, বান্ধবীরাও না। মনের এই গুপ্ত পথে বিচিত্র ভাবধারার আনাগোনা হয়। বিচিত্র বা বিপরীতধর্মী সত্ত্বা একই সঙ্গে পাশাপাশি চলতে পারে ওদের মনের মধ্যে! প্রকাশ না হলে প্রকাশিত হয় না।)

বুলার মনের মধ্যেও নিশ্চয়ই...

হঠাৎ বুলা বলে উঠল, 'একটা কথা বলবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক করে, সত্যি করে বলবেন?'

'সব সত্যি কথা কি বলা যায়? আপনি বলতে পারেন?'

বুলা একটু বিপদে পড়ল। 'পুরোপুরি না হলেও অনেকটা তো বলা যায়।'

'সব সময় নয়। কখনও অনেকটা সত্যি, কখনও কিছুটা সত্যি বলা যায়, পুরোপুরি কখনই নয়।'

'তর্ক করবেন, না আমার কথার জবাব দেবেন?' প্রশ্ন করে ও হাসে।

'প্রশ্ন করুন।'

'কথা বলতে বলতে হঠাৎ কোথায় ডুব দেন, বলুন তো?'

'তার মানে?'

'যখন-তখন কি এত ভাবেন?'

আমি হাসলাম, 'সত্যিই কি এত ভাবি?'

'তাই তো মনে হয়।' বুলা থামল। চোখটা ঘুরিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে একটু কি ভাবল। 'কথা বলতে-বলতে আপনি হঠাৎ থেমে যান। তারপর মনে মনে অনেক কথা বলেন, অনেক কিছু ভাবেন?'

ওর কথা শুনে ভালই লাগল। 'আপনি ভালভাবে খেয়াল করেছেন?'

'নিশ্চয়ই। বহুবার।'

আরো ভাল লাগল।

চায়ের ট্রে নিতে বেয়ারা এলো। আবার চা দিতে বললাম।

এবার ওর কথার জবাব দিলাম, 'ঠিকই ধরেছেন। অনেক কিছুই ভাবি...'

'কি ভাবেন?'

'বড্ড বেশি একলা হয়ে পড়েছি। উল্কার মত যেন বিশ্বসংসার থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছি। তাই বড় বেশি ভাবনা হয়।'

বুলা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এত ভেবে লাভ?'

'লাভ-লোকসানের কথা তো নয়। কেউ আমাকে নিয়ে ভাবে না, আমিও কাউকে নিয়ে ভাবতে পারি না, তাই তো এত ভাবনা।'

'আপনি জানলেন কি করে আপনাকে নিয়ে কেউ ভাবে না?'

সকালবেলায় উঠেই সিরিয়াস আলোচনা করতে ইচ্ছা করল না। আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্য তাড়াতাড়ি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি ভাবেন?'

প্রশ্নটা ওকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত করল। 'আমি ভাবি কি ভাবি না, সেটা বড় কথা নয়।'

আমি হাসতে হাসতে দাবী জানাই, 'আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'মানুষ মাত্রেই পরিচিত সবার কথা ভাবে।'

'সরাসরি উত্তর দিতে আপত্তি না, লজ্জা?'

চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারা এলো। প্রশ্নের উত্তরটা চাপা পড়ল। তবে এইটুকু বুঝে, এইটুকু ভেবে আনন্দ পেলাম যে ও নিশ্চয়ই আমার কথা ভাবে, চিন্তা করে।

চা হলো। দুজনে মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছি কখনও আমাকে দেখছে, কখনও আমি ওকে দেখছি। আবার কখনও দুজনেরই কেমন খুশি-খুশি ভাব। মন।

চায়ের কাপ, ট্রে সরিয়ে রেখে বুলা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাজকর্ম কেমন এগুচ্ছে?'

'কিছু কোশ্চেনেয়ার ডিসি সাহেব রেখে দিয়েছেন। উনি ওঁর অফিসের নানা লোকজনকে দিয়ে ফিল-আপ করিয়ে দেবেন। দু-এক দিনের মধ্যেই আরো কোশ্চেনেয়ার দেবার ব্যবস্থা করব। শেষে আমি নিজে পার্সোনাল ইন্টারভিউ নেব...

'আমাকে ইন্টারভিউ করবেন না?'

ওর কথা শুনে হাসলাম।

'হাসছেন যে?'

'কোশ্চেনেয়ার দেখলে আর ইন্টারভিউ দিতে চাইবেন না।'

'কেন?'

'নানা ধরনের প্রশ্ন আছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়ত আপনার ইচ্ছা করবে না।'

'তাহলে অন্য মেয়েরা কি করবে?'

'জানি না তবে...'

'ওসব তবে-টবে ছাড়ুন। আমি চাকরি করি না বলে কি আমার ইন্টারভিউ নেবেন না?'

ওর ইন্টারভিউ দেবার আগ্রহ দেখে মজা লাগল। হাসি পেল।

আমার হাসি দেখে ও বলল, 'আবার হাসছেন?'

'হাসব না?'

'না।'

'তবে কি করব?'

বুলা আবদার ধরল, 'বলুন আমার ইন্টারভিউ কবে নেবেন।'

আমার আরো মজা লাগল। 'যেদিন আপনি বলবেন, তবে।'

'আবার তবে?'

'এত চঞ্চল হয়ে ইন্টারভিউ দেবেন কেমন করে?'

'ঠিক দেব।'

'সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কিন্তু।'

'যে প্রশ্নের জবাব জানি না সেগুলোর উত্তর দেব কি করে?'

'যে প্রশ্নের জবাব জানা নেই, সেগুলোর কথা বলছি না, তবে অন্য সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'ভেরী গুড। আপনার মত আরো কিছু মেয়ে ইন্টারভিউ দিলে বেঁচে যেতাম।'

'মেয়েদের ইন্টারভিউ নিতে আপনার অসুবিধা হলে আমি নিতে পারি।'

প্রস্তাবটা শুনে লাফিয়ে উঠলাম। জানতে চাইলাম, 'সিরিয়াসলি বলছেন?'

'তবে কি? চুপচাপ বসে বসে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে কিছু কোশ্চেনেয়ার দিয়ে দেব। জানাশুনা মেয়েদের ইন্টারভিউ করে দেবেন।'

আমি উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা কোশ্চেনেয়ার এনে ওর হাতে দিলাম, 'এটা ভাল করে পড়বেন।'

বুলা কোশ্চেনেয়ার নিলে বললাম, 'আপনি এক্ষুনি যাবেন?'

'কেন বলুন তো?'

'ব্যস্ত না হলে একটু বসুন। আমি স্নান করে আসি।'

বুলা বসল। আমি বাথরুমে গেলাম। সবকিছু সেরে, স্নান করে জামা-প্যান্ট পরে বেরুতে-বেরুতে একটু দেরিই হলো। ঘরে এসে দেখি বুলা কাচের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে শিবালিক পাহাড়কে ডিঙিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে আমার ঘরে। বেশ লাগল দেখতে। মনে হলো, সূর্যরশ্মি তো রোজই ঘরে আসে কিন্তু এমন করে তো ঘর আলো হয় না, কোনদিন।

দরজা খোলার আওয়াজ হতেই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্নান করা হলো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার পারমিশন না নিয়েই ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছি।'

মনে মনে বললাম, 'আমার পারমিশন না নিয়ে তুমি আরো অনেক কিছু করলে আমি রক্ষা পেতাম, কৃতার্থ হতাম। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম। মানসী

তো...

'কি হলো? আবার কি ভাবছেন?' বুলা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল।

আমি উত্তর দেবার আগেই বেয়ারা ট্রেতে করে নাস্তা নিয়ে এলো। আমি এক ঝলক দেখে নিয়েই বুঝলাম ও নিজের জন্য কিছু অর্ডার দেয়নি।

'আপনি খাবেন না?'

'আমি তো সকাল দশটায় উঠি না যে, এগারোটায় ব্রেকফাস্ট খাব।'

'ওসব তর্ক ছাড়ুন। আপনি কিছু না খেলে আমিও খাব না।'

'জোর করেই খাওয়াবেন?'

'সে অধিকার কি আমার আছে?'

আমি 'নাস্তা' খেতে বসলাম। ওকেও এক টুকরো ওমলেট আর টোস্ট দিলাম। চা খেতে খেতে বললাম, 'নিজে নিজে উপভোগ করার চাইতে অপরকে নিয়ে, অপরকে দিয়ে উপভোগ করার অনেক আনন্দ।'

'হঠাৎ একথা বলছেন?'

'মাঠের ধান, ক্ষেতের ফসল থেকে চাকরীর টাকা শুধু নিজে উপভোগ করার মধ্যে একটা বেদনা, একটা ব্যর্থতা আছে। সেই ফসল, সেই টাকা প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করার অনেক আনন্দ, অনেক তৃপ্তি।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে বুলা বলল, 'হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে?'

'হঠাৎ নয়, অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। তবে কদিন আগে পল্টনবাজার ঘুরে কথাটা আরো বেশি মনে হচ্ছে।'

'পল্টনবাজারে কি দেখলেন?'

'শুধু পল্টনবাজারে নয়, পৃথিবীর সব বাজারে গিয়েই দেখবেন প্রিয়জনকে খুশি করার জন্য পরিশ্রমের রোজগার কি আনন্দে মানুষ খরচ করছে।'

বুলা একবার আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। একটু চুপ করে থাকল। তারপর প্রশ্ন করল, 'অমন করে খরচা করতে আপনারও বুঝি ইচ্ছা করে?'

'করবে না? আমি কি মানুষ না?'

'তবে করেন না কেন?'

আমি হাসলাম, করব। আজই 'করব তবে ভয় হয় যদি...'

'এতে ভয়ের কি আছে?'

'ভয় হয় যদি ফিরিয়ে দেয়, গ্রহণ না করে।'

'না, না, তাই কি হয়?'

'ফিরিয়ে দেবে না বলছেন?'

'আমার তো মনে হয় না।'

মনের মধ্যে কত অসংখ্য ইচ্ছা স্বপ্ন চাপা দিয়ে রেখেছি, কিন্তু আর পারলাম না। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনি ফিরিয়ে দেবেন না তো?'

বুলা চমকে উঠল, 'আমাকে? আমাকে আবার কি দেবেন? আমাকে কিছু দেবার দরকার নেই।'

'দরকার আপনার নয়, আমার।'

'আপনার আবার কি দরকার?'

'কিছু দিতে মন চাইছে। কিছু দিলে শান্তি পেতাম। নেবেন কি? ফিরিয়ে দেবেন না তো?'

'না, না, কিন্তু...'

'প্লীজ! আর কিন্তু কিন্তু করবেন না।'

এই দুনিয়ার, এই বিশ্বচরাচরে সবাই কিছু নিতে চায়, কিছু দিতে চায়। কিন্তু নেবার চাইতে দেবার নেশার জোর অনেক। নিজের ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেবার মধ্যে সার্থকতা, আনন্দ ও পরিপূর্ণতা। সূর্যকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার সবকিছু চলছে, চলবে। সেই সূর্য কতটুকু নিচ্ছে? সব কিছুই তো বিলিয়ে দিচ্ছে। সূর্যের জ্বালা বুকে নিয়ে চাঁদ মিষ্টি আলোয় ভরিয়ে দেয় সারা পৃথিবী। পাহাড়-পর্বতের অসংখ্য ক্ষীণ ধারা নিয়ে নদী নিজেকে ভরিয়ে তোলে কিন্তু সব সঞ্চয় সমুদ্রে মিলিয়ে দিয়েই তার আনন্দ, উল্লাস। মানুষও চার পাশের মানুষ, সমাজের কাছে কিছু নুড়ি কুড়িয়ে প্রাসাদ তৈরি করে এবং একদিন সে প্রাসাদের চাবি-কাঠি তুলে দেয় প্রিয়জনের হাতে, স্নেহের পাত্রের করকমলে।

ব্যতিক্রম আছে বৈকি। যে নদী সমুদ্রে হারিয়ে যায় না, মোহানায় পৌঁছে নটরাজের মত নাচতে পারে না, সে নদীর জীবন বৃথা। ব্যর্থ। কেন, আমিও তো ব্যর্থ! এই পৃথিবীতে একটা ছোট্ট শিশু পর্যন্ত নেই যাকে আদর করে, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নিজের শূন্য মন পূর্ণ করতে পারি। পারিনি, পারছি না।

সারা দুপুর কাজকর্মে কেটে গেল। বুলা খেতে বলেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেল। তবুও কাপড় কিনতে এসেছি। কাপড় পছন্দ করতে করতে ঐ সব কথা মনে হলো। মাইসোর সিল্কের শাড়িটা পছন্দ করার পর অনেকটা ব্যর্থতার গ্লানি থেকে যেন একটু মুক্তি পেলাম, রেহাই পেলাম।

অটো-রিক্সা নিয়ে ছুটে গেলাম ওদের বাড়ি। বুলা বারান্দা থেকে নেমে এসে গেট খুলে দিতেই বললাম, 'বড্ড দেরি করে দিলাম তো?'

বুলা নির্বিবাদে বলল, 'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে নাকি?'

বারান্দা পার হয়ে ড্রইংরুমে ঢুকেই সামনের একটা সোফায় বসে পড়লাম। ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ওখানে বসার আর সময় নেই। ভিতরে আসুন।'

ভিতরে গেলাম। দেখলাম ডাইনিং টেবিলে সব সাজানই আছে। আবার হুকুম, 'হাত ধুয়ে নিন।'

কোন কথা না বলে বেসিনে হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। সামনের দিকে বুলা বসল। চাকরটাই সার্ভ করল। শেষে এক এক প্লেট দই দিলে বুলা ওকেও খেতে যেতে বলল। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রইংরুমে এলাম। একটু পরে বুলাও এলো। সামনাসামনি বসল। আমি এবার শাড়ির প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দিলাম। মুখে কিছু বললাম না। ও প্যাকেটটা খুলে শাড়িটা দেখেই চমকে উঠল, 'একি করেছেন?'

'খুব অন্যায় করেছি কি?'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে?'

'ফিরিয়ে দেবেন নাকি?'

শাড়িটা কোলের ওপর রেখে ও বলল, 'কি পাগলামী করলেন বলুন তো?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'কিচ্ছু করিনি।'

'আমি ভাবতে পারিনি আপনি আজই একটা এত দামী শাড়ি কিনে হাজির হবেন।'

এবার কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'না।'

'কেন বলুন তো?'

'এত দামী শাড়ি আমার পছন্দ হয় না।'

'এটা খুব দামী শাড়ি নাকি?'

'দারুণ সস্তা, তাই না?'

আমি হাসলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটল, 'আর হাসতে হবে না।'

ঐ শাড়ি নিয়েই বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। তারপর আমি বললাম, 'আর কতক্ষণ এই আলোচনা চলবে বলুন তো?'

'অন্যায় করবেন আর কথা শুনবেন না?'

'আজ না হয় থাক। আবার কাল সকালে গেস্ট হাউসে গিয়ে বাকিটুকু শোনাবেন।'

বুলা তবু থামল না, 'কেন এতগুলো টাকা নষ্ট করলেন?'

'নষ্ট তো করিনি।'

'আপনি বুঝি এইভাবেই টাকা ওড়ান?'

'ওড়াতে চাই কিন্তু সুযোগ পাই না।'

এবার একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'ব্যাগটা যেদিন কেড়ে নেব সেদিন বুঝবেন।'

'কেড়ে নিতে হবে না, আমিই দিয়ে দিচ্ছি—' বলেই সত্যিই আমি প্যান্টের পকেট থেকে পার্সটা বের করে এগিয়ে দিলাম।

ও হাসল, 'পার্সটা দিয়ে দিতে ভয় করছে না?'

'ভয় করবে কেন?'

'আমি যদি সব খরচা করে ফেলি?'

ওর কথাটা শুনে আমি একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'পকেটমার গেলে জানতাম টাকাগুলো কোন একটা লোকের স্ত্রী-পুত্রের জন্য ব্যয় হবে, কিন্তু আমার টাকার সে সার্থকতা কোনদিন হলো না, হবে না।'

বুলা চুপ করে রইল।

আমি আবার শুরু করলাম, '"যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েই যোদ্ধার শান্তির সার্থকতা। অ্যান্টনি সেই শান্তিটুকু না পেয়ে মরবার জন্য কিভাবে কাঙালের মত ঘুরে বেড়িয়েছিল,' মনে আছে?'

ও ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ধরে চুপ করে রইল।

'মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এইরকম বিচিত্র সঙ্কট দেখা যায়। হয়ত আমার জীবনেও...

বুলা বাধা দিল, 'আঃ! কি যা তা বলছেন?'

'বলব না?'

'না।'

'বেশ। আপনিও আর শাড়ির কথা তুলবেন না।'

ও এবার সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা অনুরোধ করব?'

'করুন।'

'পিসী আপনাকে দারুণ ভালবাসেন। এই শাড়িটা বরং পিসীকে দিন আর আমাকে একটা তাঁতের শাড়ি কিনে দেবেন।'

সত্যি মিসেস রায় আমাকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন। ওর জন্যও একটা শাড়ি কেনা উচিত ছিল। 'ঠিক বলেছেন। তবে এটা দেবার দরকার নেই। আমি আর একটা শাড়ি কিনে নেব।'

'এটাই ওকে দিন। আমি কিছু মনে করব না। বরং খুশি হবো।'

'না, না তা হয় না।'

ও আরো অনেকবার অনুরোধ করল। আমি কিছুতেই স্বীকৃতি জানাতে পারলাম না।

কথায় কথায় বিকেল হয়ে গেল। চাকরটা এবার ড্রইংরুমে এসে জানতে চাইল চা করবে কিনা। বুলা জবাব দেবার আগেই আমি বললাম, 'হ্যাঁ বানাও।'

চাকরটা চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার বাবা কখন আসবেন?'

'বিকেলের দিকে একবার এসে সুট-টুট চেঞ্জ করে যাবেন।'

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই ও ভিতরে চলে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেট টানতে টানতে সামনের বারান্দায় গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসলাম। একটু পরেই বুলা এলো।

'পিসী টেলিফোন করে বলল রাত্রে খেতে।'

'সে তো ভাল কথা।'

'আপনিও যাবেন।'

'তার মানে?'

'পিসি বলল আপনাকে টেলিফোন করে পায়নি। আবার পরে করবে।'

'আমাকে ডাকলেন না কেন?'

বুলা একটু হাসি চেপে বলল, 'আমি বলিনি আপনি এখানে।'

'কেন?'

'কেন আবার? এমনি ইচ্ছা হলো।'

চা খেয়ে উঠে পড়লাম। বললাম 'আমি গেস্ট হাউসে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। ডেকে নিয়ে যাবেন।'

'আর কিছু?'

'না।'

গেস্ট হাউসে পৌঁছবার একটু পরেই মিসেস রায়ের টেলিফোন এলো।

'এক্ষুনি ফিরলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাই এর আগে ফোন করে পাইনি।'

আমি ন্যাকামি করে বললাম, 'এর আগেও বুঝি ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। রাত্রে কোথাও যাচ্ছেন না তো?'

'কোথায় আর যাব?'

'রাত্রে এখানেই খাবেন।'

'আবার আজকে?...'

'হ্যাঁ। তাতে কি হলো? দাদার আজ বাইরে ডিনার, তাই বুলাকেও বলেছি।'

'আমি একটু কাজে বসব। তাই বলছিলাম আপনি যদি তাঁকে একটু বলে দেন আমাকে যাবার সময় তুলে নিতে।'

মিসেস রায় বললেন, 'ঠিক আছে। আমি ওকে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।'

'উনি কিছু মনে করবেন না তো?'

'এতে আবার মনে করার কি আছে?'

আস্তে টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। এইবার ভাবলাম ঘরে যাই, কিন্তু গেলাম না। সামনের লনেই একটা গার্ডেন চেয়ার নিয়ে বসলাম। মনে হলো ঘটনাগুলো যেন একটু দ্রুত তালে ঘটতে আরম্ভ করেছে।

সিগারেট ধরিয়ে এইসব ভাবছি, এমন সময় জিপ নিয়ে মিঃ আদভানি হাজির। ওঁর সঙ্গে এর আগে আলাপ হয়েছে। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের লোক। দু বছরের জন্য এফ এ. ওতে যাচ্ছেন এবং সেই জন্যই এখানে এসেছেন।

'সো মিঃ চ্যাটার্জি। আমি এখন যাচ্ছি।'

'এক্ষুনি ?'

'কাল সকালে দিল্লীতে খুব জরুরী কাজ আছে বলে রাত্রিতেই পৌঁছতে হবে।'

ধন্যবাদ জানালাম। চৌকিদার জিপে মালপত্র তুলে দিতেই উনি চলে গেলেন। আমিও আবার চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে শুরু করলাম।

সিগারেট টানা শেষ হয়ে গেছে। তবু বসে আছি। ভাবছি এখুনি উঠে যাব। এমন সময় টেলিফোনের রিং বাজল। চৌকিদার ধরল। আমাকে ডাকল, 'সাব আপ্‌কা টেলিফোন।'

আবার আমার টেলিফোন ?

উঠে গেলাম। টেলিফোন তুলেই বললাম, 'সাগর চ্যাটার্জি!'

'জানি।'

'কে ? বুলা ?' আমি হাসলাম, 'আপনি ?'

'সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?'

'না, সন্দেহ হবে কেন ? কি ব্যাপার ?'

'পিসী টেলিফোন করেছিল। বললো, আপনাকে তুলে নিতে।'

'আপনি কি বললেন ?'

বুলাও যেন হাসল। বললো, 'বললাম চেষ্টা করব...'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। পিসী বকুনি দিয়ে বললো আপনাকে না নিয়ে গেলে বকুনি খাব।'

'কি ঠিক করলেন ? বকুনি খাবেন, নাকি আমাকে নিয়ে যাবেন ?'

হঠাৎ বুলা বললো, 'মনে হচ্ছে বাবা এসেছেন। এখন রাখছি।'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বুলা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমিও রাখলাম।

ঘরে গিয়ে কেমন একটা চাঞ্চল্য বোধ করছি নিজের মধ্যে। বসতে পারছি না এক জায়গায়। চাপা আনন্দে উত্তেজনায় বসতে পারছি না। চেয়ার থেকে, বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করছি ঘরের মধ্যে। এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ। অনেক কিছু একসঙ্গে ভাবছি। পারছি না। শেষ পর্যন্ত শুধু বুলার কথাই ভাবছি। তাড়াতাড়ি এলে ভাল হয়। একটু গল্প করা যাবে। গল্প করতে করতে ওকে দেখব। খুব ভাল করে দেখব। কাছ থেকে দেখব। সামনা-সামনি বসে কথা বলব। না, না একবার পাশে বসব। খুব কাছাকাছি। এমনভাবে কাছাকাছি বসব যেন ওর হাতে আমার হাত লেগে যায়। ও কি হাতটা সরিয়ে নেবে ?

ঘরে গেলাম।

পায়চারি করতে করতে এইসব ভাবছি। আর কিছু ভাবতে ইচ্ছা করছে না। পারছি না। অন্য কিছু ভাববার চেষ্টাও করছি না।

সূর্য অস্ত গেছে। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমার ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। তবু আলো জ্বালার ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা করছে না। বুলার চিন্তায় মশগুল হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে চলেছি।

'আসতে পারি ?'

বুলা এসে গেছে। 'আসুন।' খুব সংযত হয়ে উত্তর দিলেও ভিতরে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

'আলোটা জ্বালাবো ?'

'জ্বালুন।'

আলোয় সারা ঘরটা ভরে গেল।

বুলাকে দেখেই হেসে ফেললাম। খুশিতে, আনন্দে হাসলাম। ও জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছেন কেন ?'

'আপনাকে দেখে।'

'কেন ?'

'নতুন শাড়িটা পরে আপনাকে ভারি সুন্দর দেখতে লাগছে। আজকেই নতুন শাড়িটা পরবেন আশা করিনি।' সমস্ত মন-প্রাণ সত্তা দিয়ে যে শাড়িটা কিনেছি, সেই শাড়িটা ওর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে দেখে ভীষণ ভাল লাগল, হাসলাম। কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না।

'অন্য শাড়ি পরলে বুঝি খারাপ লাগে ?'

হাসতে হাসতে বললাম, 'হ্যাঁ ভীষণ খারাপ লাগে।'

নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বুলা বললো, 'এতক্ষণ কি করছিলেন ? তৈরি হতে পারেন নি ?'

'তৈরি আবার কি হবো ?'

'তাই বলে কি সারাদিনের ব্যবহার করা জামা-প্যান্ট পরেই যাবেন ?'

ও বোধহয় বলতে চাইছিল এই পোশাকে গেলে বড় বেমানান লাগবে, কিন্তু বলতে পারল না। অথবা আমাকে আরো একটু ভালভাবে দেখতে ইচ্ছা করছিল। তাও বলতে পারল না।

আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছি। ওর বোধহয় খুব অস্বস্তি হচ্ছে। 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? যান ? হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টে নিন।'

বুলা কি হুকুম করল।

'সত্যি পাল্টাতে হবে ?'

'না। ভূতের মতন চলুন।'

ওর কথা শুনে হাসি চাপা দায়। সত্যি বাথরুমে গেলাম। হাতে-মুখে সাবান দিলাম। বড় তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে অ্যান্টিরুমে গিয়ে জামা-প্যান্ট বদলে নিলাম। টেরিকটের প্যান্ট আর র' সিল্কের বুশ সার্ট। বুলা বসে আছে। তাড়াতাড়িই

বেরিয়ে এলাম।

বেশ গর্বের সঙ্গে বুলার সামনে এসে বললাম, 'এবার ঠিক আছে?'

ও একবার দেখে নিয়ে হাসল।

'হাসছেন কেন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এই বোতাম লাগান হয়েছে?'

সত্যি বুশ সার্টের বোতাম লাগাতে গণ্ডগোল করেছি। আমি কিছু বলার আগেই ও নিজে হাতে বোতামটা ঠিক করে দিল। মনে মনে ভাবলাম, বোতাম লাগাতে গণ্ডগোল না করলে কি তুমি আমার বুকে হাত দিতে!

'ধন্যবাদ।'

'এতে ধন্যবাদ জানাবার কি হলো?' কথাটা শেষ করেই ও সরে দাঁড়াল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা হাত ধরে বললাম, 'বসুন। যাচ্ছেন কোথায়?'

'চলুন আর দেরি করে কি হবে?'

'এত তাড়াতাড়ি? বসুন। একটু চা খাই।'

চায়ের অর্ডার দিলাম। চা এলো। পাশাপাশি দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে দুজনে চা খেলাম। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে গিয়ে সত্যি ওর গায়ে হাতটা লেগে গেল। ও কিছু বললো না, আমিও বললাম না। কি বলব? এবার একটা সিগারেট ধরালাম।

'আবার সিগারেট ধরালেন?' আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললাম 'হ্যাঁ।'

'আবার হ্যাঁ বলছেন?'

'তবে কি বলব ধরাইনি?'

'এত দেরি করে গিয়ে পিসিকে কি বলব?'

'বলবেন সাগর চ্যাটার্জীকে হাত মুখ পরিষ্কার করে জামা-প্যান্ট বোতাম ঠিক করে লাগিয়ে আসতে আসতে দেরি হলো।' কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রস্তাব করলাম।

ও হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আর কিছু বলব না?'

'আজকে আর কিছু নয়।'

আর দেরি করলাম না, উঠে পড়লাম। বুলার গাড়িতে বুলার পাশে বসলাম। গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরতেই দুচারজনকে পায়চারি করতে দেখলাম রাস্তায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে আপনার গাড়িতে দেখে ওরা কিছু ভাবলেন না তো।'

'ওরা কিছু ভাবলেন কিনা তা জানিনা ; তবে আপনি যে ভাবছেন তা বুঝতে পারছি।'

আমি চুপ করে আছি।

ও আবার মোড় ঘুরবার পর জিজ্ঞাসা করল, 'উত্তর দিলেন না?'

কি বলব প্রথমে ভেবে পাচ্ছিলাম না। পরে বললাম, 'আমার সৌভাগ্যে ওরা নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত হলেন। তাই না?'

আমার দিকে না তাকিয়েই ও জবাব দিল, 'জানি না।'

পাথরের কুচির রাস্তা দিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢুকতেই মিসেস রায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। গাড়ি থেকে নামতেই আমাকে বললেন, 'আসুন।'

আমি বারান্দায় উঠলাম। বুলা গাড়ির দরজা লক্ করে এগিয়ে আসতেই মিসেস রায় বললেন, 'কিরে বুলা, আজ যে তোকে চেনা যাচ্ছে না।'

বুলা থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন পিসি?'

পিসি সোজাসুজি জবাব দিলেন না। 'এ কাপড়টা পরে তোকে তো ভারি সুন্দর লাগছে।'

বুলা শুধু হাসল। এগিয়ে চলল ভিতরের দিকে। আমি আর মিসেস রায়ও ভিতরে গেলাম। বসলাম। মিসেস রায় বুলার পাশে বসে বললেন, 'এই শাড়িটা তো আগে দেখিনি?'

'আজই প্রথম বের করলাম।'

'কে পছন্দ করে কিনেছে? তোর বৌদি?'

বুলা বিপদে পড়ল। 'না বৌদি না। আমার এক বন্ধু আমাকে প্রেজেন্ট করেছে।'

মিসেস রায় হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর এমন বন্ধু কজন আছে?'

বুলাও হাসল, 'আপাতত একজন।'

বুলার কথা শুনে খুশি হলাম। তাই মাঝখান থেকে মন্তব্য করলাম, 'এমন বন্ধু বোধহয় একজন হওয়াই ভাল।'

মিসেস রায় কিছু বলার আগেই বুলা বললো, 'এমন বন্ধুত্ব একজনের সঙ্গেই হয়, তাই না পিসি।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফেরার পথে প্রায় জোর করেই গেস্ট হাউসে নামালাম। না নামিয়ে পারলাম না। ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম!

'কি ব্যাপার দরজা বন্ধ করছেন কেন?'

বললাম, 'খুব প্রাইভেট কথা আছে।'

'কি কথা?'

আমি এগিয়ে একেবারে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম! চাইলাম ওর মুখের দিকে, ওর বিস্ফারিত দুটি চোখের দিকে। বুলাও চেয়ে রইল আমার দিকে তবে কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'বলুন। কি কথা বলবেন বলছিলেন।'

'এমন বন্ধুত্ব কি একজনের সঙ্গেই হয়?'

ও মুখ নিচু করে বললো, 'জানি না।'

আমি আর বেশি কথা বললাম না, বলতে ইচ্ছা করল না। প্রয়োজনও বোধ করলাম না। দুহাত দিয়ে ওর দুটি হাত ধরে শুধু বললাম, 'ধন্যবাদ।'

বুলা চলে গেল। বাধা দিলাম না। কিন্তু ও চলে যাবার পরও শূন্যতা বোধ রছি না এই ঘরে। আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। মনে হচ্ছে আরেকজনের প্ত নিঃশ্বাস আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে যাচ্ছে, বুকে যাচ্ছে, অন্তরে যাচ্ছে। াল লাগছে। শান্তি পাচ্ছি। এই অন্ধকার রাত্রিতেই সূর্য উঠবে বলে মনে হচ্ছে।

কলকাতায় পড়তে আসার অনেকদিন পর মানসীর দেখা পেয়ে ঠিক এমনি ানন্দ হয়েছিল। ওর মাসির বাড়ির তিনতলার কোণের ঘরে ওকে একলা পেয়ে ামি হাত দুটো চেপে ধরেছিলাম। ও ফিসফিস করে বলেছিল, আঃ। ছেড়ে দাও। ক এসে পড়বে।

আমি মুখে কিছু বলিনি। আমার দুটি ঠোঁটের সামনে একটা আঙুল নিয়ে সারায় চুপ করতে বলে ওর হাত দুটি ধরে এক টান দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে িয়েছিলাম। একটু আদর করে, ওর মুখে একটু ভালবাসার চিহ্ন এঁকে দিয়ে ছেড়ে িয়েছিলাম।

আজ কেন বুলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম না! কেন ওকে একটু আদর রলাম না? একটু আদর করবার জন্য মনটা যে ব্যাকুল হয়ে আছে। ওর হাত টো ধরলাম। ও তো আপত্তি করল না? ওকে যদি বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে াদর করতাম, তাহলে কি ও রাগ করত?

জানি না। শুধু জানি বুকের ভিতরটা মরুভূমির মত শুকিয়ে আছে। হাহাকার রছে মন। সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। আর পারছি না। পারতে চাই া। বুলাকে আর একটু কাছে চাই, নিবিড় করে চাই। কিন্তু...

না, না, কোন কিন্তু নয়, কোন দ্বিধা নয়। অসংখ্য দ্বিধা আমাকে প্রায় পাগল রে তুলেছে।

বুলা চলে যাবার পর এই চেয়ারে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছি আর ভাবছি। কবারও উঠিনি। জামা-প্যান্ট পর্যন্ত ছাড়িনি। উঠতে ভাল লাগছে না। মাথার ধ্যে নানা মতলব উঁকি দিচ্ছে। একবার ভাবছি টেলিফোন করি। আবার ভাবছি, া, টেলিফোন করব না। বরং একটা চিঠি লিখি। দীর্ঘ চিঠি। লিখি মানসীর কথা, ানসীর সঙ্গে ওর মিলের কথা। পৃথিবীর সব মেয়ের মধ্যেই একটা একটা মিল াছে। মানসী আর বুলার মধ্যেও মিল আছে। অনেক মিল আছে। তাইতো বুলার ন্য আমি পাগল হয়ে উঠছি। দুটি মেয়ের মধ্যে অমিলও থাকে প্রচুর। মানসী বুলার মধ্যেও আছে, কিন্তু এখন আমি তা খেয়াল করতে পারছি না। খেয়াল রতে চাইছি না। ইচ্ছা করছে না, প্রয়োজন মনে করছি না। কিন্তু...

মনের মধ্যে আবার একটা কিন্তু এসে হাজির হলো। আমি কি ঠিক করছি? লার দিকে এমন করে এগিয়ে যাওয়া কি উচিত?

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। তবুও ঠিক বুঝতে পারছি না। মনটা চঞ্চল য়ে আছে। শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্ত বড় বেশি দৌড়াদৌড়ি করছে। ঠিকমত

সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আমার নেই। যে সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচ করতে হয়, সে অনুভূতি আমার আসছে না।

টেবিলে একটা ঘুঁসি মেরে উঠে দাঁড়ালাম। চুলোয় যাক ন্যায়-অন্যায়। এক একলা আমি পাগল হয়ে উঠেছি। এইরকম একলা একলা থাকলে আমি হয় কিছুদিনের মধ্যেই উন্মাদ হব। বুলার হাত দুটো ধরার পরও যখন কিছু বল না তখন আমি এগিয়ে যাব না কেন? যতদূর পারি এগিয়ে যাব। কিছু বিলি দেব, কিছু কুড়িয়ে নেব। তারপর যখন প্রয়োজন হবে, হিসাব-নিকাশ করা যা এখন সেসব চিন্তা করার দরকার নেই।

অ্যান্টি-রুমে জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পাঞ্জাবি পরতে পরতে মনে হ টেলিফোন তো এই ঘরেও আনা যায়। পাঞ্জাবির বোতামগুলো পর্যন্ত না আটবে টেলিফোনটা নিয়ে এলাম আমার ঘরে...

'এখনও ঘুমোননি?'

'না।'

'কি করছেন?'

'মাকে চিঠি লিখছিলাম।'

'চিঠি লেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ এই শেষ হলো।' এবার বুলা আমার কথা জানতে চাইল, 'আপনি ঘুমোন কেন?'

'এমনি বসেছিলাম।'

'কেন?'

'বসে বসে কত কি ভাবছিলাম।'

'কি ভাবছিলেন?'

'অনেক কথা...'

'অনেক কথা মানে?'

'আপনার কথা, আমার কথা আরো কত কি।'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ। আপনার কথাও ভাবছিলাম।'

'আমার কথা কি ভাবছিলেন?'

'বলেছি তো যা ভাবা যায় তা বলা যায় না।'

'তবুও...'

'ভাবছিলাম আপনার ওখানে গিয়ে কফি খেতে পারলে বেশ হতো।'

বুঝতে পারলাম বুলা হাসছে। বললো, 'তার জন্যে এত চিন্তা করার কি আছে চলে আসুন।'

'সত্যি আসব?'

'আপনি যদি আসতে পারেন, তাহলে আমিও কফি খাওয়াতে পারব।'

'যদি শুধু গল্প করতে আসি?'

'আসুন। গল্প করব।' একটু থামল। 'আপনি কি লবিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেলিফোন করছেন?'

'না। আমার ঘরে নিয়ে এসেছি।'

'এখন কি ঘুমুবেন?'

'সারাদিন আপনার সঙ্গে কাটিয়ে এখন আর একলা মন বসছে না...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাইতো ভাবছিলাম কফি খেয়ে আসি।'

একটু অন্যান্য কথার পর বললাম, 'কাল সকালে আসছেন তো।'

'কাল সকালে আপনি এদিকে চলে আসুন।'

'আপনি এসে নিয়ে যাবেন।'

'রোজ সকালে আপনাকে বিরক্ত করা কি ঠিক? আপনিই চলে আসবেন? তাছাড়া আপনি তো শহরের দিকে নিশ্চয়ই যাবেন।'

'হ্যাঁ। তা তো যেতেই হবে।'

'কখন আসবেন?'

'ঘুম ভাঙার ঘন্টা দুয়েক পরে।'

'ঠিক আছে আমি টেলিফোন করে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দেব।'

'গুড নাইট।'

দুই

আজকাল সাগর আটটা বাজতে বাজতেই বেরিয়ে পড়ে। তা আমি জানি, তবু চারদিন পরপরই সকালের দিকে গেস্ট হাউসে চলে আসি।

'চৌকিদার, চ্যাটার্জী সাব হ্যায়।'

'নেই মেমসাব।'

আমি ফিরে আসি না। ওর ঘরে গিয়ে বসি। একটু এদিক-ওদিক খুঁজে ডায়েরীটা হাতে তুলে নিই। গেস্ট হাউসের চৌকিদার বা বাবুর্চি কিছু মনে করে না। আমি কথায়-বার্তায় ওদের বুঝিয়েছি ও আমাদের আত্মীয়। রিস্তেদার। অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। আমরা সাগরের মতই বাঙালী। সরকার চ্যাটার্জীর পার্থক্য বোঝা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া রিস্তেদার না হলে আমি বা বাবা গাড়ি করে ওকে খাওয়াতে নিয়ে যাই?

চৌকিদার-বাবুর্চিরা বরং আমাকে একটু খাতির করে। তার কারণ পিসিদের

সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা। আমি সাগরের ঘরে বসতে না বসতেই ওরা চা দে
জিজ্ঞাসা করে আর কিছু খাব কিনা।

আমি বেশিক্ষণ থাকি না। ডায়েরীর শেষ কয়েকটা পাতা পড়েই চলে যা
ওর ডায়েরী না পড়ে আমি থাকতে পারি না। ও আমাকে নিয়ে এত ভাবে অ
জানায় না, তা কি হয়?

অসম্ভব।

প্রথম কি আশ্চর্যভাবে ওর ডায়েরীটা আমার চোখে পড়েছিল। সেই যে একদি
সকালে পিসির টিফিন-কেরিয়ার ফিরত দিয়ে আমি সাগরের ওখানে গিয়েছিলা
সেই দিন। প্রায় দুর্ঘটনাক্রমেই ওর ডায়েরীটা চোখে পড়েছিল। তাও হয়ত পং
না যদি টেবিলের উপর অতগুলো সাদা কাগজে...

মনে পড়লেও হাসি পায়।

সাগর বাথরুমে যাবার পর ঘরের চারপাশে চোখ ঘুরাতেই টেবিলে চোখ পড়
অনেকগুলো ফুলস্কেপ কাগজে কতকগুলো মেয়ের স্কেচ দেখে হাতে তুলে নিলা
হাতে নিতেই অবাক। আমার স্কেচ। প্রত্যেকটায় আমার নাম লেখা।

ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপার চেষ্টা করলাম।

স্কেচগুলো দেখেই বুঝলাম সাগর আর্টিস্ট নয় কিন্তু তবু আমার ফিগারটা কে
তা দেখাতে কার্পণ্য করেনি। বরং একটু বেশি উদারতাই দেখিয়েছে। স্কেচগু
দেখতে দেখতে একবার নিজের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। নিজের বুে
দিকে, চেহারার দিকে।

বন্ধ বাথরুমের দরজাটা একবার দেখে ছবিটা ঘোরাতেই টেবিলের উপর এব
খোলা ডায়েরী নজরে পড়ল। হাতে তুলে নিয়ে পড়তে গিয়ে চমকে গেলাম। এ
আমাকে নিয়ে এত কথা লিখেছে? ভারি মজা লাগল।

দু তিন প্যারা পড়ার পরই তাড়াতাড়ি ডায়েরীটা রেখে দিলাম। যদি হ
সাগর বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়ে। যদি ও আমাকে ডায়েরী পড়তে দেখে। তাহ
সর্বনাশ! লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

ভালই করেছিলাম! একটু দেরি হলেই ধরা পড়তাম।

ধরা পড়িনি। আজ পর্যন্ত ধরা পড়িনি। এখনও মাঝে মাঝে ওর ঘরে যা
ডায়েরী পড়ি। লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে পড়ি। না পড়ে থাকতে পারি না। এ
বেশ বুঝেছি ওর মনের মধ্যে অনেক কথা লুকোনো থাকে, চাপা থাকে। আমা
বলতে পারে না। কোন দিনই হয়ত বলবে না। তবে প্রায় সব কথাই ডায়েরী
লিখে রাখে আর আমি চুরি করে ওর ডায়েরী পড়ে সব কিছু জানতে পারি। জান
ভাল লাগে।

আমার বয়সটাই এমন যে সাগরের মত ছেলে আমাকে নিয়ে ভাবলে ভ
লাগে। আমি চাই ওরা আমাকে নিয়ে অল্পবিস্তর চিন্তা করুক। ভাবুক। কলে

পড়ার সময় থেকেই এইরকম মনে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় খুব বেশী মনে হতো।

দাদা অফিস যাবার পথে আমাকে কলেজে নামিয়ে দিতে চাইত, কিন্তু আমি যেতাম না। দাদা বলত, গাড়ি থাকতে ট্রামে-বাসে যাবার কি দরকার?

'আমি এত সকাল সকাল গিয়ে কি করব?'

অনেক মেয়েকেই তাদের বাবা-দাদা অফিসে যাবার পথে কলেজে নামিয়ে দিতেন। দাদার গাড়িতে আমি সাড়ে নটায় কলেজে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না কিন্তু তবুও যেতাম না। ভাল লাগত না। দাদার গাড়িতে গেলে বাড়ির দরজা থেকে উঠে সোজা কলেজের গেটে গিয়ে নামতে একটুকুও ইচ্ছা করত না।

বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হলে দাদার সঙ্গে যেতেই হতো। পারলে তাও যেতাম না। মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভিজতে ভাল লাগতো।

তখন সবকিছুই ভাল লাগতো। বাস স্টপে দাঁড়াতে ভাল লাগত। ভীড়ের বাসে বসতে না পেলেও খারাপ লাগত না। কলেজ থেকে ফেরার পথে কতদিন আমি আর অসীমা পুরোটা রাস্তা হেঁটে এসেছি। এই আসা-যাওয়ার পথে কত ছেলে আমার দিকে চাইত। কেউ সামনাসামনি, কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে পাশ থেকে। আমি বেশ বুঝতে পারতাম। আশ্চর্য। আমি বিরক্ত হতাম না বরং কলেজে পড়ার সময় এই নতুন মর্যাদায় খুশি হতাম।

মাঝে মাঝে অবশ্য বিরক্ত বোধ করতাম। অফ্ পিরিয়ডে মাঠে বসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে রেখাকে সেই কথাই বলছিলাম, 'জানিস রেখা, আজ বাসে একটা কি দারুণ অসভ্য লোককে দেখলাম।'

রেখা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কি করল?'

'বুড়ো লোক বলে আমার পাশের খালি জায়গাটায় বসতে বললাম। আর বসার পরেই এমন অসভ্যতা শুরু করল যে কি বলব!'

ও ঝালনুন মুখে দিয়ে একটা আওয়াজ করে বললো, 'অসভ্যতা কি করলো?'

'একে তো পাশে বসে হ্যাংলার মত ঘাড় ঘুরিয়ে সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল আর দুহাত দিয়ে এমনভাবে ছাতিটা ধরে বসল যে কনুইটা মাঝে মাঝেই...'

'তোর বুকে লাগছিল, এইত?'

'হ্যাঁ। কি বিশ্রী লাগে বলত?'

ও নির্বিকার হয়ে বললো, 'এমন কিছু না।'

'তার মানে?'

'তার মানে এই সামান্য ব্যাপারে মন খারাপ করার কোন দরকার নেই।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'এটা সামান্য ব্যাপার হলো?'

'একশ বার।' ও একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কোন বুড়োর খপ্পরে পড়িস নি?'

আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুড়োর খপ্পরে মানে?'

রেখা হেসে উঠল, 'তুই খপ্পরের মানেও বুঝিস না?'

'না।'

সত্যি কলেজে ভর্তি হবার সময় অনেক কিছুই জানতাম না। জানার প্রয়োজন হয়নি, সুযোগ আসেনি। কলেজে পড়তে পড়তে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। রেখাই সেদিন আমাকে বলেছিল, 'কোনদিন শেফালিদের বাড়ি গিয়েছিস?'

'না।'

'যাবি?'

'কেন?'

'বুড়োর খপ্পরে পড়া কাকে বলে জানতে পারবি।'

সেদিন ওকে কিছু বলিনি কিন্তু একদিন ছুটির পর সত্যি শেফালীর সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। দোতলায় সিঁড়ির মুখে ওদের বাড়িওয়ালার পাল্লায় পড়েছিলাম। লোকটা সত্যি দারুণ অসভ্য। গায়ে হাত না দিয়ে কথা বলতে পারে না। বুঝেছিলাম বুড়োর খপ্পরে পড়া কাকে বলে।

অনেক দিন পরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর একজন বুড়ো লেকচারারের পাল্লায় পড়েছিলাম। কয়েকদিন মাত্র। ওঁর হালচাল দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু প্রথম কয়েকদিন একেবারে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে পারিনি।

আমাদের কলেজের মালাও আমার সঙ্গে মডার্ন হিস্ট্রিতে ভর্তি হয়েছিল। ওর দুই দিদিও হিস্ট্রির ছাত্রী ছিল। ও আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, 'ডি-বি-র সঙ্গে বেশি খাতির করবি না।'

'কেন?'

'বিশেষ সুবিধার লোক না।'

'তার মানে?'

'মেয়েদের গায় পড়ার বাতিক আছে।'

'তা ঠিক বুঝি না তবে কথাবার্তার ধরণ যেন কেমন কেমন মনে হয়।'

মালা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'শুধু কথাবার্তার ধরণ অমন হলে তো তেমন কিছু ভাবনা-চিন্তার ছিল না, কিন্তু উনি যে আরো এগিয়ে যান।'

'তুই জানলি কেমন করে?'

'ছোড়দির কাছে ওঁর অনেক কীর্তি শুনেছি।'

পরে শুনেছিলাম অনেক কথা। স্পেশ্যাল নোটস লেখবার লোভ দেখিয়ে ডি-বি কিছু কিছু মেয়েকে নিয়ে কি কাণ্ডই করতেন।

ডেরাডুনে আসার পর পুরনো দিনের সেসব কথা বিশেষ মনে পড়ত না। সাগরকে দেখে, ওর ডায়েরী পড়ে নতুন করে পুরনো কথা মনে পড়ছে।

আমাদের পাশের বাড়ীর প্রশান্ত? হালদার মাসীরা ঐ ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবার পরই

ওরা আসে। আমার পড়ার টেবিলে বসে ওর ঘর দেখা যেত না কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখা যেত যে ও পড়ছে। দু একদিন হঠাৎ চোখ পড়েছে ওর দিকে কিন্তু ও যে পড়তে বসেই আমার ঘরের দিকে চেয়ে থাকত, তা জানতাম না। জানার প্রয়োজনও অনুভব করতাম না।

কয়েক মাস পরে কলেজ থেকে ফিরে লেটার বক্স খুলতেই একটা লিটল ম্যাগাজিন পেলাম। উপরে উঠেই বইখাতা রাখতে গিয়ে নজর পড়ল ঠিকানাটার দিকে। আমার নামে পাঠিয়েছে? সূচীপত্রে কোন জানাশুনা মেয়ের নাম দেখলাম না। আর একবার ভাল করে দেখতে গিয়ে নজর পড়ল বুলবুল নামে একটা ছোট গল্প লিখেছেন প্রশান্ত পত্রনবীশ।

আমার নামে ছোট্ট গল্প। বেশ মজা লাগল। হাত মুখ ধুয়ে চা জল-খাবার খাওয়ার আগেই পড়ে ফেললাম। পড়েই বুঝলাম পাশের বাড়ীর ঐ ছেলেটির লেখা। গল্পটা আরো দুতিনবার পড়লাম। পড়বার পর ভারী মজা লাগল। আনন্দ লাগল। মনের মধ্যে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করলাম।

চা-জলখাবার খেতে খেতে মণিদাকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা মণিদা, হালদার মাসীদের ফ্ল্যাটে কারা এসেছে?

মণিদাকে ছাড়া কাকে জিজ্ঞাসা করব? মণিদা আমাদের বাড়ীতে রান্না করে ঠিকই কিন্তু দাদার জন্মের পরই ও আমাদের বাড়ীতে এসেছে। দাদাকে, ছোড়দাকে, আমাকে মানুষ করেছে। মণিদা সংসারী হবার চেষ্টা করেও হতে পারেনি। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই বৌ মারা যায়। যতদিন ওর মা ছিলেন, ততদিন বছরে একবার করে দেশে যেত, এখন তাও বন্ধ। দাদার প্রতি মণিদার একটু বেশী দুর্বলতা থাকলেও আমাকে কম ভালবাসত না।

মণিদা বললে, 'আলিপুর কোর্টের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।'

'কি নাম জান নাকি?'

'ভদ্রলোকের পুরো নাম জানি না তবে উপাধি হচ্ছে পত্রনবীশ।'

মণিদার কাছে এই খবরটুকু পেয়ে আমি চঞ্চল না হয়ে পারিনি। কয়েক দিন চেয়ার-টেবিলে বসে পড়া ছেড়ে বিছানায় উপুড় হয়ে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে পড়াশুনা করলাম। পড়তে পড়তে বার বার দৃষ্টি চলে যেত ঐ পাশের বাড়ির দিকে।

ঘটনাটা কিছুই নয় তবুও তখন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। প্রথম দিন সাগরের ডায়েরী পড়ার পরই ছোট গল্প লেখার কথা মনে হয়েছিল। ওর আগে আমাকে নিয়ে কেউ কিছু লেখেনি। ওর আগে হয়ত আমাকে নিয়ে কেউ অত ভাবেনি। এই পৃথিবীতে কিছু মানুষকে নিয়ে কত অসংখ্য মানুষ চিন্তা করে। আমাকে নিয়েও যে কেউ কেউ চিন্তা করে সে কথা জানতে পেরে নিজেরই ভাল লাগল। বুঝতে পারলাম কিশোরী আমি সত্যিই যুবতী হয়েছি।

বাবা তখন ডিগবয়তে। মা ওখানেই থাকতেন। কলকাতার বাসায় দাদা

ছোড়দা, আর আমি! মণিদা ছিল আমাদের কম্যান্ডার-ইন-চীফ। ছোড়দার মত দাদা কোন কালেই আড্ডাবাজ ছিল না। ছেলেবেলায় মা আর মণিদার আদর খেয়ে খেয়ে ও বরাবরই ঘরকুনো। তবে অফিস থেকে ফিরতেই ওর সাড়ে সাতটা বাজত। ছোড়দা ফিরত নটা-সাড়ে নটা। দাদা বাড়িতে ফিরেই জামা-কাপড় ছাড়ার আগেই মণিদার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত।

'মণিদা, তোমার সুরেশকাকার কথা মনে আছে?'

'কি যে বলিস বাবাজী? তোর মনে আছে আর আমার মনে নেই!'

'আজ সুরেশকাকা অফিসে এসেছিলেন?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সুরেশকাকাকে দেখলে চেনা যায় না।'

'কেন?' মণিদা উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানতে চাইল।'

'ওঁর বড় ছেলে বলাইদার কথা মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ খুব মনে আছে।'

'বলাইদা মারা গিয়েছেন।'

'কবে?'

'বছর দুয়েক।'

মণিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল 'তা উনি তোমার অফিসে এসেছিলেন কেন?'

ওঁর ছোট মেয়ের বিয়ে। তাই...'

দাদা কথা শেষ করার আগেই মণিদা জিজ্ঞাসা করল, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর শুরু করল অতীত দিনের কথা বলতে। 'তুই জানিস তোর বাবার বিয়ের সম্বন্ধ সুরেশকাকাই করেছিলেন?'

দাদা হাসল। বললো, 'হ্যাঁ।'

'ওঁর মত তোর বাবাকে আর কোন বন্ধু ভালবাসে না।'

'তাতো বটেই।'

'তুই ডিগবয়তে একটা চিঠি দে। দ্যাখ ওঁরা কি বলেন।'

হ্যাঁ। কালই চিঠি দেব।'

'দেখবি হয়ত ঐ বিয়ের জন্য তোর বাবা-মা এখানে এসে যাবেন।'

'সম্ভব হলে আসতে পারেন।'

দাদার আর মণিদার কথার শেষ ছিল না। ছোড়দার সঙ্গে সংসারের কোন সম্পর্ক ছিল না। ও মণিদাকে ঠাট্টা করে সুপারিনটেনডেন্ট বলে ডাকত।

'হ্যাঁরে বুলা আমাদের হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টবাবু কোথায় গেল রে?'

'বোধহয় দই আনতে গেছে।'

'তাহলে তো ও ঘণ্টা খানেকের আগে আসছে না।'

'ঘণ্টা খানেক লাগবে কেন?'

ওর তো সবকিছুই স্পেশ্যাল। হয়ত মোল্লারচকেই দই আনতে গেছে।'

মণিদাকে নিয়ে ওর অমন করে কথাবার্তা বলা আমার বা দাদার খুব খারাপ লাগত। কিন্তু দাদা কিছু বললেই মণিদা নিজে আপত্তি করত, 'তোমরা ওর কথায় মাথা ঘামাও কেন?'

দাদা বলত, 'অমন করে কথা বললে তুমি ওর কথার জবাব দিও না।'

মণিদা হাসত।

'তুমি হাসছ কেন?'

মণিদা হাসতে হাসতেই বলত, 'যে গরু দুধ দেয় তার চাটিও ভাল লাগে।'

ছোড়দা পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল বলে মণিদা সব সময় ঐ এক কথা বলত।

কলেজ থেকে ফিরে আমি বিশেষ কোথাও যেতাম না। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর একটা কোন গল্পর বই সিনেমা ম্যাগাজিন নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তাম। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে দেখতাম ওপাশের বাড়ির জানলা দিয়ে কেউ উদগ্রীব হয়ে আমাকে দেখছে কিনা।

দেখত। প্রশান্ত দেখত। শুধু বিকেলে নয়, সকালে সন্ধ্যায় দেখত। বাস-স্টপে দেখত, বাসে দেখত। কলেজ থেকে অসীমার সঙ্গে গল্প করতে করতে ফেরার সময় আরো কত প্রশান্ত অশান্ত দৃষ্টিতে দেখত।

আজ দুপুরের ডাকে রেখার একটা চিঠি এলো। অনেকদিন পর ওর চিঠি পেলাম। চিঠিটা পাবার পর কলেজের দিনগুলোর কথা বড় বেশি মনে পড়ছে! রেখার মত বন্ধু আমার খুব কমই আছে। আমি ওকে সব কথা না বলে পারতাম না। সব কথা, একেবারে সবকিছু খোলাখুলি, নিজেও কিছু লুকিয়ে রাখত না।

'ডলিদির কথা মনে আছে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'হ্যাঁ। তোর মাসতুতো বোন তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ ডলিদির বিয়েতেই গিয়েছিলাম।'

বাবা-মা কয়েকদিনের জন্য ডিগবয় থেকে কলকাতা এসেছিলেন। দিদিমার শরীর অনেকদিন ধরেই ভাল ছিল না বলে মা আমাকে নিয়ে দুদিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। দিদিমার ওখান থেকে ফিরে এসে কলেজে গিয়ে দেখি রেখা নেই। শুনলাম এক আত্মীয়ার বিয়েতে গিয়েছে, কিন্তু কার বিয়েতে গিয়েছে তা জানতে পারলাম না।

রেখা ফিরে এলে তাই ঐ বিয়ের গল্প শুনছিলাম।

'ডলিদির বর কেমন হলো?'

'পাশ বালিশের মত একটু নাদুস নুদুস হলেও দেখতে ভাল।'

'ভদ্রলোক কি করেন?'

'বাটা কোম্পানীর অফিসার।'

'তাহলে তো ভদ্রলোক ভালই মাইনে-টাইনে পান। ডলিদি ভালই থাকবে।'

'কথাবার্তাও ভারি সুন্দর কিন্তু কয়েকজন যা পাজি বরযাত্রী এসেছিল না।!'

'কেন কি করেছিল?'

'বাসরে কি অসভ্যতা আর ফাজলামি করছিল, তা কি বলব!'

'তোর সঙ্গেও বুঝি?'

'তবে কি?' রেখা একবার গর্বের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বললো. 'আমিও ভদ্রলোককে আচ্ছাসে টাইট করে দিয়েছি।'

আমি ওকে খুব ভালভাবে জানি। ও ক্ষেপে গেলে সব কিছু করতে পারে, তা আমি ভালভাবেই জানতাম। 'কি হয়েছিল কি?'

রেখা এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনাটা বলে গেল।

বাসরঘরটা খুব বড় ছিল না, তাছাড়া বেশ ভীড় হয়েছিল। প্রায় গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। রেখার পাশেই ডলিদির বরের এক বন্ধু এসে হাত নেড়ে নেড়ে খুব বক-বক করছিল। ভদ্রলোক এমন কায়দা করে বারবার হাত নাড়ছিল যে প্রত্যেকবারই রেখার গায়ে হাত লাগছিল।

প্রথম দিকে রেখা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। ভাবল আনন্দে উত্তেজনায় এমন হতে পারে কিন্তু একটু পরেই বুঝল তা নয়।

'একবার ভাবলাম ঘরভর্তি লোকের সামনেই ভদ্রলোককে অপমান করি। তারপর ভাবলাম না তাহলে হয়ত ডলিদি বা ডলিদির বরের খারাপ লাগতে পারে...'

আমি আমার আগ্রহ আর চেপে রাখতে না পেরে বললাম, 'তারপর?'

বেশ চীৎকার করেই আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'একটু বাইরে আসবেন!'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জানতে চাইলেন 'কেন?'

'আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।'

সারা ঘরভর্তি লোক দেখল ওরা দুজনে বাইরে গেল।

রেখা হাসতে হাসতে বললো, 'জানিস বারান্দায় গিয়ে ভদ্রলোককে কি বললাম?'

'কি.?'

বললাম—'চুরি করে এক চামচ মধু খেলে আপনার মুখ মিষ্টি হলেও আমার হয় না।'

সত্যিই তাই। ও তো সবার সামনেই বলত, 'দেখিস যখন চাকরি করব তখন কিভাবে পুরুষগুলোকে ঘোল খাওয়াই।'

রেখার চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম সেইসব দিনের কথা। কত কথা!

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিলাম, 'হ্যালো।'
ও-পাশ থেকে শুনতে পেলাম, 'আমি সাগর।'
'খেতে আসবেন না?'
'বেলা বেশী হলে কি খেতে নেই?'
সাগর হাসল, 'আচ্ছা আসছি।'

সাগরকে খাওয়াতে আমার খুব ভালো লাগে। মনে শান্তি পাই। ও যেদিন আমাদের এখানে বা পিসির কাছে খায় না, বাইরের হোটেল রেস্তোরাঁয় কিংবা গেস্ট-হাউসে খায়, সেদিন মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি। সেদিন আমি নিজেও ভাল করে খেতে পারি না। খাই না। আমি জানি, আমি বেশ বুঝতে পারি বাইরের হোটেল-রেস্তোরাঁয় খেতে ওর ভাল লাগে না। পছন্দ করে না। বিরক্ত হয়, ঘেন্না করে। তবু খায়। জোর করে খায়। না খেয়ে উপায় নেই বলে খায়। পেটে ক্ষিদে লাগলে খেতেই হয়।

মানসীর কথা ও আমাকে বলে না। বলতে পারে না আমিও জানতে চাই না, কিন্তু মাঝে মাঝেই মাগোর কথা বলে। মাগো কিভাবে আদর যত্ন করে খাওয়াতেন, সে-কথাও বলে। বলেছে, বহুদিন। আমিও জিজ্ঞাসা করি, জানতে চাই।

'কোন রান্না করে মাগোর মনে একটু সন্দেহ হলেই আর আমাকে খেতে দিত না।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কেন?'

'মাগো হয়ত ভেবেছে ঝাল বেশি হয়েছে অথবা মাছটা ঠিক তত টাটকা নয়...'

সাগরও চুপ করে থাকার ছেলে ছিল না, 'মাগো আমাকে মাছ দেবে না?'

একটু কাতর মুখে মাগো বলতেন, 'না, তুই আজকে মাছ খাস না।'

'কেন?'

'মাছটা বোধ হয় ভাল না। তাছাড়া...'

'তাছাড়া আবার কি?'

'ভুল করে বেশি লঙ্কা দিয়ে ফেলেছি।'

সাগর হাসতে হাসতে বলত, 'মামার পাতের ধারে তো কাঁটা পড়ে আছে। মামা খেতে পারল আর আমি পারব না?'

'না।'

সাগর তর্ক করলেও মাগো দিতেন না।

সাগরের মুখেই এইরকম ঘটনা আরো কত শুনেছি। তাছাড়া ওর ডায়েরীতে আরো কত পড়েছি। মাগোর সেই মানিক কি হোটেল-রেস্তোরাঁয় খেতে পারে? খেয়ে পেট ভরে? নাকি তৃপ্তি পায়?

মাগো মারা যাবার পর ওকে নিশ্চয়ই আর কেউ তেমন আদর-যত্ন করে খাওয়ায়নি। মাগোর মত যদি আর কেউ ওকে ভালবাসত তাহলে জানতে পারতাম। ওর কাছেই শুনতে পেতাম অথবা ডায়েরীতে পড়তাম।

মাগোর মত আদর-যত্ন করে খাওয়াতে আমি পারি না। পারব না। পারা সম্ভব নয়। আমি চেষ্টাও করি না। আমি আমার মতই চেষ্টা করি। আমি জানি প্রতাপ সিংকে বলে দিলেই ও ঝাল কম দিয়ে রান্না করবে কিন্তু তবুও ঠিক স্বস্তি পাই না। নিশ্চিন্ত হতে পারি না। রান্নার ব্যাপারে আমাকে এত মাথা ঘামাতে দেখে বলে, 'দিদি, আপ কিঁউ ইতনা তকলিব উঠাতা হ্যায়? বাঙালীর বাড়িতে কাজ করে আমি তো অন্য রকম রান্না প্রায় ভুলেই গেছি।'

ও ঠিকই বলে। তবু আমি বলি, 'এমনি তো কোন কাজ নেই, তাই রান্না করতে ভালই লাগে।'

সাগরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কদিন আগে পিসির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পিসি বলল, 'সাগর আজকাল বড় বেশী পরিশ্রম করছে।'

আমি খুব বেশী সমবেদনা না দেখিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। তাই মনে হলো।'

'এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে যে, ব্রেকফাস্ট খাওয়াও হয় না।'

'কিছুই খান না?'

'অত সকালে ওকে কে ব্রেকফাস্ট দেবে?'

আমি চুপ করে কফি খেতে খেতে পিসির কথা ভাবছিলাম। আমি চুপ করে আছি দেখে পিসিই আবার প্রশ্ন করল, 'তুই কি ওকে দুপুরে খেতে বলিস?'

'বলেছি তো কিন্তু সপ্তাহে দু-একদিনের বেশি তো আসে না।'

কফির কাপ মুখে তুলতে গিয়ে পিসি বলল, 'কেন? শহর থেকে তোদের বাড়ি আসতে আর ক-মিনিট লাগে?'

'রোজ তো শহরের দিকে যান না।'

কফি খেয়ে অন্যান্য কথাবার্তার পর পিসি বলল, 'সাগরকে দেখলে মনটা বড় খারাপ লাগে।'

আমি কিছু না বলে শুধু পিসির দিকে তাকালাম।

'ছেলেটা সত্যি বড় লোন্‌লি।'

'হ্যাঁ।'

'একলা থাকতে থাকতে ছেলেটা কেমন হয়ে গেছে, তাই নারে?'

'ঠিক বলেছ।'

'একটু আদর-যত্ন করলে ভীষণ খুশি হয়...,'

আমি মাঝপথে বললাম, 'তোমার আদর-যত্নে খুশি হবে না?'

'তা নয়। তবে ওকে আদর-যত্ন করতে ইচ্ছা করে।'

পিসির মত আমারও ইচ্ছা করে। ভাল লাগে। প্রতাপ সিং আমাদের দুজনের

খাবার-দাবার দিয়ে চলে গেল। আমি ওর কোয়ার্টার প্লেটে আরেকটা মাছ ভাজা তুলে দিতেই ও বললো, 'কি ভেবেছেন বলুন তো?'

'কেন? কি হলো?'

'এত মাছ খাওয়া যায়?'

'এত কোথায়?'

ও মাছের ঝোল আর মাছভাজা দেখিয়ে বলল, 'দুটো ভাজা মাছ খাওয়া যায়?'

আমি কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, 'কেন আমার হাতের রান্না কি আপনার ভাল লাগে না?'

'না, না, তা বলছি কোথায়?'

'সোজাসুজি বলতে পারছেন না বলেই তো।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই সাগর বলল, 'আপনি কটা মাছ নিয়েছেন?'

শুধু আজ নয়, খেতে বসে সব সময় ও এইরকম তর্ক করে। প্রথম কয়েকদিন তর্ক করেনি। নিশ্চয়ই লজ্জা করত কিন্তু ইদানিং বেশ তর্ক করে।

'আজকাল খেতে দিলেই আপনি এই রকম তর্ক করেন কেন বলুন তো? আমাকে দেখলেই কি আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়?'

কথাগুলো আমি ঠাট্টা করে বললেও ও চিন্তিত না হয়ে পারল না।

'ছি ছি। ওকথা বলবেন না।'

'তাহলে চুপটি করে খেয়ে নিন।'

'এত খেলে কাজ করা যায়?'

'এখন আবার কি কাজ?'

সাগর একটু হাসল, 'একটা কাজ আছে।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে দুজনেই খেয়ে নিলাম। খেয়ে উঠে সাগর সিগারেট ধরাল। একটা টান দিতে না দিতে বলল, 'মাই গড। একেবারে ভুলে গেছি।'

'কি হল?'

'রেভিনিউ অফিসারের সঙ্গে তিনটের সময় দেখা করার কথা কিন্তু একেবারেই মনে ছিল না।'

'টেলিফোন করে দিন না!'

সিগারেটে একটা টান দিয়েই ও বলল 'ঠিক বলেছেন।'

সাগরকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। ও রিসিভার তুলে নম্বর চাইতেই আমি একটু কাজ সারতে ভিতরে গেলাম। ফিরে আসতেই দেখলাম ও রিসিভার নামিয়ে রাখছে।

'কি টেলিফোন করা হলো?'

'হ্যাঁ।'

'তবে এত চিন্তা করছিলেন কেন?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে না যাওয়াটা খুব খারাপ।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ও আমার দিক থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে একবার ঘরের চারপাশে ঘুরিয়ে নিল।

'কি দেখছেন?'

'আপনার ঘর।'

'তা দেখবার কি আছে?'

সাগর একটু মুচকি হাসি হাসল, 'না, না, দেখবার কিছু নেই তবে...'

'তবে কি?'

'এত সুন্দর ঘরে এলে আর যেতে ইচ্ছে করে না।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'বেশ তো। আপনি এখানেই একটু বিশ্রাম করুন।'

'এই ঘরে কি একটু বিশ্রাম করা যায়?' কথাটা বলেই সাগর কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'একটু কেন? একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকুন।'

'সন্ধ্যের পরেও যদি যেতে ইচ্ছা না করে?'

কথাটা শুনে মজা লাগল। আমিও বললাম, 'যাবেন না।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি?'

'তারপরেও যদি না যাই?'

আমি নির্বিকার হয়ে বললাম, 'থাকবেন।'

সাগর একটু ভাবল। মাথা নীচু করেই বলল, 'ধন্যবাদ।'

সাগর সত্যি একটা বিচিত্র ছেলে। আমি এখন এই বাড়িতে একলা। বাবা অফিসে, প্রতাপ সিং গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। ও যদি আমাকে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরত, আদর করত, তা হলে কেউ জানতে পারত না। আমি সম্মতি না দিলেও আপত্তি করতাম কিনা জানি না। তবে একথা ঠিক সেকথা কাউকে বলতে পারতাম না। বলতাম না। এমন পরিস্থিতিতে অন্য কেউ হলে কি করত কে জানে? কেন, ছোড়দার বন্ধু বিমল দা?

আমি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে আছি। পরীক্ষার সময় মা কলকাতায় ছিলেন কিন্তু হঠাৎ বাবার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাওয়ায় ডিগবয় চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে আমিও দাদু-দিদিমার কাছে যাব। এমন সময় বিমলদা কলকাতায় এলেন। মণিদা ওর মালপত্র তুলে বাইরের ঘরে বসতে দেবার পর আমি গেলাম।

'কি বিমলদা কেমন আছেন?'

বিমলদা আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছো?'

'ভাল।'

'তুমি তো বেশ বড় হয়েছ?'

'বড় হব না? আমার বয়স কি কম হলো?'

উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি তো এখন একটা চার্মিং ইয়ং লেডী।'

আমিও হাসতে হাসতে জবাব দিলাম, 'ইউ থিংক সো?'

উনি ডান হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত মুঠোর মধ্যে ধরে বললেন, 'অফ কোর্স!'

ব্যস্! ঐ পর্যন্ত।

পরের দিন আমি, ছোড়দা আর বিমলদা বসুশ্রীতে সিনেমা দেখতে গেলাম। একধারের পরপর তিনটে সীট। আমি প্যাসেজের ধারে বসলাম। বিমলদা মাঝখানে ছোড়দা ওধারে। সিনেমা শুরু হবার পর বিমলদার হাতটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। কিছু মনে করলাম না কিন্তু ইন্টারভ্যালের পর পপকর্নের প্যাকেট এগিয়ে ধরার কায়দা দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। ভাবলাম, পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখতে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে এমন হতেই পারে।

পরের দিন বিমলদা খুব সকালে বেরিয়ে গেলেন। দুপুরবেলা যখন খেতে এলেন, তখন প্রায় আড়াইটা বাজে। একই সঙ্গে খেতে বসলাম। আমাদের খাবার পর মণিদা খেতে গেল। বিমলদা আর আমি বাইরের ঘরে বসে গল্প করছিলাম। মণিদা খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরের ঘরে আসতেই উনি বললেন, 'মণিদা আমার একটা কাজ করে দেবে?'

মণিদা জানতে চাইল, 'আমার দ্বারা হবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা টেলিগ্রাম করতে হবে।'

'তা পারব না কেন?'

বিমলদা একটা সাদা কাগজে টেলিগ্রামটা লিখে ওকে বুঝিয়ে দিলেন, 'এই কাগজটা আঠা দিয়ে টেলিগ্রামের ফর্মে লাগিয়ে দিও।'

'আচ্ছা।'

মণিদার হাতে ঐ কাগজ আর টাকাটা দিতেই চলে গেল।

মণিদা বেরিয়ে যাবার পর পরই বিমলদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। বেশিক্ষণ না, কয়েক মিনিট। তারপর আমার পাশে বসে একটু খোস-গল্প করলেন। তারপর হঠাৎ আমার হাতটা ধরে টান দিয়ে বললেন, 'অতদূরে বসেছ কেন? ভাল হয়ে বসো।'

আমার একটু খটকা লাগল, 'ঠিক হয়েই তো বসেছি।'

বিমলদা নিজেই এগিয়ে এলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে দুহাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে আমাকে টেনে নিলেন।

আমি ওর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'আঃ কি করছেন?'

আর কি করছেন? বিমলদা জোর করে টেনে নিয়ে আমাকে একবার 'কিস'

করলেন।

আমি একথা কাউকে বলিনি। বলতে পারি না। কিন্তু কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এমন ঘটনা অনেক শুনেছি। মনে হয় মেয়েদের চাইতে পুরুষদের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি অনেক বেশি প্রবল।

সাগরকে যত দেখছি, আমি তত বেশি আশ্চর্য হচ্ছি। আমি গেস্ট হাউসে ওর সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেছি। করি। আমাদের বাড়িতেও শুধু দুজনে বসে বসে কথা, কত গল্প হয় কিন্তু একটি দিনের জন্যেও ও আমার হাতটা চেপে ধরেনি। বলতে গেলে আমাকে স্পর্শই করেনি। গাড়িতে দু-একবার হঠাৎ হাতে হাত লেগে গেছে। ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। বলেছে, সরি!

আমি ওকে যত অনুরোধ করি না কেন ও কিছুতেই আমার ঘরে বিশ্রাম করে না, করবে না। তাই তো ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন বাইরে যাওয়া যাক।'

অনুরোধ করেও কোন লাভ নেই জেনেও হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটু বিশ্রাম করুন না।'

সাগর হাসল। 'আর লোভ বাড়িয়ে দেবেন না।'

ড্রইংরুমেই গেলাম। ও যথারীতি আমার সামনের সিঙ্গল সোফায় বসল।

ও সিগারেট ধরাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'পিসিদের ওখানে যান না কেন?'

'কে বলল যাই না?'

'পিসিই বলছিল।'

'যাই না বলতে পারেন না। বলেছেন কম যাই।'

'চার-পাঁচদিন পরে এক আধ বার যান।'

সিগারেটে বেশ জোর টান দিয়ে বলল, 'তাতে আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না!'

'তার মানে?'

'রোজই টিফিন কেরিয়ারে করে কিছু না কিছু এসে যায়।'

আমি এ-খবর জানতাম না। হাসলাম। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

আমি এবার ওর কাজ-কর্মের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কি শুধু ইন্টারভিউ নিচ্ছেন?

'না। নানা জায়গা থেকে নানারকম খবরও জোগাড় করছি।'

'এইরকম ব্যস্ত কতদিন থাকবেন?'

'আরো সপ্তাহ দুয়েক।'

'তারপর?'

'তারপর ঐ সব অ্যানালিসিস করতে হবে রিপোর্ট তৈরী করতে হবে।'

'তার মানে কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন?'

'না, না, এখনও অনেক বাকি।'

এবার জানতে চাইলাম, 'আমার ইন্টারভিউ কবে নিচ্ছেন?'

'যেদিন দুজনেই ফ্রি থাকব।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনি কোনদিন ফ্রি হবেন।'

সাগর হাসিমুখে জানতে চাইল, 'খুব তাড়াতাড়ি ইন্টারভিউ দিতে ইচ্ছে করছে?'

'শুধু আমার ইচ্ছা নয়, আপনারও কর্তব্য আমার ইন্টারভিউ নেওয়া।'

দুজনেই হাসলাম।

সাগর বললো, 'ঠিক আছে। কালকের দিন বাদ দিন। পরশু দিনই ইন্টারভিউ হবে।'

'ঠিক আছে।' আমি খুশি হলাম। আপনি কখন আসবেন?'

'আপনিই বরং গেস্ট হাউসে চলে আসবেন।'

'এখানে এলেই তো ভাল।'

'গেস্ট হাউসে আসতে আপত্তি আছে?'

'না, না, আপত্তি কি থাকবে?'

সাগর খুশী হলো। 'সকাল সকাল আসবেন। আপনার হাতে যেন মর্নিং টি পাই।'

আমি হাসলাম : মাগো আর মান্সীর রাজত্বকালে ও অনেক বিলাসিতা করেছে। এখন সেসব কিছুই নেই সব ছেড়ে দিয়েছে। মেনে নিয়েছে কিন্তু ঘুম ভাঙার পরই নিজের হাতে চা তৈরী করে খেতে আজও ওর দ্বিধা। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়ত স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙার পরেও বোধহয় স্বপ্নের রেশ কাটে না, তাই তো নিজের হাতে চা তৈরী করে খেতে ওর এত কষ্ট।

'আচ্ছা।'

বাবা অফিস যাবার পথে আমাকে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিলেন। দুপুরে পিসির ওখানে লাঞ্চ খাবার কথা। গাড়ি থেকে নেমে আরেকবার বলে দিলাম, 'পিসির ওখানে আসতে ভুলে যাবে না কিন্তু।'

'না, না, ভুলে যাব না।'

বাবা চলে গেলেন। গেস্ট হাউসে ঢুকতে গিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখলাম পৌনে নটা বাজে। চৌকিদার আমাকে হাত তুলে একটা সেলাম করল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাব হ্যায়?'

'জি হ্যাঁ।'

আস্তে হাতল ঘুরিয়ে সাগরের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। ভিতরের দিকের

গেটের দরজায় পর্দা সরান কিন্তু যে দুটো জানালা দিয়ে রোদ্দুর আসে, তাদের পর্দা টেনে দেওয়া রয়েছে। বিছানার পাশে সাইড টেবিলের উপর টেবিল-লাইট জ্বলছে। দু এক পা এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটা মোটা বই মাটিতে পড়ে। তুলে দেখলাম ডেরাড়ুনের সেন্সাস রিপোর্ট। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার। বুঝলাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কখন যে বইটা পড়ে গেছে তা টের পায়নি তাছাড়া এত অঘোরে সারারাত ঘুমিয়েছে, এখনও এমন ঘুমুচ্ছে যে টেবিল-লাইটের আলোতে কিছু ব্যাঘাত করতে পারেনি, পারছে না।

সাগর ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বেশ বুঝলাম কাল বড় পরিশ্রম করেছে, বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। এখন না ডাকলে হয়তো আরো অনেকক্ষণ ঘুমুবে। কত রাত্রে ঘুমিয়েছে, তাই বা কে জানে?

টেবিল ল্যাম্পের আলোটা অফ করে দিলাম। সকালে বেয়ারাটাও নিশ্চয়ই আসেনি। ও এলে আলোটা অফ করে দিত। সাগর বোধহয় ডাকাডাকি করতে মানা করেছে। বোধহয় কেন? নিশ্চয়ই মানা করেছে। হঠাৎ মনে হলো আমি আসব বলে ওদের ডাকাডাকি করতে বারণ করেনি তো?

হয়ত।

কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। আরেকবার ওর দিকে ওর মুখের দিকে তাকালাম। কত অসহায়। এত নিঃসঙ্গতার জ্বালা বুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে তা অনুভব করার ক্ষমতাও আমার হবে না, হতে পারে না। আমি তো ওর মত নিঃসঙ্গতার জ্বালা কোনদিন সহ্য করিনি।

জানলার পর্দা সরাতে যাব বলেও দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো ও হয়ত ছোট্ট একটা স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে আমি আসব ওকে ডাকব, চায়ের কাপ এগিয়ে দেব! এই স্বপ্ন দেখবে বলেই কি বেয়ারাকে ডাকাডাকি করতে বারণ করেছে?

খুব সম্ভব তাই।

আমি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম না। জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলাম। সারা ঘরটা আলোয় ভরে গেল।

আমি ঘুরতেই দেখলাম ও খুব জোরে আলসেমি ভেঙে ওপাশ থেকে এপাশ ফিরে শুয়েছে। এবার আলোয় ওর মুখ দেখে বিশেষ ক্লান্তির চিহ্ন পেলাম না। ভাল লাগল। একবার ইচ্ছা করল ওর মুখে, কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকি। আবার ভাবলাম না, দরকার নেই। তার চাইতে আগে চায়ের ব্যবস্থা করি।

লবিতে গিয়ে চৌকিদারকে বললাম চা পাঠিয়ে দেবার কথা বলতে।

এবার সাগরের ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসলাম। একটু কায়দা করে ঘুরিয়ে বসলাম। সাগরের মুখ প্রায় সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছি। আবার দরজা খুলে বেয়ারা এলেও দেখতে পাব। ও কিছু বুঝতে পারবে না, কিছু মনে করার সুযোগ পাবে

না।

একটু পরেই বেয়ারা এসে চায়ের ট্রে রেখে গেল। যাবার সময় দরজা টেনে দিল। বড় বড় অফিসারদের সেবা-যত্ন করে বলে আদব-কায়দা জানা আছে।

আমি এবার চেয়ারটা ছেড়ে সাগরের কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'উঠবেন না?'

কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।

আবার ডাকলাম, 'চা এসে গেছে, উঠে পড়ুন।'

একটা জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। ঘুমটা পাতলা হয়ে এসেছে কিন্তু তবু চোখ মেলে তাকাল না।

'উঠুন। অনেক বেলা হয়ে গেল।' একটু জোরেই বললাম। না, তাতে কিছু হলো না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার একটু ভাবলাম। বেশী জোরে ডাকাডাকি করলে ঘরের বাইরে শুনতে পাবে। গেস্ট হাউসের অন্য গেস্টরা শুনতে পাবেন। হয়ত বেয়ারা বাবুর্চিও শুনতে পাবে।

'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

কি করব? ডান হাতটা ওর কপালে দিয়ে একটু নাড়া দিলাম, 'উঠুন। বেলা হয়ে গেছে।'

আমি হাতটা টেনে নেবার আগেই ও আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একবার এক মুহূর্তের জন্য চোখ মেলে তাকাল আবার চোখ বন্ধ করল। কপালে হাত দিয়ে একটু জোরে মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উঠবেন না?'

আমি ওর কপালে হাত দেবার জন্য ঝুঁকে পড়েছিলাম। ও চোখ মেলে তাকাতেই একটু লজ্জা পেলাম কিন্তু হাতটা সরিয়ে নিতে পারলাম না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলাম না।

ও ঘুমের ঘোরেই বললো, 'কে?'

'আমি। বুলা।'

ও এবার ভাল করে আমার দিকে তাকিয়েই হাসল, 'আপনি?'

'হ্যাঁ।'

হাতটা সরাতে গেলাম কিন্তু ও হাত দিয়ে চেপে ধরল।

কপালে আমার হাত আর আমার হাতের ওপরে ওর হাত। 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'অনেকক্ষণ।'

কয়েকটা মুহূর্ত দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে রইলাম বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। কারুর মুখ দিয়েই কোন কথা বেরুল না।

একটু পরে আমি বললাম, 'চা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

ও একটু মুচকি হাসল।

'হাসছেন কেন?'

'এর চাইতে চায়ের দাম বেশী?'

আমি আরো লজ্জা পেলাম। বাঁ-হাত দিয়ে শাড়ির আঁচলটা টেনে ব্লাউজের সামনের দিকটা ঢাকবার চেষ্টা করলাম। আর না সাগর হাতটা ছেড়ে দিল। আমি হাতটা উঠিয়ে একটু সরে দাঁড়ালাম।

'চা করব?'

ও মুখে কিছু বলল না। হাত নেড়ে চা করতে ইঙ্গিত করল।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাল বুঝি অনেক রাত্রে শুয়েছেন?'

সাগর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ বেশ রাত হয়েছিল।' একটু পরে আবার বলল, 'ভালই হয়েছিল।'

'কেন?'

রাত করে শুয়েছিলাম বলেই তো এমন সৌভাগ্য।'

মাথা নীচু করে একটু ভাবলাম। চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে বললাম, 'ঘুমিয়ে থাকলে ডাকব না?'

'নিশ্চয়ই ডাকবেন কিন্তু কেউ তো ডাকে না। যদি ঘুম একেবারেই না ভাঙে, তাহলেও কেউ আমাকে ডাকবে না।'

কথাটা সত্যি হলেও শুনতে খারাপ লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, 'এইসব আজেবাজে কথা বললে এক্ষুনি চলে যাব।'

আমি সাগরের প্রেমে পড়িনি। পড়ব না। পড়তে পারি না। নানা কারণে। দাদা শুধু নিজের পছন্দমত বিয়ে করেনি, বাবার অপছন্দ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই বিয়ে করেছে। কি করে যে কি হলো ভাবতে পারি না। দাদার মত গুড বয় যে কিভাবে এমন কাজ করতে পারল, তা ভাবতেও অবাক লাগে।

প্রেম করে বিয়ে করা অন্যায় নয়! দাদা প্রেম করছে বলে আমাদের দুঃখ নয়। দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে চিরকাল পিতৃমাতৃ ভক্ত থেকে ভাইবোনদের একান্ত অনুরক্ত থাকার পর, আমাদের পরিবারের সবকিছু জেনে শুনেও কিভাবে সবাইকে অগ্রাহ্য করতে পারল? আরো কত কি করল? এই বিয়ে হবার পর কেমন যেন সবকিছু পাল্টে গেল। আমাকে বা ছোড়দাকে বৌদির পছন্দ না হতে পারে কিন্তু মণিদা কি অপরাধ করেছিল?

দাদার বিয়ের মাস দুয়েকের মধ্যে আমি মণিদার সঙ্গে ডেরাডুন এলাম। না এসে কোন উপায় ছিল না। দাদার ওখানে অবস্থা খুব সুবিধাজনক ছিল না, সেকথা বাবা-মা জানতেন কিন্তু ভাবতে পারেননি, আমরা দুজন অমন করে চলে আসব। মণিদা শুধু আমাকে পৌঁছে দিতেই আসেনি; এসেছিল বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

ওর কথা শুনে বাবা চমকে উঠলেন, 'সেকি মণি? তুমি চলে যাবে, তাই

কি হয়?'

মণিদা বললো, 'না দাদাবাবু, এবার আমি দেশে ফিরে যাব।'

'দেশে ফিরে কি করবে? ওখানে তোমার কে আছে?'

মণিদা কি বলবে? একটু শুকনো হাসি হাসল। বলল, 'কোনদিন তো দেশে থাকা হলো না, শেষ বয়সটা ওখানেই কাটাই।'

মণিদা চলে গেল। তবে যাবার সময় বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে আমার বিয়েতে আসবে।

পরের মাসে বাবার মানি-অর্ডার ফেরত পাঠাল মণিদা। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে জানালেন, মণি তুমি তো জান এই সংসারের সবচাইতে আপনজনের কাছ থেকে সব চাইতে বড় আঘাত পেয়েছি। তুমি আমাকে দুঃখ দেবে, ভাবতে পারি না। টাকা আবার পাঠাচ্ছি। ফেরত দিও না। যতদিন আমি আছি, ততদিন ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার।

মণিদা সে চিঠির জবাব দেয়নি, তবে মানি-অর্ডার ফেরত আসেনি। এখনও পর্যন্ত আসেনি।

পাকা সোনা দিয়ে গহনা গড়া যায় না। একটু খাদ মেশাতে হয়। না মেশালে মজবুত হয় না। ব্যবহার করা যায় না। মানুষের মধ্যেও একটু খাদ থাকা দরকার। যে-সব ছেলেমেয়েরা কৈশোর-যৌবনে পাকা সোনার মত একেবারে নির্ভেজাল থাকে, যাদের গর্বে বাবা-মার বুক ফুলে ওঠে সাধারণত তারাই সংসার ভাঙে, অশান্তি সৃষ্টি করে।

হাজার হোক প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু পশুপ্রবৃত্তি থাকে। মাঝে মাঝে সে প্রবৃত্তির প্রকাশ হওয়া দরকার। যারা প্রথমের দিকে প্রকাশ করে না, চেপে রাখে, পরবর্তী জীবনে তারাই আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ে। আমি কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই মোরাভিয়ার বইগুলো শেষ করে ফেললাম, লেডি চ্যাটারলিজ লাভার, কার্পেট বাগার্সের কিছু কিছু লাইন লাল পেন্সিল দিয়ে আন্ডার লাইন করে বন্ধুদের পড়তে দিতাম, দাদা তখন বুদ্ধদেব বসু নিয়েই হিমসিম খেতো। আমি, রেখা, অসীমা ও আরো কয়েকজন মেয়ে যখন মাসে অন্তত একটা অশ্লীল ইংরেজি সিনেমা দেখছি, তখন মণিদাকে নিয়ে দাদা 'রানী রাসমণি' বা 'সাত পাকে বাঁধা' দেখত।

মনে হচ্ছে, ছোড়দাও লন্ডনে গিয়ে নিজের একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। পাকাপাকি খবর এখনও আসেনি হয়ত এখনও মার্বেল আর্চের ধারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ক্যামডেন টাউনের ফ্ল্যাটে যায়, তবে যতটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে ছোড়দাকে নিয়ে আর ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন নেই।

বাবা-মা এসব নিয়ে একেবারেই আলোচনা করেন না। কেউ এসব জানে না। পিসিও না। বৌদির বাচ্চা হবার পর বাবা-মা আর আমি গিয়েছিলাম। আমি আর বাবা দুদিন থেকেই চলে এলাম।

আমি প্রেম করে বিয়ে করব, তা হতেই পারে না। প্রেম তো দূরের কথা, কোন জানাশুনা ছেলেকেও আমি বিয়ে করব না। কিছুতেই না। দুএকজন জানাশুনা ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা উঠেছিল, আমি বাতিল করে দিয়েছি। জিওলজিক্যাল সার্ভের বিকাশদার সঙ্গে বিয়ে দিতে মা বেশ খানিকদূর এগিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে মাকে ফিরিয়েছিলাম।

তাইতো সাগরের প্রেমে পড়ে ওকে বিয়ে করব এ স্বপ্ন আমি দেখি না। তবুও ওকে আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে ওর ব্যবহার, ওর চেহারা। যে যাই বলুক না কেন, দেখতে-শুনতে একটু ভাল না হলে ভাব করতেও ইচ্ছা করে না। অন্তত আমার করে না। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে এই নিয়ে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কম তর্ক হতো?

একদিন হঠাৎ আমাদের আড্ডাখানায় এসে লিলি বলল, 'জয়া ফট।'

রেখা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কার সঙ্গে রে?'

আমরা উদগ্রীব হয়ে লিলির কাছে শুনলাম রোজ কলেজ ছুটির পর পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপোর পাশের পান-সিগারেটের দোকানে একজন কালো রঙের লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকেন। জয়াকে নিয়ে উনি প্রায়ই ট্যাকসি করে গড়িয়াহাটের দিকে যান।

সঙ্গে সঙ্গে রেখা আমাদের তিন-চার জনকে অর্ডার করল, 'ওয়াচ্ জয়া। তারপর ক্যাবিনেট রিপোর্ট। তারপর আলোচনা। সব শেষে সিদ্ধান্ত।'

কয়েকদিন নজর রাখতেই দেখা গেল লিলি ঠিকই বলেছে। ক্যাবিনেটে রিপোর্ট করার সময় সব পয়েন্ট মিলে গেল, অমিল হলো শুধু ভদ্রলোকের বয়স নিয়ে। আমি বললাম, সাতাশ-আঠাশ, কৃষ্ণা বলল, ত্রিশ-বত্রিশ হবে, এষা বলল, বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না, তবে স্বাস্থ্য বেশ ভাল।

বয়স আর চেহারা নিয়ে শুরু হলো তর্ক। বিতর্ক। এক একজনের এক একরকম ছেলে পছন্দ। চীফ জাস্টিসের মত রেখা বলল, 'অলওয়েজ একটু ম্যাচিওর্ড লোককে বিয়ে করাই ভাল।'

দুতিনজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'তার মানে?'

'একটু বেশী বয়েসের একটু অভিজ্ঞ লোককে বিয়ে করলেই বেশী সুখী হওয়া যায়।'

রেখার কথা শুনে আমরা তো অবাক, 'বলিস কিরে?'

'যা বলছি তাই শোন। ছোকরারা একটু নষ্টামি-ফস্টামি করতে পারে ঠিকই তবে মেয়েদের ঠিক হ্যান্ডেল করতে পারে না, কিন্তু ম্যাচিওর্ড লোকের ওপরে যেমন ডিপেন্ড করা যায় তেমন আদর-ভালবাসা পাওয়া যায়।'

ওর কথায় আমরা হেসে উঠলাম।

ইউনিভার্সিটিতে গিয়েও এইরকম যুক্তি শুনলে হেসেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রেখা,

চন্দনা বলত, মার্ক করে দেখবি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে মেয়েরা বেঁচে যায়, বেঁচে যেতে পারে, ভুলে যেতে পারে বাট প্রফেসারদের প্রেমে পড়লে উদ্ধার পায় না কেউ। উদ্ধার পেতে চায় না কেউ।

যে যাই বলুক আমি একটু স্মার্ট দেখতে-শুনতে ভাল ছেলেদেরই পছন্দ করি। ডিগবয়ে বহু ইয়ং ও ফার্স্ট ক্লাস ছেলে বাবার আন্ডারে চাকরি করত। ওদের অনেকেই আমাদের বাড়িতে আসত কিন্তু বিকাশদা ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা পর্যন্ত বলতাম না। জিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসার পরও উনি আমার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাইতো বোধহয় মা সন্দেহ করলেন আমি বিকাশদার প্রেমে পড়েছি।

সে যাই হোক সাগরকে আমার বেশ লাগে। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ওর উচ্ছ্বাস নেই কিন্তু হৃদয়-প্রাচুর্য আছে। জীবনে অনেক আঘাত পেয়েও মুখের হাসি, চোখের বিদ্যুৎ হারায়নি। এমন একটা সুন্দর জীবন নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে হাহাকার করছে, আমি ভাবতে পারি না। আমার দেবার ক্ষমতা সীমিত, কিন্তু তবুও যেটুকু চাইবে, দাবী করবে, তা আমি দেব। দিয়ে আনন্দ পাব! তৃপ্তি পাব। ওর শূন্যতা আংশিকভাবে ভরাট করতে পারলেও সার্থকতা আছে বৈকি।

সাগর কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'অনেক কথাই আপনাকে বলি না, বলতে পারি না! তবে আজ আর না বলে পারছি না যে বহুদিন পর আজ আপনার কল্যাণে মনটা খুশীতে ভরে গেছে।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

আবার একটু থামল।

'আপনাকে দেখলে অনেক পুরানো দিনের কথা মনে হয়। আপনার সঙ্গে কথা বলে পুরানো দিনের হারিয়ে-যাওয়া আনন্দ আবার যেন ফিরে পাই।'

আমি সেকথা জানি। জানি আমার মধ্যে ও মানসীকে দেখতে চায়, দেখতে পায়। ওর ডায়েরী পড়ে মানসীর কথা, মানসীর সঙ্গে আমার মিলের কথা ভেবে প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করতাম। ভাবতাম, সাগরের কাছে কি আমার কোন অস্তিত্ব নেই ? আমি কি মানসীর প্রতিবিম্ব মাত্র ? অনেকদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। ভেবেছি রাত জেগে জেগে। হাতে কাজকর্ম না থাকলে দিনের বেলায়ও ভেবেছি। বহুদিন, বহুক্ষণ, বহুবার। যে মানসী নেই, তার জন্য ঈর্ষা কেন ? হিংসা কেন ? আমাকে দেখে আমাকে কাছে পেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলে একটা আহত মন যদি শান্তি পায় তাতে আপত্তি কি ? অন্যায় কি ?

'আমার সঙ্গে কথা বলে আপনি যদি আনন্দ পান, তাতে আমার তো দুঃখ পাবার কোন কারণ নেই।'

সাগর এবার সিগারেট ধরাল। কিন্তু আপনাকে কত বিরক্ত করতে পারি ?'

'আমি বিরক্ত হবো, জানলেন কি করে?'

'বিরক্ত হবেন না?'

'মনে হয় না।'

'ভেরী গুড!' সাগর হেসে ফেলল, 'তাহলে আর এক কাপ চা খাওয়া যাক, কি বলুন?'

আমি হাসলাম। ওর তৃপ্তিমাখা হাসিভরা মুখখানা দেখে আমিও খুশী হলাম

আমি উঠে গিয়ে বেয়ারাকে চা দিতে বললাম। চা এলো। ওকে এক কাপ চা দিয়ে আমিও এক কাপ নিলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে সাগর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিভাবে এলেন?'

'বাবা নামিয়ে দিয়ে গেলেন!'

'ছি ছি। উনিও জেনে গেলেন, আমি ঘুমুচ্ছি?'

'না। বাবা আর ভিতরে আসেননি।'

'যাবেন কিভাবে?'

'আপনার এখান থেকে তো পিসির ওখানে যাব।'

'ও হ্যাঁ তাইতো! আজ দুপুরে তো ওখানেই খাওয়া।'

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম, 'আপনিই তো পিসিকে বলেছেন আমি এখানে ইন্টারভিউ দিতে আসব বলে রান্না-টান্না করতে পারব না।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'কেন? পিসিই বলল।'

'উনি কি আপনাকে সব কথাই বলেন?'

'যা দরকার তাই বলেন।'

'আপনিও কি ওকে সব কথা বলেন?'

'যা বলা যায় তাই বলি।'

'কি কি বলা যায় না?'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনি যে আমার স্কেচ আঁকেন...'

আর এগুতে পারলাম না। এতদূর বলেই হুঁশ হলো। কিন্তু কি করব? যা বলে ফেলেছি তা তো আর ফেরত নেওয়া যায় না?

সাগর সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ালো। 'আপনি দেখেছেন?'

মনে হলো কথাটা বলে ভালই করেছি! কত আর মনের মধ্যে চেপে রাখা যায়? হাসি চাপতে চাপতে বললাম, 'অমনি করে টেবিলের উপর পড়ে থাকলে দেখব না?'

আমার কথায় ও নার্ভাস হয়ে গেল।

'আর কি দেখেছেন?'

'আরো অনেক কিছু দেখার আছে নাকি?'

'বলুন না, আর কি দেখেছেন ?'

'আমার বিশ্বাস আপনি কিছুই লুকিয়ে রাখবেন না। তাই তো নিজে থেকে আর কিছু দেখিনি।'

'দেখেননি ?'

'না।'

আমি একটু থেমে বললাম, 'এখনই দেখাবেন ?'

সাগর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কি আর দেখবেন ? আমার এই ব্যর্থ জীবনের কিছু কিছু সুখ-দুঃখের কথা মাঝে মাঝে লিখে রেখেছি। যদি পড়তে চান দেব।'

মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলতে বলতে আমার দিকে চাইল। জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করল। 'পড়বেন ?'

'আপনার মনে যদি কোন দ্বিধা থাকে তাহলে পড়ব না।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ও বলল, 'আপনাকে পড়াতে কিছু দ্বিধা নেই তবে ভাবছি...'

'কি ভাবছেন ?'

'ভাবছি হয়ত কিছু মনে করতে পারেন।'

'আমি কিছু মনে করব না।'

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

সাগর হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও এগিয়ে দিলাম আমার হাত।

সাগর বাথরুম থেকে বেরুবার পরই ব্রেকফাস্ট খাওয়া হলো। তারপরই শুরু হলো আমার ইন্টারভিউ।

'আপনার নাম ?'

'আপনি আমার নামটাও জানেন না ?'

'আপনি তো বলেননি।'

'সরি!'

'দ্যাটস অল রাইট। নাম বলুন।'

'মিস বুলবুল সরকার।'

ও আমার নাম লিখতে লিখতে হাসছিল। জিজ্ঞাসা করলাম 'হাসছেন কেন ?'

'নামটা ভারী মিষ্টি।'

আমি কি বলব! আমিও একটু হাসলাম।

ও আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই ফর্মে অনেক কিছু লিখছিল। 'জিজ্ঞাসা না করে কি সব লিখছেন ?'

'ভয় নেই। আজেবাজে কিছু লিখছি না।'

'তবুও কি লিখছেন?'

'যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা আছে সেগুলো লিখে নিচ্ছি।'

'তার মানে?'

'আপনার বাবার নাম, ক ভাই-বোন, বাড়ির ঠিকানা, কতদিন এখানে আছেন বিয়ে করেছেন কিনা, চাকরি করেন কিনা, কতদূর লেখাপড়া করেছেন, ভাড় বাড়ি না নিজের বাড়ি, ব্যবসা আছে কিনা, কিসে যাতায়াত করেন, কোন ক্লাবে সদস্য, ড্রিংক করেন কিনা ইত্যাদি বহু খুচরো প্রশ্নের উত্তর জানা আছে বলে আপনাকে বিরক্ত করছি না।'

আমি বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ও. কে। গো অ্যাহেড।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর আবার ফর্ম ভরতে লাগল

বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল। পনের-কুড়ি মিনিট তো হবেই। ও তখনও সিগারে টানতে টানতে লিখে যাচ্ছে। আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

'সারা ফর্মটাই কি আপনি ফিল-আপ করছেন?'

'ও মুখ না তুলেই উত্তর দিল, 'সম্ভব না।'

'তাহলে আর কতক্ষণ?'

'হোল্ড ইওর ধৈর্য।'

ধরলাম। ধৈর্য ধরে আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ ও আবা প্রশ্ন করতে শুরু করল, 'এখানে আসার পর কি আপনার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভি বেড়েছে?'

'কিছুটা বেড়েছে তো নিশ্চয়ই।'

'সংসারের জিনিসপত্র কি নগদ কেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি রেডিমেড জামা-টামা...'

'আমাদের আর কি রেডিমেড জামা হবে?'

দুজনেই হেসে ফেললাম।

'সুতি-সিল্ক-টেরিলিন—তিন রকম কাপড়ই ব্যবহার করেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোনটা বেশী?'

'সুতী।'

'মিলের না হ্যান্ডলুমের?'

'হ্যান্ডলুম বা তাঁতের।'

'আপনাদের কি ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান আছেন?'

'হ্যাঁ। একজন আছেন।'

'প্রয়োজনবোধে কোন স্পেশ্যালিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করেন?'

'হ্যাঁ। দু-একবার করা হয়েছে...'

'চিকিৎসার খরচ কি নিজেরাই বহন করেন?'

'হ্যাঁ।'

'হাসপাতালে যান কি?'

'না।'

'এখানে আসার পর কোন ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে?'

'না।'

আবার সাগর ফর্মের কয়েকটা জায়গা নিজেই ভরল।

'সিনেমা দেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভারতীয় না ইংরাজী ছবি দেখেন? নাকি দুইই?'

'এখানে শুধু ইংরেজী ছবি দেখি। হিন্দী সিনেমা দেখি না।'

'মাসে একটা সিনেমা দেখেন?'

'দুটো-তিনটে।'

'আমাকে কবে দেখাবেন?'

ও যেমন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল আমিও তেমনি গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলাম, 'আজই।'

এবারও আমার দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ম্যাটিনী না ইভনিং শোতে?'

'ম্যাটিনীই ভাল।'

সাগর এতক্ষণে কলম বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল। 'সত্যি সিনেমা দেখাবেন?'

'কেন দেখাব না?'

'ভেরী গুড।'

ও আবার হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও ডান হাত এগিয়ে দিলাম। হ্যান্ডশেক করলাম। ও বেশ জোরে আমার হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যান্ডশেক করল।

সাগর এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'চা খাবেন?'

'আপনি খেলে খেতে পারি।'

আমি বসে রইলাম। ও উঠে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে এলো। চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি বসে সিগারেট টানতে টানতে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। মিট মিট করে চাপা হাসছিল।

'হাসছেন কেন?'

'ভাল লাগছে।'

'কেন?'

'এমন একটা বুলবুল সরকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে।'

'বাজে বকবেন না।'

বেয়ারা চা নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার ইন্টারভিউ শেষ?'

'না।'

'তবে আবার শুরু করুন।'

'আজ আর না।'

'তবে আবার কবে?'

'আবার যেদিন আপনি আমার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাবেন সেদিন...'

'আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'যত মেয়ের ইন্টারভিউ নিয়েছেন তারা সবাই বুঝি আপনার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছেন?'

'কেন হিংসা হচ্ছে?'

'হিংসা হবে কেন? জানতে চাইছি।'

সাগর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসল।

'ইন্টারভিউ নিন।'

'আজ আর না।'

'তবে কবে?'

'আজ একটু গল্প করি।'

আমি আরো কয়েকবার বললাম। রাজী হলো না। শেষে হাতের ঘড়ি দেখিয়ে বলল, 'সাড়ে এগারোটা বাজে। একটু পরেই তো খেতে যেতে হবে।'

'একটু পরে কেন? চলুন এখনই পিসির ওখানে যাই।'

'আগে গেলে উনি খুশী হবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সাগর অ্যান্টিরুমে গিয়ে বুশ-শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলো। ফাউন্টেন পেন, পার্স ইত্যাদি পকেটে পুরতে পুরতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি সিনেমা দেখাবেন নাকি কাজকর্ম করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে বেরুব?'

'কাগজপত্র নিয়ে বেরুতে হবে না।'

'তাহলে শুধু আপনাকে নিয়েই বেরুব?'

আমি হাসলাম। 'আমার নাম বুলবুল কিন্তু আপনার মুখেই বেশ বুলবুলি ফুটতে শুরু করল।'

'বুলবুলের সঙ্গ-দোষ।'

বেরুবার আগে বাবাকে টেলিফোন করলাম, 'আমরা এখনই পিসির ওখানে যাচ্ছি। তুমি ঠিক সময় আসছ তো?'

বাবা বললেন, 'তোরা কি ভেবেছিস বলতো?'

'কেন ?'

'একটু আগেই মাধুরী ফোন করল, এখন তুই করছিস।'

'পিসি যে ভয়ে ফোন করেছে আমিও সেই একই কারণে ফোন করছি।'

বাবা হাসলেন। 'তোরা রওনা হয়ে যা. আমি এক্ষুণি আসছি।'

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। এত তাড়াতাড়ি আসব. পিসি ভাবতে পারেনি। দারুণ খুশী হলো।

আমি পিসিকে বললাম, তোমরা দুজনে গল্প কর, আমি বরং একটু কফি করে আনি।'

পিসি বারণ করল না। বলল, 'যা।'

তিনজনে মিলে কফি খাবার সময় পিসি সাগরকে বলল, 'কিছুদিন ধরেই ভাবছি আপনাকে আর আপনি আপনি বলব না—বলে ঠিক ভাল লাগে না।'

সাগর বলল, 'আমার তো মনে হয় আপনি আমাকে তুই বললে আরো সম্মানিত মনে করব।'

এই পিসি একটি বিচিত্র নারী। খুব বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন না, কিন্তু মুষ্টিমেয় যাদের সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা তাদের উনি ভালবাসেন। কল্যাণ কামনা করেন। এই নিউ ফরেস্টে এতদিন ধরে আছেন। কিন্তু বোধহয় এখানকার সব বাঙালীদের সঙ্গেও ওঁর আলাপ নেই। অনেকেই ওঁকে এর জন্য সমালোচনা করেন। ওঁকে কেউ বলেন—'অ্যারিস্টোক্র্যাট, কেউ বলেন অহংকারী।'

আমি নিজেও পিসিকে অনেকবার বলেছি আরো একটু বেশি মেলামেশা করতে। প্রথমে একদিন বলেছিল, 'সংসারের কাজকর্ম করে কতটুকুই বা সময় পাই ? তারপর একটু পড়াশুনা করি। বেশি লোকজনের সাথে মেলামেশা বা গল্পগুজব করার সময় কোথায় বল ?'

কিছুকাল পরে আবার কথায় কথায় ঐ একই প্রসঙ্গ উঠল। সেদিন পিসি একটু হাসল। বলল, 'আকাশে কত অসংখ্য তারা থাকে। ওদের সবাইকে দেখার চেষ্টা করেও পারব না। তাইতো শুধু চাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকি।'

পিসি বোধহয় মানুষের মনের কথা জানতে পারে। বুঝতে পারে। দাদার বিয়ে, মণিদার বিদায়ের পর বাবা কেমন আনমনা হয়ে পড়লেন। আমি আর মা সবকিছু বুঝেও কিছু করতে পারতাম না বলতে পারতাম না। বাইরের কেউ আমাদের এসব জানত না। পিসিও না, কিন্তু তবুও বোধহয় অনুভব করেছিল বাবার মনের শূন্যতা। দিনকয়েক পর, ভাইফোঁটার ঠিক আগে পিসি এসে বাবাকে ফোঁটা নিতে নেমন্তন্ন করল আর বলল, 'দাদা আপনি আমাকে মাধুরী বলে ডাকবেন।'

বাবা বলেন, 'কত ছেলেমেয়েই আমাকে দাদা বলে ডেকেছে, কিন্তু মাধুরীর মত এমন মিষ্টি করে আর কেউ দাদা ডাকেনি।'

সাগরের মনের মধ্যেও একটা বিরাট শূন্যতা চব্বিশ ঘণ্টা হাহাকার করছে।

আমাকে ওর ভাল লাগে, আমার মধ্যে মানসীর ছায়া দেখে কিন্তু তবুও শূন্যতার জ্বালা ওর ঘোচে না। পিসি ঠিক সময়ে ওর পাশেও এসে দাঁড়াল। আমি কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে এইসব ভাবছিলাম।

সাগরকে দেখলাম তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পিসিকে একটা প্রণাম করল। বলল, 'জানি আপনি মনে মনে সব সময়ই আমাকে আশীর্বাদ করেন, তবু আজকে আরেকবার করুন।'

পিসি কিছু বলতে পারল না। দুহাত দিয়ে শুধু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েই ভিতরে চলে গেল।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম আনন্দে, খুশীতে দুজনের চোখে জল এসেছে। দুজনের মুখ থেকেই কথা ফুরিয়ে গেছে। আমিও কিছু বলতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পরে সাগর বলল, 'পিসিকেও সিনেমায় যেতে বলবেন?'

'আপনি বললে ঠিক যাবে।'

'আমার নাম করে আপনিই বলুন।'

আমি উঠে গিয়ে পিসিকে বললাম। ওর নাম করেই বললাম। পিসি একটু হাসল। বলল, তোরা দুজনেই যা।'

'তুমি গেলে ও খুব খুশি হবে।'

পিসি আবার একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা যাব।'

খাওয়া-দাওয়ার পর পিসি বাবাকে বলল, 'দাদা, আপনি ওঁর গাড়িতে অফিস যান। ছুটির পর উনিই আপনাকে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।'

বাবা শুধু বললেন, 'ঠিক আছে।'

পিসেমশাই পিসিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

পিসি জবাব দিল, 'আমি সাগর আর বুলা এক্ষুনি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

তিনজনে সিনেমায় গেলাম। তারপর কোয়ালিটিতে পেস্ট্রি আর এসপ্রেসো কফি খেলাম। বেশ কাটল। পিসিকে পৌঁছে দেবার পর সাগরকে নামিয়ে দিতে গেস্ট হাউসে গেলাম। আমি আর নামলাম না। ও-গাড়ি থেকে নামার আগে বলে গেল, 'এমন সুন্দর একটা দিন আর আসবে কিনা জানি না, তবে আজকের দিনের কথা কোনদিন ভুলব না।'

আমি বললাম, 'এমন দিন আর আসবে না কেন?'

'জানি না। তবে ভয় হয়, আশঙ্কা হয়।'

স্টিয়ারিং-এর উপর দুটো হাত রেখে মাথা নীচু করে ওর কথা শুনলাম। তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার ইন্টারভিউ কবে নেবেন?'

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'যেদিন আবার অমন করে ঘুম ভাঙিয়ে চা দেবেন

সেইদিন।'

'গুড নাইট্‌।'

'গুড নাইট।'

এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা শুধু চাইতে জানে। পাবার অধিকার না থাকলেও চায়। সবার কাছ থেকে। সব সময়। প্রকাশ্যে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে। দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে সমানভাবে। সমাজে এইরকম মানুষই বেশী। গিজগিজ করছে চারপাশে। ঘরে-বাইরে সর্বত্র। ইচ্ছা না করলেও মন স্বীকৃতি না জানালেও সব সময় এদের শূন্যহাতে বিদায় দেওয়া যায় না। শুধু আমি নয়, বোধহয় সব মেয়েকেই সব মানুষকেই এইসব চিরঅতৃপ্ত মানুষের প্রেতাত্মার শিকার হতে হয়। কাউকে একবার, কাউকে বহুবার। কাউকে মুহূর্তের জন্য, কাউকে জীবনভোর। এর থেকেই জন্ম নেয় জীবনের ব্যথা, বেদনা, ব্যর্থতা। সবকিছু পেয়েও, সবকিছু থেকেও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই ব্যথা-বেদনার গ্লানিতে জ্বলে পুড়ে মরছে।

আবার এই পৃথিবীতেই কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ আছেন যারা নিজের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন না। কারু কাছ থেকেই কিছু চাইতে পারেন না! এদের জন্য কত মা, কত স্ত্রী, কত পুত্র-কন্যা উজাড় করে বিলিয়ে দিতে চাইলেও পারেন না। জীবনের এক অধ্যায়ে সঞ্চয় করে আরেক অধ্যায়ে বিলিয়ে দিতে হয়। সেটাই নিয়ম, সেটাই ধর্ম। সবার। মানুষের ও প্রকৃতির। কিন্তু সবাই কি বিলিয়ে দিতে পারে? সুযোগ পায়?

পায় না। পেতে পারে না। তা না হলে পৃথিবীতে অতৃপ্ত আত্মার হাহাকার থাকত না। বাতাস এত উত্তপ্ত হতো না, কাল-বৈশাখীর ঝড়ে সবকিছু ভাঙতো না, বর্ষায় দুকূল ভেসে যেত না।

বিচিত্র! অদ্ভুত!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না। বিছানার পাশের জানলা দিয়ে অজস্র কোটি মাইল দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইসব কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম সাগরের কথা। আর কিছু না হোক, গাড়ি থেকে নামবার সময় একবার কি আমার হাতটা ধরে বলতে পারত না 'গুড নাইট!'

এর আগে আমি পাঁচজনের একজন ছিলাম। স্বতন্ত্র হয়েও বৈশিষ্ট্য ছিল না। এখন তা নয়। আমি যেন নিজেই একটা দুনিয়া। একটা নতুন জগৎ। নতুন সত্তা নতুন অনুভূতি।

কিছুদিনের মধ্যে কত কি পাল্টে গেছে! গরম কালের দুপুর, শীতের রাত্রির মত আগে সময় যেন কাটতে চাইত না; ফুরুতে চাইত না। এখন? বসন্তের মিষ্টি

সন্ধ্যার মত দেখতে দেখতে দিনগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। দুপুর সকালকে গ্রাস করেই অপরাহ্নের ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ছে। তারপরই সৌরমণ্ডলের অধিপতি সূর্য রক্তাক্ত আহত সৈনিকের মত মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করছে চাঁদের কাছে। এ সব তো আগেও হতো কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হতো কি?

কখনই না।

সেই ছেলেবেলার নিরুপমাদির ক্লাসে শিখেছিলাম, পৃথিবী অবিরত ঘুরছে। শিখেছিলাম, পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু অনুভব করিনি। করার কারণ পাইনি। এখন আমার জীবনে সেই একটি গতি এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন পাগলের মত ঘুরতে শুরু করেছে। আশ্চর্য!

সুখের দিনগুলো, মিষ্টি অনুভূতিভরা মুহূর্তগুলোর গতি একটু বেশী? বোধহয় তাই! সিক্সথ্ ইয়ারে উঠেই আত্রেয়ীর বিয়ে হলো। আমরা দল বেঁধে ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম কিন্তু বৌভাতে যাইনি। বিয়ের দিন পনের পর ও যখন প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এলো, সেদিন আমাদের কি দারুণ উত্তেজনা। শেষের দুটো ক্লাশ আর করতে পারলাম না। উত্তেজনার অস্বস্তিতে কেউই ক্লাশে বসতে পারছিলাম না। সব মেয়েরাই বেরিয়ে পড়লাম। কফি হাউসের ভীড়ে গেলাম না। ওয়াই-এম-সি-এ—র কেবিনেও ঢুকলাম না। বেকার ল্যাবরেটরীর পিছনে ফাঁকা মাঠের একপাশে আত্রেয়ীকে ঘিরে আমরা সবাই বসলাম ফুলশয্যার গল্প শুনতে। কোন ভূমিকা না করে রেখা প্রশ্ন করল, 'জাপানের পার্লহারবার আক্রমণের মত তোকেও কি অতর্কিত আক্রমণ করেছিল?'

আত্রেীয় হাসতে হাসতে বলল, 'সে রাত্রে কোন আক্রমণই হয়নি।'

মাধুরী বলল, 'শয্যা পেলেই আক্রমণ হয় আর ফুলশয্যায় আক্রমণ হলো না?'

'না।'

পিছন থেকে কে যেন টিপ্পনী কাটল, 'বেশ গুল দিচ্ছিস তো।'

আত্রেয়ী আবার কি বলতে চেষ্টা করল কিন্তু রেখা বাধা দিয়ে জানতে চাইল, 'তুই কি মুসোলিনীর মত যুদ্ধের প্রথম অ্যাটাকেই পরাজয় স্বীকার করলি, নাকি নাৎসীদের মত আরো কিছুক্ষণ লড়তে পেরেছিলি?'

শুধু রেখা নয়, আমরা সবাই মিলে ওকে অনেকভাবে অনেকক্ষণ জেরা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওর কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ পেলাম না।

'সত্যি সেদিন রাত্রের কথা ভাবলে আমার নিজেরও অবাক লাগে। একটু গল্পগুজব কথাবার্তা বলতে বলতেই ভোর হয়ে গেল।'

এমন হয়। অনেকেরই হয়! জীবনের কোন না কোন সময়ে সবারই এমন হয়। মনে হচ্ছে এইত সেদিন সাগরের নিউ ফরেস্ট আসার কথা পিসির কাছে শুনলাম। এর মধ্যেই দুটো মাস কেটে গেল? আর ক সপ্তাহই বা ও এখানে আছে?

দেখতে দেখতে এই কটা দিনও ঝড়ের বেগে উড়ে যাবে।

সাগরের প্রতি আমার প্রেম নেই কিন্তু একটা আশ্চর্য সমবেদনায় মনটা ভরে গেছে। ওর সবগুলো ডায়েরী আমি পড়েছি। পড়েছি মাগোর কথা, মানসীর কথা। ও নিজে আমাকে পড়তে দিয়েছে। সবকিছু জানিয়েছে। ওর মনে কোন গ্লানি নেই। মানসীকে ভালবাসার মধ্যে কোন গ্লানি, কোন মালিন্য ছিল না। যদি কোন গ্লানি, কোন মালিন্য থাকত ওর মনে, ওর ভালবাসায়, তাহলে অমন করে নতুন-পুরানো ডায়েরীগুলো আমার হাতে তুলে দিত না। দিতে পারত না। গোলাপে কোন মালিন্য নেই বলেই কণ্টকে লাঞ্ছিত দেহটা দেখাতে কার্পণ্য করে না।

ওর ডায়েরী পড়ার পর, ওর ডায়েরীতে নিজের কথা পড়ার পর সাগরের মুখোমুখি হতে আমার লজ্জা করছিল। ডায়েরীগুলো ফেরত দেবার কথা ভাবছিলাম কয়েকদিন ধরেই কিন্তু যেতে পারিনি। ভাবছিলাম আমার কাছে আসতে ওরও নিশ্চয় লজ্জা করছে। শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরবেলায় ও হঠাৎ এসে হাজির হলো। খুব ক্লান্ত ছিল। সামনের ঘরে ঢুকেই সোফায় মাথা হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করল, 'সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' পড়েছেন?'

ওর প্রশ্নে অবাক হলাম। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ পড়েছি।'

'কেমন লেগেছে?'

'ভাল।'

'সাগর চ্যাটার্জির আবোল-তাবোলের চাইতেও ভাল?'

ওর কথা শুনে না হেসে পারলাম না। আমার হাসি দেখে ও প্রশ্ন করল, 'তাহলে, সত্যি আবোল-তাবোল লিখেছি, কি বলুন?'

ওর ক্লান্তি দেখেই আমি বুঝেছিলাম খেয়ে আসেনি। বললাম, 'দাঁড়ান আগে খাবার ব্যবস্থা করি। তারপর কথা হবে।'

কথা হয়েছিল। সেদিন খাবার সময় আর কয়েকদিন পরে আমার অসমাপ্ত ইন্টারভিউ নিতে নিতে কথা হয়েছিল।

সাগর বলেছিল, 'অন্যায়ভাবে আপনাকে নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছি, লিখেছি। ক্ষমা করবেন।'

'ক্ষমা চাইবার মত অন্যায় তো আপনি করেন নি।'

'অন্যায় করেছি বৈকি। আপনাকে নিয়ে এত কথা ভাবা, লেখা অন্যায় না?'

'ভাবনা-চিন্তা নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে ন্যায়-অন্যায় কি আছে?'

'ভাবনা-চিন্তায় বাধা দেওয়া যায় না বলেই কি অন্যায় নয়?'

কদিন পরে সকালবেলায় গেস্ট হাউসে গিয়েছিলাম। ও তখনও ঘুমুচ্ছে। কিছুক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলাম। ও যখন ঘুমিয়ে থাকে,

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, তখন ওকে আরো ভালো লাগে। মিষ্টি লাগে, সুন্দর লাগে! তবে বড় অসহায় মনে হয়। মায়া লাগে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো ছেলেবেলায় ওকে আরো সুন্দর আরো মিষ্টি দেখতে ছিল। তখন ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে শুতে মাগোর নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগতো। মন ভরে যেত। এখন যদি আমার মত কেউ...

ভাবতে গিয়েও লজ্জিত বোধ করলাম। আমি নিজেই কি ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে শোবার কথা ভাবতে গিয়েছিলাম? তাই কি হয়? হবার দরকার কি?

যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই। আমি বেশ বুঝতে পারি এসব ভাবনা-চিন্তার কোন যুক্তি নেই, অর্থ নেই। কিন্তু তবুও ভাবি। ভেবেছিলাম এই তো কয়েক মুহূর্ত আগেই ভেবেছিলাম। মানুষের মন বিচিত্র। আরো বিচিত্র মেয়েদের মন। যুবতীর মন। বিমলদার মত যারা দস্যু, তাদের ভাল না লাগলেও বাধা দিতে পারে না। পারিনি। কিন্তু সাগরের মত যারা পাশে থেকেও দাবী জানায় না, এগিয়ে আসে না, তাদের আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। আমি ক্লিওপেট্রা বা হেলেন অফ ট্রয় নয় ঠিকই! তবুও একজন যুবতী তো বটে। মনে হচ্ছে যেন আমি হেরে যাচ্ছি, ব্যর্থ হচ্ছি। যে জয়, যে ব্যর্থতা এই বয়সে আমার মত কোন মেয়ের পক্ষেই স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। হওয়া উচিতও নয়। বসন্তে যারা আনমনা হয় না, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যই কি কালবৈশাখী আসে!

আমিও কি কোনদিন কালবৈশাখীর মত...

খুব জোরে এক বুক নিশ্বাস টেনে সাগর পাশ ফিরল। রুবিয়া ভয়েলের ব্লাউজের উপর দিয়ে খাটাউ ভয়েলের শাড়ির আঁচল টানতে টানতে আমি দুপা পিছিয়ে গেলাম। মনে মনে যা কিছুই ভাবি না কেন, যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন, সেসব প্রকাশ করতে বড় দ্বিধা, বড় সংকোচ।

না, না, আর এমন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। ওর ঘুম ভাঙাবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। 'উঠুন অনেক বেলা হয়ে গেল!'

আবার ডাকলাম, 'শুনছেন অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

একবার দুবার, তিনবার ডাকলাম। উঠল না। কি করব? শেষপর্যন্ত কপালে ডান হাত দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে ডাকলাম, 'উঠবেন না? অনেক বেলা হয়ে গেছে!'

সাগর চোখ মেলে তাকিয়েই হাসল। একটু স্বপ্নমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। হাসতে হাসতে তাকাল। রোগের জীবাণুর মত প্রিয়জনের অনুভূতিও সংক্রামক। প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখ হয়, সুখে আনন্দ হয়! ওর হাসি দেখে আমিও হাসলাম।

হাসছিলাম ইন্টারভিউয়ের সময়েও। কয়েকটা মামুলি প্রশ্নের পর সাগর হাসতে হাসতে বলল, 'এবারের প্রশ্নের জন্য মার্জনা করবেন।'

'কেন মার্জনা করবার কি হলো?'

'ফ্যামিলী প্ল্যানিং নিয়ে প্রশ্ন করব বলে।'

লজ্জায় ও মুখ নীচু করেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

'আমার তো কোনও ফ্যামিলীই নেই।'

'তাতো জানি। তবুও কিছু হয়ত বলতে পারবেন।'

'আপনি কি করে জানলেন!'

'আমি জানি না; তবে প্ল্যানিং কমিশন অনুমান করে পূর্ণ বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের এ সম্পর্কে কিছু জানা আছে।'

ওর কথা শুনে আমার হাসি পেল। জানতে চাইলাম, 'আপনার অনুমানও কি তাই?'

'অনেক মেয়েই জানে। তবে...'

'আপনার কি ধারণা আমিও জানি?'

'কোন ধারণা নিয়েই কাউকে ইন্টারভিউ করি না।'

আমি এবার ওর হাত থেকে ফর্মটা নিয়ে প্রশ্নগুলো পড়লাম। ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর কথা শুনেছেন? কোথায় শুনেছেন? কি শুনেছেন? কি কি উপায়ে ফ্যামিলী প্ল্যানিং করা যায় জানেন? আপনি কোন্‌টি পছন্দ করেন? অন্যগুলি পছন্দ করেন না কেন? আপনার পরিচিতদের মধ্যে কোন্‌টি বেশী জনপ্রিয়? আরো কত কি। পড়তে পড়তে হাসি পেল। আমি ওর কলমটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে ঐ প্রশ্নগুলোর পাশে একটা বড় ব্রাকেট দিয়ে লিখলাম, সময় এলে সব প্রশ্নের উত্তর দেব। এবার ফর্মটা ভাল করে ভাঁজ করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, যত্ন করে রেখে দিন। দিল্লী গিয়ে প্ল্যানিং কমিশনে জমা করে দেবেন।'

এসব সত্ত্বেও সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়েছে।

পর পর দুদিন সাগরের দেখা পেলাম না। তার পরদিন বিকেলের দিকে পিসি টেলিফোন করল, 'হ্যাঁরে সাগরের খবর জানিস?'

'না তো।'

'গেল কোথায়? কোথাও যেন উধাও হয়ে গেছে।'

'তুমি কি গেস্ট হাউসে খবর নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। ওরা কিছু জানে না।'

'কবে আসবেন তাও বলে যাননি?'

'না!'

পিসি একটু থামল। তারপর বলল, 'ছেলেটা তো মহা চিন্তায় ফেলল।'

আমিও গেস্ট হাউসে অনেকবার টেলিফোন করেছি। আমারও চিন্তা হচ্ছিল। দুশ্চিন্তা। বারান্দায় চুপটি করে বসে চাক্রাতা রোডের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একেবারে গেটের সামনে এসে একটা অটো-রিক্সা থামল। সাগর নামল। হাতে

একটা ছোট্ট অ্যাটাচি কেস।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। 'কি ব্যাপার বলুন তো? কোথায় গিয়েছিলেন?'

সাগর একবার মিষ্টি দৃষ্টিতে আমার দিকে শুধু তাকাল।

ওর চোখে আমারও চোখ পড়ল। লজ্জা করল। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু কতক্ষণ? এক মুহূর্ত পরে আবার ওর দিকে, ওর চোখের দিকে তাকালাম। তখনও ঠিক একইভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। ভাল লাগল। একটু অস্বস্তি লাগলেও ভাল লাগল। বললাম, 'অমন করে কি দেখছেন?'

নির্বিবাদে জবাব দিল, 'আপনাকে।'

'কেন আমাকে দেখার কি হলো?'

'আপনার উৎকণ্ঠামাখা মুখখানা দেখতে ভাল লাগছে।'

আমি ঘুরে বারান্দার দিকে এগুতে এগুতে বললাম, 'আমার মুখে আবার উৎকণ্ঠার চিহ্ন কোথায় পেলেন?'

ও পিছন থেকে জবাব দিল, 'সর্বত্র।'

ড্রইংরুমের সোফায় বসতেই সাগরকে বললাম, 'পিসি আপনার উপর দারুণ রেগে গিয়েছেন।'

'কেন?'

'কেন তা বুঝতে পারছেন না।'

'না।'

'এমন করে না বলে চলে গেলে রাগবেন না?'

'না।'

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, 'মাগো বা মানসী থাকলে এমন করে না বলে চলে যেতে পারতেন?'

কথাটা বলে আর দাঁড়ালাম না। তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলাম। রান্নাঘরে। কেটলিতে চায়ের জল চাপিয়ে ঘুরেই দেখি রান্নাঘরেব দরজায় সাগর। এর আগে কোনদিন রান্নাঘরের দিকে আসেনি। এই প্রথম। ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি এখানে কেন? পারলাম না। ইচ্ছা করল না। ওকে যেন দেখেও না দেখার ভান করলাম।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খেতে দেবেন তো? ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।'

সাগর আমাকে ভালবাসে না। আমাকে ওর ভাল লাগে। আমাকে পছন্দ করে। আমি জানি। জানি ওর ডায়েরী পড়ে। জানি ওর ব্যবহারে। সংযত ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও মনের এই কথা, ভাব বেশ প্রকাশ পায়। আমি বুঝতে পারি। স্পষ্ট করে বুঝতে পারি।

সেদিন আমাদের এখানে চা-জলখাবার খেয়ে আমরা দুজনে পিসির ওখানে গেলাম। পিসিকে সামনে পেয়েই সাগর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'বকবেন

না।'

পিসি তাড়াতাড়ি ওকে দুহাত দিয়ে তুলে ধরতেই সাগর আবার বলল, 'বকবেন না তো?'

পিসি না হেসে পারল না। 'না, না বকব কেন?'

আচ্ছা ও যদি অমন করে পিসির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আমার কাছে কি কিছুই...

ঠিক বুঝতে পারি না আমি ওর কাছে কি চাই। কি আশা করি। প্রত্যাশা করি। কি পেলে খুশি হই। মন ভরে যায়। এসব কিছুই বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি ওর কাছ থেকে আরো একটু কিছু চাই। ঐ একটু কিছু পেলে ভাল লাগত। সেদিন ও রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে আসতে পারত না? আমার দুটো হাত ধরে বলতে পারত না, বুলা, রাগ করেছ? আমি তখনও গম্ভীর হয়ে থাকতাম? তখনও কি একহাত দিয়ে সাগর মুখটা তুলে ধরে বলতে পারত না, রাগ করো না? ও যদি আমাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে আদর করত তাহলেও আমি কিছু বলতাম না। বলব কেন? জানি, যে আমার ক্ষতি করবে না, অমর্যাদা করবে না, সে একটু আদর করলে আপত্তি করব কেন? বরং ভালই লাগবে। এইত আদর পাওয়ার বয়স। শুধু আদর কেন? আরো কত কি পাবার বয়স হয়েছে আমার। সে সব তো চাইছি না, চাইতে পারি না। সময় হলে পাব। নিশ্চয়ই পাব। নেব। যা দেবার তা দেব।

যখন একলা একলা চুপ করে বসে থাকি, রাত্রে শুয়ে থাকি, জানলা দিয়ে দূরে আকাশের তারা দেখি, দৈত্যের মত বিরাট কালো কালো পাহাড় দেখি, তখন যত আজে-বাজে চিন্তা মাথায় আসে। কাউকে কিছু বলতে পারি না, বোঝাতে পারি না। প্রাণ খুলে কথা বলব, এমন কেউ নেই! বাড়ির একমাত্র মেয়ে বলে বাবা-মা ভালবাসেন। খুব ভালবাসেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে তো মনের কথা বলা যায় না। তবু মা থাকতে দিনটা গড়িয়ে গড়িয়ে কাটত। এখন তো সারাদিন বোবা হয়ে বসে থাকি। পিসির কাছে গেলে ভাল লাগে। কিন্তু পিসি তো পিসি। এখানে আমার সমবয়সী একটাও বাঙালী মেয়েকে পাইনি। বাবার অফিসে দু-একটা ছোকরা প্রথম প্রথম একটু ঘুর ঘুর করত। দুর্গা বাড়ির লাইব্রেরীতে গেলে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে কিছু ছেলে অকারণে কথাবার্তা বলে আলাপ করত। দু-একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরে রোমান্টিক দৃষ্টিতে চাইত। ওসব ভাল লাগতো না। এখনও লাগে না। একটা বিচিত্র শূন্যতার মধ্যে সাগর এলো কিন্তু ভিতরে ঢুকল না, দরজায় এসে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভিতরে আসার আমন্ত্রণ জানাইনি কিন্তু ভিতরে আসতে তো মানাও করিনি! আপত্তি করিনি। বাধা দিইনি। তবে কেন ও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল! জানলা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি ও কি ঐ তারাগুলোর মত শুধু মিট মিট করে দেখবে। কাছে আসবে না? কাছে আসতে

পারে না ?

সাগর চলে গেলে কি করব ? এই কটা সপ্তাহ শেষ হলেই তো ও চলে যাবে। আর আসবে না। আসার দরকার হবে না। সেদিন কথায় কথায় বলেই ফেললাম, 'এবার তো আপনার যাবার সময় হয়ে এলো।'

'এখনও অনেক দেরী।'

'অনেক দেরী মানে ?'

'তিন সপ্তাহ তো নিশ্চয়ই।'

'তিন সপ্তাহ তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব ? যা ভাবছি বলতে পারলে নিজে হাল্কা হতাম, তাতো বলতে পারছি না। পারব না। চুপ করেই রইলাম।

সাগর জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ আমার যাওয়ার ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ শুরু করলেন কেন ?'

'এমনি ভাবছিলাম, আপনি আর কতদিন আছেন।'

'কেন আমি চলে গেলে দুঃখ হবে ?'

'আনন্দ হবে।'

ও হাসল। 'আনন্দ হবার কোন কারণ নেই, তা আমি জানি।'

'কেমন করে জানলেন ?'

'জানি, কিন্তু বলতে পারব না।'

'আচ্ছা তিন সপ্তাহে আপনার এখানকার কাজ শেষ হবে ?'

'হওয়া উচিত।'

'কাজ শেষ হলেই চলে যাবেন ?'

'কেন ? কাজ শেষ হলেও যাব না ?'

'যাবেন না কেন ? তবে কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবার কোন মানে হয় না।'

'হয় না ?'

'না।'

'তবে কি করব ?'

'কি আর করবেন ? কাজ শেষ হবার পর কয়েকদিন একটু বিশ্রাম করে নেবেন, একটু ঘুরবেন-ফিরবেন তারপর যাবেন।'

'ক দিন ?'

'দশ-পনের দিন।'

'দশ-পনের দিন পরে গেলে আপনি খুশী হবেন ?'

'শুধু আমি কেন, সবাই খুশী হবেন।'

'আমি আপনার কথা জানতে চাইছি।'

'আপনি থাকলে আমার কি ক্ষতি?'

'তা জানি। জানতে চাইছি আপনি খুশী হবেন কি?'

'আপনি থাকবেন কিনা তাই বলুন।'

সাগর একটু ভাবল। গভীরভাবে ভাবল। তারপর বলল, 'কাজ শেষ হবার পরও সপ্তাহখানেক থাকব, তবে তাতে আপনি খুশী হবেন না। বরং আরো খারাপ লাগবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

ও হাসল, 'কেন?' এবার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার প্রতি আপনার এত সমবেদনা যে তখন আরো খারাপ লাগবে।'

সমবেদনার মধ্যে কিছুটা কৃপা মেশান থাকে। কিছুটা ঔদার্য প্রচারের ব্যবস্থা থাকে। কিছুটা মহত্ত্ব লুকিয়ে থাকে। আমি তা চাই না। সাগরকে কৃপা করব কেন? কৃপা দেখিয়ে ওকে ছোট করব কেন? এমন সুন্দর একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাক, ব্যর্থ হয়ে যাক তা আমি চাই না। ও সারাজীবন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, শূন্য মন নিয়ে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, সাগরের কথা আমি না ভেবে পারব না। প্রকাশ্যে না পারি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাববো। একলা একলা ভাববো। স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে ভাববো। ছেলেকে কোলে করে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে ওর কথা ভাবতে হবে। হয়ত খুব কৃতী পাত্রের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে কিন্তু তার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙালে সে কি অমন স্নিগ্ধ মিষ্টি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার দিকে চাইবে? সে কি আমার হাতের এক পেয়ালা চা খাবার জন্য অমন অনুরোধ করবে? আমার স্বামী নিশ্চয়ই অনেক টাকা রোজগার করবে! আমাকে দামী দামী শাড়ি কিনে দেবে, নিজের মান-মর্যাদা কৃতিত্বের জন্য কিনে দেবে কিন্তু অত দিলেও কি সে মনে তৃপ্তি পাবে? হয়ত গাড়ি চড়ব কিন্তু বোটানিকসের পাশ দিয়ে শাল পাইনের ছায়ায় ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পিসির বাড়ি যেতে যে আনন্দ পেয়েছি তা কি পাব?

একটা সপ্তাহ ভূতের মত পরিশ্রম করল সাগর। এতদিন ধরে যত ইন্টারভিউ নিয়েছে যত তথ্য সংগ্রহ করেছে সেগুলোকে অ্যানালিসিস করে রিপোর্ট লেখা সহজ ব্যাপার নয়। সকাল থেকে মাঝ রাত্তির পর্যন্ত কাজ করত। প্রথম দুটো দিন তো নিজের ঘরের বাইরেও যায়নি। খবরটা কানে পৌঁছুতেই পিসি ছুটে গিয়েছিল গেস্ট হাউসে।

'কি ব্যাপার বল তো?'

সাগর প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি, 'কেন কি হলো?'

'তুমি দুদিন ঘরের বাইরে যাও না?'

সাগর শুধু হাসল।

পিসি আরও রেগে গেল, 'এমন পাগলামী করলে তুমি আমার কাছে মার

খাবে।'

সাগর হাসতে হাসতে বলল, 'আমার কি সে সৌভাগ্য হবে?'

সাগরের কথায় পিসিও না হেসে পারল না। 'বকুনি খেলে বুঝবে সৌভাগ্যের ঠেলা কি রকম।'

এরপর রোজ সন্ধ্যার পর পিসির সঙ্গে সাগর ঘণ্টাখানেক ঘুরত ফিরত গল্পগুজব করত। তারপর আবার কাজে বসত। পিসির কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি ওকে টেলিফোন করলাম, 'এমন করে কাজ করতে কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে!'

ও নির্বিবাদে বলল, 'আপনি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ আপনি। পুরোটা না হলেও কিছুটা তো বটেই।'

'তার মানে?'

'পাগল না হলে কাজ শেষ হবার পরও আমার মত অপরিচিত ছেলেকে কেউ থাকতে বলে?'

এ কথার কি কোন জবাব হয়? এই পৃথিবীতে পরিচিতের কি কোন সংজ্ঞা আছে? এই দুনিয়ায় কে পরিচিত? কে অপরিচিত? তাছাড়া পরিচিত অপরিচিতের কি কোন স্থায়িত্ব আছে? আজ যে পরিচিত, কাল সে অপরিচিত। চিরদিনের জন্য, চিরকালের জন্য সে হয়ত স্মৃতি থেকে মুছে যাবে। এই বিশ্বে যেমন শূন্যতা নেই, থাকতে পারে না, মানুষের মনও কখনও শূন্য থাকে না, স্মৃতির ভাণ্ডার কখনো অপূর্ণ হয় না। অপরিচিত পরিচিত হয়, আপন হয়, মনের মানুষ হয়। দেহের অণু-পরমাণুর মধ্যে তার সত্ত্বা অনুভব করা যায়। মনের দিগন্ত বিস্তৃত মহাকাশে সে পূর্ণিমার চাঁদের মত বিরাজ করে।

সাগর আমার অপরিচিত? জানি না। জানতে চাই না। কয়েক মাস আগেও আমি ওকে চিনতাম না, জানতাম না, ওকে দেখিনি, ওর ঘরবাড়ি—আত্মীয়পরিজনকে জানি না বলেই ও আমার অপরিচিত? যাদের স্থূল দেহটাকে আমি চিনি, আমি দেখছি ঘরে-বাইরে বহুদিন ধরে দেখছি, কিন্তু যাদের মনের হদিশ পাইনি, পেতে চাই না, পাবার আগ্রহ অনুভব করি না, তারাই আমার পরিচিত?

সাগরকে আমি বলতে পারলাম না, ভবিষ্যতেও হয়ত পারব না যে মনে হয় বহুদিন আগে, বহু জন্ম পূর্বে, একই শিল্পীর হাতে বোধহয় আমাদের দুটি মন জন্ম নিয়েছিল। তারপর হারিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি, আমি। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখেই যেন মনে হয়েছিল আপনি আমার পরিচিত। আপনি আমার আপনজন।

'আপনার এ কথার জবাব আজ নয়, পরে দেব।'

কথাটা বলেই মনে হলো সে সুযোগ কি কোনদিন আসবে? এই পৃথিবীতে,

এই সমাজে মানুষকে এত আজে-বাজে কাজে এত অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে হয় যে আসল কথা মনের কথা বলার সুযোগ বড় কম। এই পৃথিবীতে কটা মানুষ আছে যারা প্রাণ খুলে কথা বলে? বলতে পারে? বলার সুযোগ পায় বা সাহস আছে?

ও জানতে চাইল, 'যাবার আগেই বলবেন তো?'

'না।'

'তবে আবার কবে বলবেন?'

'পরে।'

'পরে মানে?'

'যখন সময় হবে, সুযোগ আসবে, আপনি শুনতে চাইবেন, আমিও বলতে পারব তখন।'

'এই ডেরাডুন ছাড়ার পরেও কি আমাকে মনে থাকবে?'

হাসলাম। হাসব না? পাগলের মত কথা বললে হাসব না? দৃষ্টির বাইরে গেলেই সব কিছু ভুলে যাওয়া যায়? উনি কি মাগো বা মানসীকে ভুলতে পেরেছেন? ভুলতে পেরেছেন শিলচরের কথা? বরাক নদীর কথা? ডেরাডুন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি উনি আমাদের, আমাকে, পিসিকে ভুলতে পারবেন? এই দুটো চোখ দিয়ে কতটুকু দেখা যায়? চোখ দুটো বড় করলেই তো অনেক বেশী কিছু দেখা যায়। চোখের দৃষ্টি যেখানে শেষ, অন্তর দিয়ে সেখানে উপলব্ধি করা যায়। সাগর চলে গেলে ওর রক্ত-মাংসের চেহারাটা দেখতে পাব না ঠিকই, কিন্তু মনে মনে, অন্তরের মধ্যে, হৃৎপিণ্ডের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে ওকে আরো বেশী মনে পড়বে। হাতের কাছে না পাবার বেদনার মধ্য দিয়ে নতুন করে পাবার তীব্রতা জন্ম নেবে। নিতে বাধ্য।

'ডেরাডুন ছাড়ার আগেই ভুলে যাব!'

'না, না, তাই কি হয়?'

'কেন হবে না?'

'আমার বিশ্বাস।'

'আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখব তা জানলেন কেমন করে।'

'আপনাকে দেখে, আপনার সঙ্গে মেলামেশা করে।'

ঐ একটা সপ্তাহ আমি খুব বেশী বিরক্ত করিনি। করতাম না। রোজই টেলিফোনে কথা হতো। একদিন গেস্ট হাউসে গিয়েছিলাম। আমি যেতে চাইনি। বাবা জোর করে নিয়ে গেলেন। পিসির ওখানে দুদিন গেলাম, কিন্তু ওর কাছে যাইনি। বাবার সঙ্গে সেদিন ওর ওখানে গিয়ে কাগজপত্র দেখে বুঝলাম কি দারুণ কাজে ব্যস্ত। আমি জানতাম আমি গেলেই ওর কাজের ক্ষতি হবে, কাজ শেষ হতে দেরী হবে। তাছাড়া অনেক সময় দু-একজন সরকারী অফিসার-কর্মচারীও

থাকতেন। ভীড়ের মধ্যে অপরের সঙ্গে সাগরকে পেতে ভাল লাগত না। লাগে না।

পিসিরা এসেছিল সন্ধ্যার পরই। ওরা চলে যাবার পরই আমি আর বাবা খেয়ে নিলাম। একটু পরেই বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন। টুকটাক কাজকর্ম সেরে, দরজা-টরজা বন্ধ করে পিছনের দিকের জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলাম। আমার ঘরের পিছন দিকেই একটা ছোট বাগিচা। শুধু কয়েকটা লিচু গাছ। চারপাশ উঁচু পাঁচিলের মাঝে একটা দরজা আছে। পিছনের রাস্তায় যাওয়া যায়। আমরা কেউ যাই না। চাকর-বাকররাই ব্যবহার করে। রাত্রে প্রতাপ সিং চলে গেলে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। আজও দিয়েছি। বাগিচায় যাবার জন্য আমার ঘরের মধ্য দিয়ে একটা দরজা আছে। ভেতরের বারান্দার কোণার দরজা দিয়েই সাধারণত বাগিচায় যাতায়াত করা হয়। সে দরজাটাও এখন বন্ধ। অর্থাৎ রাত্রে আমিই এই ছোট্ট বাগিচাটার মালিক। কখনও কখনও আমি দরজা খুলে বাগিচায় যাই পায়চারী করি। লিচু গাছের তলায় রাখা খাটিয়ায় শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। ভাবি নানা কথা। ছেলেবেলার কথা, মণিদার কথা, স্কুল-কলেজের কথা, ইউনিভার্সিটির কথা। আরো কত কি। কখনও আবার ভবিষ্যতের কথাও ভাবি।

কদিন আগেই ভাবছিলাম। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুর সাহেবের পুত্রবধূর কথা। সাবিত্রীর কথা। আমাদের বাড়ির ঠিক পিছন দিকেই ওদের বাড়ি। ওরা ইউ-পির জাঠ। খুব ধর্মভীরু। প্রায়ই পুজোপার্বণ হয়। একবার পুজোর প্রসাদ নিতে এসেই সাবিত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বেশ মেয়েটি। রংটা একটু চাপা হলেও চোখ-মুখ দেহের গঠন ভারী সুন্দর। ছাপা শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে যখন আসে তখন আরো ভাল লাগে। ও খুব বেশী আসে না, বড় জোর সপ্তাহে একদিন। সামান্য সময়ের জন্যই আসে। তা হোক। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ পাই। বড্ড সরল। এত সরল যে ভাবা যায় না। বাংলাদেশে এত সরল মেয়ে পাওয়া যায় না। আমি দেখিনি। শুনিনি। ভাবতে পারি না। আমি ওর চাইতে বয়সে বড়। তিন-চার বছরের বড়। আমাকে দিদি বলে। তবে কথাবার্তা বলে ঠিক সহেলীর মত, বন্ধুর মত।

কদিন আগেই সাবিত্রীর একটা ছেলে হয়েছে। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা হাসপাতালেই হয়েছে। বিকেলের দিকে। ব্যথা উঠেছিল ভোরের দিকে। সকালে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল সাবিত্রী। গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর কষ্ট দেখে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। ও বার বার আমার হাত চেপে ধরে বলছিল, দিদি আর পারছি না, আমি মরে যাব! আরো কত কি বলেছিল। কেঁদেছিল। ছেলেকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে আবার সাবিত্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন হাসছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'দিদি, তোমাকে খুব জ্বালাতন করেছিলাম, তাই না?'

আজ এই রাত্রে লিচু গাছের তলায় খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ সাবিত্রীর কথা মনে পড়ল। বাচ্চা হবার আগে আর কোন মেয়েকে আমি এমনভাবে দেখিনি। সাবিত্রী আমার চাইতে বয়সে ছোট। আমি ওর চাইতে বয়সে বড় কিন্তু আমার যদি ঐ রকম ব্যথা ওঠে?

গা শিউরে উঠল।

বিয়েই হয়নি যখন, তখন এ ভাবনা কেন? বিয়ে হয়নি ঠিকই কিন্তু হবে তো। দু-এক বছরের মধ্যে হবে। তারপর তো সাবিত্রীর মত কষ্ট পেতেই হবে। পারব তো সহ্য করতে? তাছাড়া মার কাছে শুনেছি বেশী বয়সে বাচ্চা হলে বেশী কষ্ট হয়। ছুরি-কাঁচি দিয়ে অনেকের পেট কাটাকাটি করতে হয়েছে।

লিচু গাছের তলায় একলা সব কথা ভাবতে ভয় লাগল। তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এলাম। বাইরে মনে হচ্ছিল অনেক রাত হয়েছে। রাত একটা-দেড়টা। ঘরে এসে ঘড়িতে দেখলাম মোটে সাড়ে দশটা বাজে। পাখাটা ফুল স্পীডে চালিয়ে বিছানায় বসলাম। শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে নিলাম। তারপর ড্রেসিং টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ব্লাউজ খুলে সারা গায়ে পাউডার মাখলাম। ঘাম প্যাচপেচে শরীর নিয়ে আমি কিছুতেই শুতে পারি না। ভীষণ ঘেন্না করে। তাইতো ব্লাউজ-ট্লাউজ গায় দিয়ে গরমের দিনে শুতে পারি না। কোন কালেই পারি না। একটু বড় হবার পর থেকেই একটা ঘরে একলা থেকে এই অভ্যাস হয়েছে। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু একান্ত নিজস্ব অভ্যাস থাকে। থাকেই। ছেলেদের, মেয়েদের, সবারই থাকে। খাওয়া-পরার মত শোবারও অভ্যাস থাকে। কেউ একলা শুতে পারে না, কেউ বা একলা না হলে ঘুমুতে পারে না। আরো কত রকমের অভ্যাস থাকে। বিচিত্র ধরনের অভ্যাস।

রাত্রে শোবার আগে মাঝে মাঝে নানারকম চিন্তা মাথায় আসে। ভাবি বিয়ের পর কি করব? অন্ততঃ প্রথম প্রথম। হঠাৎ একদিন শুভক্ষণে একটা অপরিচিত ছেলের গলায় মালা পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা-সম্ভ্রমের মাথা খুইয়ে তার কাছে সব কিছু বিলিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বরং অসম্ভব। আমি তো ভাবতেই পারি না। খুব জানাশুনা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে অবশ্য কিছুটা..

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিলাম, কিন্তু হঠাৎ টেলিফোনের বেল বাজতেই চমকে উঠলাম। লজ্জায় চমকে উঠলাম। যেন কেউ ঘরে ঢুকে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে বললাম, 'হ্যালো।'

'আমি হ্যালো নই, আমি সাগর।'

'জানি।'

'কি জানেন?'

'জানি এখন আর কেউ ফোন করবে না।'

'কেন অনেক রাত হয়েছে?'

'ঘড়িতে বেশি রাত হয়নি, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এখন মাঝ রাত।'

'মাঝ রাত?'

'হ্যা। বাবা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমি একলা কতক্ষণ জেগে থাকব?'

'এতক্ষণ কি করছিলেন?'

হাসলাম। কি করছিলাম, কি ভাবছিলাম তাই কি বলা যায়? অসম্ভব।

বললাম, 'গল্পের বই পড়ছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি করছিলেন?'

'কাজ করছিলাম। মানে কাজ শেষ করলাম।'

'শেষ হলো?'

'হ্যাঁ। নাউ আই অ্যাম ফ্রি।'

'ভেরি গুড।'

'আপনার ওখানে আড্ডা দিতে আসি?'

আচ্ছা সত্যিই যদি আসে? যদি আসত? লিচু গাছের তলায় খাটিয়ায় বসে আড্ডা দিলে মন্দ হতো না!

আমি বললাম, 'মাঝে মাঝেই তো আসব বলে ভয় দেখান। এত রাত্রে আসার সাহস আছে আপনার?'

'নেই?'

'না।'

'সত্যি আসব?'

'আপনার ইচ্ছা।'

'সত্যিই যেদিন পালে বাঘ পড়বে সেদিন ভয় পাবেন না তো?'

'ভয় পাবার কি আছে?'

'ঠিক আছে। মনে রাখবেন।'

আমি সত্যি সত্যিই পাল্টে যাচ্ছি! পাল্টে গেছি। কলেজে পড়বার সময়ই কত মেয়ে কত কি করত। জানতাম, শুনতাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েও কত কি শুনেছি! বহু কিছু। নিন্দা করিনি, প্রশংসা করিনি। তবে শুনতে ভালই লাগত। শুধু শুনতে। এখন যেন অন্য রকম মনে হয়। মনে হয় আমারও কিছু হোক। কিছু অভিজ্ঞতা। নতুন অভিজ্ঞতা। নতুন অনুভূতি। নতুন স্বাদ। নতুন আবিষ্কার। সাগর যদি এখন এই রাত্রে, এই আবছা আলোয় লিচু গাছের তলায় খাটিয়ায় আমার পাশে বসে গল্প করত, গল্প করতে করতে আমার-হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চাপ দিত, আমাকে একটু আলতো করে জড়িয়ে ধরত, আমি আপত্তি করতাম না। বরং ভালোই লাগতো। বেশ ভাল হতো।

রাত্রে এলো না ঠিকই কিন্তু পরের দিন সকালেই এলো। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, চোখে সানগ্লাস দিয়ে। বাবা অফিসে বেরুবার ঠিক আগে এলো। ও মাঝে মাঝে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে। পিসির বাড়ি যায়। আমাদের এখানে কোনদিন ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আসেনি। আজই প্রথম। ছুটির দিনে বাবাও ধুতি-পাঞ্জাবী পরেন। কর্মজীবনের শুরুতে বাবা বছর খানেক অধ্যাপনা করেছেন। সে সময় ধুতি-পাঞ্জাবী পরতেন। এখনও তাই অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। ছাড়তে চান না। বলেন পুরনো দিনের এই সামান্য স্মৃতিটুকু আঁকড়ে ধরে রাখতে ভালই লাগে। তাছাড়া অফিসার হলেও তো বাঙালী!

সাগরকে দেখে বাবা খুব খুশী হলেন। বললেন, 'বাঃ! আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ইউ আর এ ব্রাইট বেঙ্গলী বয়।'

সাগর হাসতে হাসতে জানতে চাইল, 'তাহলে অন্য দিন ব্রাইট মনে হয় না।'

'ব্রাইট মনে হয়, কিন্তু বাঙালী মনে হয় না।'

সাগর বসল।

বাবা টাইয়ের নট বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার রিপোর্ট তৈরী কতদূর?'

'রিপোর্ট লেখা শেষ।'

'শেষ।'

'হ্যাঁ।'

'কবে শেষ হলো?'

'কাল রাত্তিরে।'

আমি কোটটা বাবার পিছনের দিকে ধরলাম। উনি দুটি হাত পিছন দিকে দিয়ে কোট পরতে পরতে বললেন, 'তাই তোমাকে এত ফ্রি দেখাচ্ছে।'

ও শুধু হাসল।

বাবা বেরুবার মুখে বলে গেলেন, 'খাওয়া-দাওয়া না করে যেও না। তাছাড়া সন্ধ্যার পর এসো, তোমার রিপোর্টের কথা শুনব।'

বাবাকে রওনা করে দিয়ে ড্রইংরুমে আসতেই সাগর বলল, 'আপনার বাবার কথা শুনলেন?'

'কেন কি হলো?'

'এখন খেয়ে যেতে বললেন। আবার সন্ধ্যার পরও আসতে বললেন...'

'হ্যাঁ তাতে কি হলো?'

'তার মানে দুপুরবেলা রোদ্দুরের মধ্যে আমাকে এ বাড়ীর বাইরে থাকতে হবে।'

আমি হাসলাম। 'মোটেও বাবা তা বলেন নি।'

'তাহলে দুপুরেও এখানে আশ্রয় পেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

ও একটু অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

'অমন করে কি দেখছেন?'

সাগর কোন জবাব না দিয়ে ঠিক একই ভাবে চেয়ে রইল। আমি বললাম, 'তাকাতে হয় তো সানগ্লাস খুলে তাকান।'

সানগ্লাস খুলে বলল, 'চা-টা কিছু খেতে দেবেন না?'

'নিশ্চয়ই।'

রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে সাগরকে ভিতরে ডাক দিলাম। ও এলো। ফ্রেঞ্চ টোস্ট দেখেই ও বলল, 'আমার খাওয়া-দাওয়া পছন্দ-অপছন্দগুলো তো বেশ জেনে গিয়েছেন।'

'মাগোর ছেলে যে আজেবাজে কিছু খেতে ভালবাসে না, তাও জানব না?'

'তাই তো দেখছি।'

প্রতাপ সিং চা নিয়ে এলো। চা তৈরী করলাম। ওকে দিলাম, আমি নিলাম।

সাগর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'মাগোর ছেলে আর কি ভালবাসে তা জানেন?'

সাগর মুশকিলে ফেললো। সব না হলেও কিছু কিছু জানি। কিছু কিছু বুঝতে পারি। অন্তত তাইতো মনে হয়। কিন্তু সেসব বলা যায় না। লজ্জা করে। সঙ্কোচ হয়।

ভ্রূ কুঁচকে হাসি লুকিয়ে বললাম, 'অন্তত এইটুকু জানি এখানকার কাউকে আপনি পছন্দ করেন না।'

'তার মানে?'

'এত সোজা কথার মানে বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

'তবে বুঝে দরকার নেই।'

'তাই কি হয়?'

আমি চুপ করে গেলাম। স্যার কয়েকবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। চাপা মিষ্টি হাসি।

ওর চোখে চোখ পড়তেই আমি একটু হাসলাম। 'হাসছেন কেন।' ও নির্বিবাদে বলল, 'আপনার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।'

'আমার কথা শুনে?'

'হ্যাঁ।' মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলল, 'কি করে জানলেন, এখানকার কাউকে পছন্দ করি না?'

'বলব না।'

সাগর হেসে ফেললো! 'আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে তো বেশ লাগে!'

কথাটা বলেই সাগর উঠে দাঁড়াল।

'যাচ্ছেন কোথায় ?'

'এই একটু ঘুরে-ফিরে বেড়াব।'

'এই রোদ্দুরে ?'

'জীবনটাই যার মরুভূমি তার আবার রোদ্দুরে কি হবে ?'

কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলাম না। মাথাটা নীচু করে একটু ভাবলাম। 'চলুন পিসির ওখানে ঘুরে আসি।'

'চলুন।'

ও ড্রইংরুমে গেল। আমি প্রতাপ সিংকে রান্নার সব কিছু বুঝিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে চিরুনি দিয়ে চুলগুলোকে একটু টেনে নিলাম। চোখে সানগ্লাস দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দেখেই ও প্রায় হাঁ করে চেয়ে রইল।

আমি বললাম, 'চলুন।'

'আপনার সঙ্গে যাব ?'

'কেন যাবেন না ?'

'মানে... ।'

'মানে আবার কি ?'

ও আর কিছু বললো না। আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়িটা শহরের প্রায় শেষের দিকে। সব সময় অটো-রিকসা পাওয়া যায় না। পাওয়া গেল না। তবে একটা খালি সাইকেল রিকসা শহরের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। রিকসাটা থামিয়ে উঠে পড়লাম।

সারা উত্তর ভারতের সাইকেল রিকসাগুলোই কেমন ছোট ছোট। দুজনে পাশাপাশি বসতে বেশ কষ্ট হয়। গায় গায় লেগে যায়। আমাদেরও লাগছিল। একটু দূর যাবার পরেই সাগর জিজ্ঞাসা করল, 'একটা সিগারেট ধরাব ?'

'তার জন্য অনুমতি চাইছেন কেন ?'

'অনুমতি চাইছি না। পাশে বসে সিগারেট খেলে আপনার অসুবিধা হতে পারে তো...'

'না না, অসুবিধা হবে কেন ?'

পাঞ্জাবীর বাঁ পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট-দেশলাই বের করতে গিয়ে ওর কনুইটা আমার বুকে লাগল। হঠাৎ লাগল। আমি এমন গম্ভীর হয়ে রইলাম যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'সরি।'

সারা রাস্তা আর কথা হলো না। তাছাড়া ক মিনিটেরই বা পথ! ও সারা পথ সিগারেট-দেশলাই হাতে করে বসেছিল। পকেটে রাখেনি। রাখতে চেষ্টা করেনি। অন্য যে কোন ছেলে হলে নিশ্চয়ই রাখত। হয়ত অনেকক্ষণ ধরে রাখার চেষ্টা করত। সাগর তা করতে পারে না। পারবে না। কোনদিনই না।

পিসির বাংলোর সামনে থামতেই রিকসাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'সাব ওয়াপাস

জানা হ্যায় ?'

আমি বললাম, 'ফিরে যাব তবে একটু দেরী হবে।'

রিকসাওয়ালা বলল অপেক্ষা করবে। এই রোদ্দুরে কোথায় শুধু শুধু ঘুরবে? ঘুরলেই কি প্যাসেঞ্জার পাবে? তাছাড়া এই রিকসা ছেড়ে দিলে আমাদেরও ফেরার সময় মুশকিল হবে! বললাম, 'ঠিক হ্যায়।'

পিসি আমাদের দেখেই বলল, 'কি সাগর, আবার ঘুরে এলে?'

সাগর জবাব দেবার আগে আমি জানতে চাইলাম, 'আপনি বুঝি পিসির এখানে এসেছিলেন?'

সাগর বলল, 'হ্যাঁ!'

'আপনি তো কিছুই বললেন না?'

'আপনিও তো জানতে চাননি?'

পিসী বলল, 'তোরা তর্ক বন্ধ কর।'

তর্ক বন্ধ হলো! লস্যি খাওয়া হলো। একটু গল্পগুজব করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পিসি বলল, 'সন্ধ্যার পর আসবি।'

আবার সেই সাইকেল রিকসা। সেই গায় গায় লাগিয়ে বসা। কিছুক্ষণ চুপচাপ। ছোট্ট জু টার পাশ দিয়ে বোটানিক্সের কাছে এলাম। কয়েকজন সাইকেলে পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। দেখার চেষ্টা করল। রোদ্দুরের জন্য আমাদের মাথার ওপর হুড দেওয়া আছে। তার আড়ালে দুজনের মুখ। বাইরে থেকে দেখা যায় না। দুএকজন আবার পাশ দিয়ে যাবার সময় জোরে সাইকেলের ঘন্টা বাজিয়ে গেল। দুজনেই হাসলাম। হাসতে হাসতে দুজনের দিকে তাকালাম।

আবার একটু চুপচাপ।

'রিকসা চড়তে আপনার খারাপ লাগে নাকি?'

'শিলচর ছাড়ার পর আর রিকসা চড়িনি তাই..

তাই কি?'

'ভালই লাগছে। তাছাড়া...'

তাছাড়া?'

'বলব?'

'বলুন।'

'আপনার মত গাইড থাকলে আরো ভাল লাগে।'

'বাজে বকবেন না।'

'বাজে কথা আমি বলি না।'

'বাজে কথা বলেন নি, মিথ্যা কথা বলছেন।'

'মিথ্যা কথাও আমি বলি না।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে সাগর পকেটে হাত দিতেই চমকে

উঠল, 'রিয়েলি সো সরি।'

আমি জবাব দেবার আগেই রিকসা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। হাতের মুঠোয় লুকানো ছোট্ট পার্স খুলে ভাড়া দিতে গেলেই সাগর বলল, 'এর সামনে আর আমাকে ছোট করে লাভ কি?'

ভাড়া মিটিয়ে আমরা ভিতরে গেলাম। খেলাম। খাবার পর আবার ড্রইংরুমে। সাগর সিগারেট খাওয়া শেষ করে সিগারেট-এন্ড ফেলার জন্য সামনের বারান্দায় যেতেই আমাকে ডাক দিল, 'দেখে যান।'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কি?'

'দেখেছেন রিকসাওয়ালাটা কেমন করে গাছের ছায়ায় ঘুমুচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড।'

'শুধু টায়ার্ড নয় হয়ত খাওয়া-দাওয়াও হয়নি।'

'কি করে জানলেন?'

'এখানে এতদিন সোসিও-ইকনমিক সার্ভে করতে গিয়ে এমন ধারণা...'

নিজে গেলাম না। প্রতাপ সিংকে বললাম, 'যা তো রিকসাওয়ালাটাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

প্রতাপ সিং গেল। ওকে ডেকে আনল।

'কিঁউ বাবুজি! ফিন যানা হ্যায়?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার খানা হো গ্যায়া?'

গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, কতবার করে খানা খাব? সকালে খেয়ে বেরিয়েছি, আবার রাত্রে খাব।'

'বসো।'

ডাল-তরকারী সবই ছিল। প্রতাপ সিংকে কয়েকটা রুটি তৈরী করতে বললাম। রুটি হবার পর ওকে খেতে দিলাম। ও কিছু বলল না, কিন্তু ওর সারা মুখে এমন কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে বেরুল যে আমি নিজে লজ্জিত না হয়ে পারলাম না।

সাগর ড্রইংরুমে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। আমি ভিতরে গিয়ে পাঁচ টাকার নোট নিয়ে এলাম। আমার হাতের মুঠোয় নোট দেখে সাগর বলল, 'ওকে দেবার জন্য আনলেন?'

'হ্যাঁ?'

'না, টাকা দেবেন না।'

'কেন?'

'ওকে ভিক্ষা দিয়ে ছোট করবেন কেন?'

আমি চট করে কোন জবাব দিতে পারলাম না। মাথা নীচু করে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাগর বলল, 'ওর রিকসা চড়ে ভাড়া দেবেন, ভিক্ষা দেবেন না।'

আমি আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রতাপ সিং এসে বলল, 'দিদিমণি, আমি একটু ঘুরে আসব?'

বললাম, 'না। তুই বাড়ীতে থাক। আমরা একটু বেরুব।'

বেরুলাম। শুধু সেদিন নয়, সাগর যে কদিন ছিল, রোজই ওর রিকসায় চড়ে ঘুরলাম। অনেক, অনেক জায়গায় ঘুরলাম। নানা সময়ে ঘুরলাম। গায়ে গা লাগিয়ে বসে ঘুরলাম।

সাগর যেদিন গেল সেদিন আর রিকসা করে স্টেশনে যাওয়া হয় নি। গাড়ি করে আমরা আর পিসিরা ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিলাম।

পরের দিন দুপুরের দিকে ঐ রিকসাওয়ালাটা আবার হাজির হলো। 'বিবিজি, ঘুরতে যাবেন না?'

'না।'

'কিঁউ কিয়া হুয়া?'

'বাবুজি 'বাইরে গিয়েছেন।'

'কব্বে ফিরবেন?'

মনে মনে হাসলাম। কবে ফিরবেন? কোনদিন আর ফিরবেন কিনা তাই বা কে জানে! ফিরলেও আমাকে নিয়ে...

'ঠিক নেই। দুচার মাস পরে ফিরবেন।'

রিকসাওয়ালাটা তখনও দাঁড়িয়ে। আমি আর দাঁড়ালাম না। প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে যেতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল সাগরের আংটিটা ফেরত দেওয়া হলো না। ওর মাগোর দেওয়া আংটি। মাগোর ভাবী পুত্রবধূর আংটি।

সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। এখনই মনে পড়ল কিন্তু সাগর তো এখন অনেক দূরে চলে গেছে। চলে যাচ্ছে। ডেরাডুন এক্সপ্রেস নিশ্চয়ই পাগলের মত ছুটছে।

তিন

বিকেলের দিকে প্রায়ই হাওড়া ব্রিজে জ্যাম হয়। আর একবার জ্যাম হলে রাত্রি সাড়ে নটা-দশটার আগে ভীড় পাতলা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই জ্যামে আটকে পড়লে নির্ঘাত গাড়ী ফেল করব। বহু লোক করে। আগে হলে কেয়ার করতাম না, কিন্তু এখন কোন মতেই ট্রেন ফেল করলে চলবে না। অসম্ভব। প্রথম কথা আগামীকাল ভুবনেশ্বরে ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ হেলথ এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই ঢেংকানল যেতে হবে। পরশু দিনই আমার চার্জ নেবার, কথা। সুতরাং আজকের পুরী এক্সপ্রেস মিস করলে চলবে না।

তাছাড়া এখন আর এক মুহূর্ত আমি এই আমার চির পরিচিত কলকাতায়

থাকতে চাই না। কিছুতেই না। থাকা অসম্ভব। কল্পনাতীত। কলকাতায় এত পরিচিত মানুষ আছে যে আগে তাদের সবাইকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারতাম না। যেতাম না। ছুটিতেও না। একটু এদিক ওদিক বেড়াতে গেলেও কলকাতার পরিচিতদের সঙ্গেই যেতাম। হয় আত্মীয়, না হয় বন্ধু। কিন্তু এখন এই পরিচিতদের জন্যই কলকাতায় থাকতে পারি না। পারছি না। মনে হয় ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, অদ্ভুতভাবে দেখছে, বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখছে। আমার সামনে কিছু না বললেও মনে হচ্ছে আড়ালে আমার দৃষ্টির বাইরে ওরা সবাই শুধু আমাকে নিয়েই আলোচনা, সমালোচনা, নিন্দা করছে। মনে হচ্ছে সবাই যেন শুধু ফিস ফিস করে কথা বলছে। আমার সব কিছু নিয়ে কথা বলছে।

তাইতো অনেক আগে বেরিয়ে পড়েছি। হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে ট্যাক্সি ঘুরতেই স্টেশনের বড় ঘড়িতে দেখলাম ছটা পঁচিশ।

ট্যাক্সি থামতে না থামতেই একটা কুলি দৌড়ে এলো। আমি দরজা খুলে বেরুবার আগেই জিজ্ঞাসা করল, 'কৌন গাড়ি?'

'পুরী এক্সপ্রেস।'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেবার আগেই কুলিটা গাড়ির পেছন থেকে আমার বড় সুটকেস আর বেডিং বের করছে। এবার মাথার পাগড়ী ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, 'কৌন কিলাস? থার্ড কিলাস?'

ও ঠিকই প্রশ্ন করেছে। সেকেন্ড বা ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা এত আগে স্টেশনে আসে না। থার্ড ক্লাস স্লিপারে যাদের নিদ্রার ব্যবস্থা পাকাপাকি থাকে, তারাও আসে না। আসবে কেন? কিন্তু আমার মত যারা কলকাতা ছেড়ে পালাতে চায় তারা কি করবে?

'বাঙ্ক চাইয়ে?'

মারামারি করে একটা বাঙ্ক জবর-দখল করে দিলে হাওড়া স্টেশনের কুলিদের মোটা হাতে পার্বণী মেলে এবং সেই আশাতেই ও জানতে চাইল বাঙ্ক চাই কি না? আমি ছোট উত্তর দিলাম, 'না।'

হাতে প্রায় দু ঘণ্টা সময়। পুরী এক্সপ্রেসে ডাইনিং কার থাকে না, জানতাম। দুপুরেও ভাল করে খাইনি। খেতে ভাল লাগেনি। তাই প্ল্যাটফর্মে না গিয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর হুইলার স্টল থেকে দু তিনটে জার্নাল কেনার পর তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। তখনও প্ল্যাটফর্মে গাড়ী দেয়নি, লোকে লোকারণ্য। সবার সঙ্গেই প্রচুর মালপত্র। অধিকাংশই পুরুষ। উড়িষ্যাবাসী। কয়েকজন মাত্র মহিলাকে দেখলাম। বুঝলাম, এরা সবাই দেশে যাচ্ছে ছুটিতে। ছমাস-আট মাস কি এক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহের ছুটিতে দেশে যাচ্ছে। আপনজনের কাছে যাচ্ছে। তাদের জন্য, তাদের খুশীর জন্য বাক্স পেটরা বোঝাই করে মালপত্র নিয়ে চলেছে। চোখে মুখে উজ্জ্বল প্রত্যাশার ইঙ্গিত।

লর্ড ক্লাইভের আমলের একটা ছোট্ট ইঞ্জিন টানতে টানতে পুরী এক্সপ্রেসকে প্ল্যাটফর্মে হাজির করতেই সমস্ত মানুষগুলো যেন পাগল হয়ে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। দেখলাম প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ওদের উন্মত্ততা। ব্যাকুলতা। শারীরিক ক্লেশ। অবাক হয়ে দেখলাম। আমি সরকারী পয়সায় যাচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ঘরের প্রতি, প্রিয়জনের প্রতি এদের কি দুর্নিবার টান। আকর্ষণ। কই আমাদের তো এমন টান নেই। আকর্ষণ নেই। নর্থ বিহার এক্সপ্রেস বা মিথিলা এক্সপ্রেসের প্যাসেঞ্জারও ঠিক এমনিভাবে পাগলের মত ঘরে ছুটে যায়। কিন্তু দিল্লী মেল, বোম্বে মেল, বা ডেরাডুন এক্সপ্রেসের যাত্রীরা তো এমন ব্যাকুল হয় না প্রিয়জনের জন্য?

আমি জানি আমার জন্য কেউ এমনভাবে ছুটে আসবে না, আসতে পারে না, কিন্তু যদি কেউ আসত?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

'চলিয়ে বিবিজি।'

'চলিয়ে।'

শেষ মুহূর্তে রিজার্ভেশন করিয়েছি। লেডিজ কম্পার্টমেন্টে জায়গা পাইনি। বোধ হয় ভালই হয়েছে। যা দিনকাল কখন কি হয় বলা যায় না। রিজার্ভেশন চার্ট দেখলাম। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস কৃষ্ণস্বামী ও মিঃ সরকার ছাড়া আমি থাকব ঐ কম্পার্টমেন্টে। ভালই। অন্তত আর একজন মহিলা যাত্রী থাকবেন। তিনজন পুরুষের সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে থাকতে হলে নিশ্চয়ই একটু অস্বস্তিবোধ করতাম। রিজার্ভেশন অফিসের কর্মচারীদের মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

ভাগ্যক্রমে আমি একটি লোয়ার বার্থ পেয়েছিলাম। আমার মাথার উপরের বার্থটি সরকার মশাইয়ের। ভদ্রলোকের বয়স বেশী নয়। বড়জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। দেখে মনে হলো বেশ সৌখীন। আমি জানালার ধারে চুপ করে বসেছিলাম। উনি আমারই বার্থের আরেক কোণায় বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। কৃষ্ণস্বামী দম্পতি একটু অন্যমনস্ক হলেই ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রিজার্ভেশন চার্টে আমার নাম দেখেছেন। ওখানে শুধু লেখা আছে ডাঃ চিত্রলেখা রায়। আমি সর্বত্রই এইরকমভাবে নাম লিখি। মিস না মিসেস জানাই না। জানাবার দরকার নেই। আমার নাম দেখে বহু লোকের আগ্রহ হয়। অধিকাংশই ভাবেন আমি অবিবাহিতা কুমারী। ভগবান আমাকে রূপসী করেননি ঠিকই। কুৎসিতও নই। তবে দেহটা দিয়েছেন। বেশ সুন্দর দেহ। আমি বেশ বুঝতে পারি এই দেহটার চুম্বকশক্তি। পুরুষদের চোখ টেনে ধরে। হয়ত ওদের বুকের মধ্যে তুফান ওঠে। হয়ত বা আরো কিছু।

ক্লাশ নাইন-টেন-এ উঠেই আমি বুঝতে পারি আমার শরীরের বাঁধন অন্যদের

থেকে স্বতন্ত্র। উন্নত। তবে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পরই আমি আমার দেহ সম্পর্কে সচেতন হই। যত্ন নিই। ভালবাসি।

এখন মনে হয় এই দেহটার জন্যই আমার এত দুর্ভোগ। তাই এই পোড়া দেহটার ওপর ভীষণ রাগ। আজকাল একটুও যত্ন করি না। করার প্রয়োজন বোধ করি না, কিন্তু তবুও আমার দেহটা এখনও বহু পুরুষের দৃষ্টিকে লোভাতুর করে, সতৃষ্ণ করে। আমি জানি।

আমি বেশ বুঝতে পারছি জানালা দিয়ে রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি মৌড়ীগ্রাম স্টেশন দেখার অছিলায় উনি আমাকে দেখছেন। আমার দেহটাকে দেখছেন। না দেখার কোন কারণ নেই। এটা ওদের সহজাত ধর্ম। অভিজ্ঞরা বলেন বয়সের ধর্ম। আমার মধ্যে উচ্ছ্বাস কম। ভাষায় অনেকে বলে, বলত, আমি নাকি স্নিগ্ধ। আমি ঠিক জানি না। জানার দরকার নেই। শুধু জানি আমার মধ্যে চঞ্চলতা কম। এখন আরো কম। ভবিষ্যতে হয়তো উচ্ছ্বাস, সব চঞ্চলতা হারিয়ে ফেলব। এর মধ্যে কত কি হারিয়েছি, ভবিষ্যতে না জানি আরো কত কিছু হারাব।

মিঃ কৃষ্ণস্বামী নিচের বার্থে স্ত্রীর বিছানা করে দিলেন। উপরের বার্থে নিজের বিছানাও করে নিলেন। মিঃ সরকার এখনও আমার বার্থের এক কোণায় বসে আছেন। উপরের বার্থে বিছানা করার কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। এখনও প্যান্ট-বুশ সার্ট পরে আছেন। বেশী রাত হয়নি ঠিকই, তবে আমার বার্থের কোণায় জেমস বন্ড হাতে নিয়ে বসে থাকার চাইতে শুয়ে পড়া যায়, বিশ্রাম করা যায়। কিন্তু সে রকম কোন পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না।

না থাক।

আমার কি? তাড়াতাড়ি বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়তে আমি চাই না। শুয়ে কি করব? ঘুম আসবে নাকি? ক্লান্ত হলেও আজকাল ঘুম আসে না। শুলেই যত সব আলতু ফালতু চিন্তা দুশ্চিন্তা মাথায় ভীড় করে। জীবনের হিসাব নিকাশ করতে শুরু করি। আর ভাল লাগে না। কি হবে এত সব ভেবে?

কিচ্ছু না।

কোনদিন কি ভেবেছিলাম আমাকে কলকাতা ছাড়তে হবে? ওড়িশার ঢেংকানলে যাব চাকরি করতে? ভেবেছিলাম কি আমার জীবনটা এমন শূন্যতায় ভরে যাবে? এত আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন থাকতে আমাকে এমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে হবে, তাও কোনদিন ভাবি নি। ভাবি নি অনেক কিছু। আমার জীবনে এখন সব কিছুই অভাবনীয় ঘটার পালা। শুনেছি প্লেনের সব ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেলে পাইলট পাখার সাহায্যে উড়ে যায় অনেক দূর। মানে বেশ কিছুদূর। তারপর ক্র্যাশ ল্যান্ড করে অথবা গ্লাইডারের মত আস্তে আস্তে মাটির বুকে নেমে আসে। আমার ইঞ্জিনগুলোও সব বন্ধ হয়ে গেছে। হাল ভেঙে গেছে, পাল ছিঁড়ে গেছে। শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলেছি। যতদূর যতটুকু যাওয়া যায়, তাতেই আমি খুশি। বেশিদূর

এগিয়ে যাবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন আমার নেই। ফুরিয়ে গেছে।

পাশ থেকে 'ফেমিনা'টা তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করলাম। অনেক দিন পরে ফেমিনা দেখছি। আগে রেগুলার দেখতাম। পড়তাম। ফেমিনাটা হাতে নিতেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ল...

আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। লোকজন গাড়িঘোড়া দেখছিলাম হঠাৎ সুনীল পিছন দিক থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বিশ্রীভাবে জড়িয়ে ধরল ওর জড়িয়ে ধরার রকমই ঐ রকম ছিল।

'আঃ ! কি করছ ?'

আর কি করছ। ও টানতে টানতে আমাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে একটু পাগলামি করল।

'তোমার পাগলামি করার কি কোন সময়-অসময় নেই ?'

'পাঁজি-পুথি দেখে কি তোমার কাছে আসব ?'

'হ্যাঁ। তাই আসবে।'

একটু পরে আমি ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বললাম, 'কালবৈশাখীর মত তোমার পাগলামির কোন ঠিক ঠিকানা নেই।'

ও সেকথার জবাব না দিয়ে আমার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে একটা ফেমিনা খুলে ধরল।

'দেখো তো কি সুন্দর সেজেছে।'

বিনুনিটা পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'কেন ? আমাকে বুঝি আর ভাল লাগছে না ?'

'লেখা।'

'উঃ।'

'তোমাকে ভাল লাগে বলেই তো আরো ভাল করে দেখতে চাই, পেতে চাই...'

আমার হাসি পেল, 'আর কত ভাল পেলে তুমি খুশী হও বলতো !'

সুনীল ডাক্তার হলেও মনটা কাব্যিক ছিল। 'জান লেখা এত সুন্দর বৈচিত্র্য ভরা প্রকৃতিও রূপ বদলায়। নিয়মিত বদলায়। পাহাড়-পর্বত নদী-নালা গাছপালা আকাশ-বাতাস সব কিছুই রঙ বদলায়। তুমিও যদি...'

সেই থেকে আমার ফেমিনা পড়া শুরু। ফেমিনা খুলে নতুন নতুন ফ্যাশান দেখতাম, শিখতাম, পড়তাম।

'নীল, এই সময় বিকেলের দিকে লাইট কালারের বাটিক প্রিন্টের শাড়ী-ব্লাউজ পরব না ?'

সুনীল সঙ্গে সঙ্গে বলত, 'নিশ্চয়ই। সারা আকাশে রঙের পাগলামি চলবে আর তোমার মধ্যে তার প্রতিবিম্ব দেখব না ?'

পরের দিনই এক জোড়া বাটিক প্রিন্টের শাড়ি-ব্লাউজ এলো।

সেসব দিন, রঙের পাগলামী, কোথায় হারিয়ে গেল। আর কোনদিন কেউ আমাকে লেখা বলে ডাকবে না, আমিও আর নীল বলে ডাকব না।

দেউলটি কোলাঘাট মেচেদা ছাড়িয়ে পুরী এক্সপ্রেস এগিয়ে চলেছে। পাঁশকুড়াও পার হলাম।

ফেমিনাটা হাতে নিয়েই বসে রইলাম। পড়তে, ছবি দেখতে মন চাইল না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ মাঝে মাঝে, মুহূর্তের জন্য কোথাও সামান্য একটু আলো দেখছি। এর আগে একবার সুনীলের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন অন্ধকার কুপে-তেও নতুন দিনের সূর্যের আলো দেখেছিলাম। কোথাও একটু অন্ধকার দেখিনি। আজ শুধু অন্ধকার দেখছি।

ঠিকই দেখছি বাকি জীবনটাই শুধু অন্ধকার দেখব। বড় দীর্ঘ পথ। জানি না কিভাবে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেব। কদিনই বা আলো দেখলাম?

মাঝে মাঝে বড় ভয় হয়। ভীষণ ভয় হয়। দুঃখ হয়। আক্ষেপ হয়। পারব কি দীর্ঘ অন্ধকার পথ পাড়ি দিতে? নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল হয়ে পারব কি জীবনটা কাটাতে? কোন মানুষই সব কিছু পায় না, কিন্তু কিছু তো পায়। সেই কিছুকে নিয়েই অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকে। লড়াই করে, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। যে বাবা-মাকে পায় না, সে ভাইবোনকে পায়; যে স্বামী হারায়, সে সন্তান পায়। আমি, আমি কি পেলাম? কাকে নিয়ে বাঁচব? কাটাব? কোন জবাব পাই না। কলকাতার রাস্তাঘাটে কত হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ভিখারীকে দেখি। কি তীব্র সংগ্রাম করে, জল ঝড় মাথায় করে, কলকাতার জীবনের শত শত অঘটনকে সহ্য করে ওরা বেঁচে থাকে। কিন্তু কজন ভিখারী একলা একলা সংগ্রাম করে? হয় বাবা-মা না হয় স্বামী বা সন্তানরা ওদের পাশে থাকে। অদৃষ্টের ভাগীদার হয়। আমি? আমি কাকে পাশে পাব? কে আমার অদৃষ্টের অংশীদার হবে?

খড়্গপুর এলাম। গাড়ি থামল। কফি চাই, কফি চাই করে ভেন্ডাররা চীৎকার করছে। খড়্গপুর এলেই বোঝা যায় দক্ষিণের পথে চলেছি। বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ তো দূরের কথা, মোগলসরাই-এলাহাবাদ-কানপুরেও কফি পাওয়া যায় না।

এক ভাঁড় কফি খেতে খেতে দেখলাম কৃষ্ণস্বামী দম্পতি শুয়ে পড়েছেন। সরকার মশাইকে পাশে দেখতে পেলাম না। হয়তো চা-কফি খেতে গিয়েছেন, অথবা বাথরুমে। দুটো আলো অফ করে দিলাম। আমার চোখে ঘুম নেই বলে ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাব কেন? আমার খাওয়া শেষ হতেই ট্রেন ছাড়ল। সরকার মশাইও এক ভাঁড় কফি নিয়ে কম্পার্টমেন্টে এলেন।

মিঃ কৃষ্ণস্বামী বাঙ্ক থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিস ওয়াজ খড়্গপুর?'

প্রশ্নটা কাকে করলেন বুঝতে পারলাম না। তবুও আমি বললাম, 'ইয়েস ইট

ওয়াজ।

কৃষ্ণস্বামী সাহেব আবার শুয়ে পড়লেন। মিঃ সরকারও বার্থে বিছানা বিছিয়ে জামা কাপড় নিয়ে বাথরুমে গেলেন। একটু পরেই স্লিপিং স্যুট পরে ফিরে এসে শুতে গেলেন। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব? ঘুম না পেলেও শুতে হয়। শুতে হবে। তা নয়ত লোকে কি ভাববে?

শুয়ে পড়লাম। কিন্তু জেগে রইলাম। চুপ করে শুয়ে রইলাম। সারাটা দিন তবু কেটে যায়। কোনমতে কেটে যায়। সন্ধ্যাবেলাও পার হয়। রাত্রিটা পার হতে বড় কষ্ট বড় দুঃখ লাগে। প্রতি রাত্রে বুঝতে পারি আমি কত অসহায়। কত দুঃখী, কত হতভাগী। পুরো তিন বছরও সুনীলকে পাইনি, কিন্তু যতদিন পেয়েছি পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি। প্রাণভরে পেয়েছি। দেহ-মনের প্রতিটি সত্ত্বা দিয়ে পেয়েছি। এমন করে বোধহয় আর কোন মেয়ে পায় না, পায় নি। সরস্বতী বা কার্তিক পুজোর পর, বিসর্জনের অন্তে, মন খারাপ হয় না, কিন্তু দুর্গাপুজোর পর? মণ্ডপের দিকে, ফাঁকা প্যাণ্ডেলের দিকে তাকান যায় না। বড় কষ্ট হয়, বড় বেশী শূন্য মনে হয়। পাঁচদিন ধরে মাটির মূর্তি পুজো করে তার বিসর্জন হলেই যদি মন এত খারাপ হয়, তাহলে রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া প্রাণের পুরুষকে নিয়ে এতদিন ঘর করার পর হারালে...

এই ছোট্ট কম্পার্টমেন্টে চারটে ফ্যান বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তবু যেন গরমে আমার শরীরটা অস্বস্তি করে উঠল। মাথার দিকের কাঁচের জানালাটা তুলে দিলাম। দুটো বালিশকে কাত করে জানালার কাছে মাথা রেখে শুলাম।

সুনীলকে বিয়ে করার জন্য কি কাণ্ডটাই হলো! বাবারে বাবা! দাদা-দিদি, বাবা মা সবাই যেন পাগল হয়ে উঠল। সবাই যেন এমন একটা ভাব দেখালেন যেন পৃথিবীতে এত বড় সাংঘাতিক অন্যায় আর কেউ করে নি। ওদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হতে পারে না। ওরা নীচু জাতের কিন্তু...

থাকগে। ওসব কথা ভাবতে আর ভাল লাগে না। কি হবে পোস্টমর্টেম একজামিনেশন করে।

আমার শুধু একটা দুঃখ। ও কেন আগে থেকে আমাকে সব কিছু বলে নি? আমি যদি জানতাম আই-এস-সি পড়ার সময়ই ওর জীবনের সঙ্গে আর একটা মেয়ের জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল, ওর একটা সুন্দর ফুটফুটে সন্তান আছে, তাহলে ভালবাসলেও আমি এমন করে ওকে জড়িয়ে ধরতাম না। কিছুতেই না। ওকে আমি ভালবাসতে পারি, কিন্তু ওর পরিবারে বিপর্যয় আনার, ওর সংসার ভেঙে চুরে দেবার কোন অধিকার আমার নেই। তাইতো আমি সরে এসেছি। সবার কাছ থেকে। সব কিছু ছেড়ে এসেছি। দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করি, কিন্তু তবুও সবাইকে মুক্তি দিয়ে আমি সরে এসেছি। যে পথ, যে জীবন আমি পিছনে ফেলে এসেছি আমি আর কোনদিন সেদিকে ফিরে যাব না।

দাদা-দিদি সুনীলকে যত খারাপই ভাবুক না, আমি ওকে খারাপ ভাবতে পারি না। পারব না! সে ভুল করেছে, অন্যায় করে নি। আমার চাইতে বেশী ভাল করে তো কেউ ওকে চেনে না, জানে না। আমি স্থির জানি, বিশ্বাস করি আজ সব কিছু হারাবার পরও বিশ্বাস করি ও আমাকে ভালবাসত, সত্যি ভালবাসত। মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। স্বামীর অধিকার নিয়ে ও আমার দেহটা উপভোগ করেছে ঠিকই, প্রায় প্রতি রাত্রে, কখনও দিনে-রাত্রে, তবুও আমি জানি আমার দেহটার জন্যই ও আমার কাছে আসে নি, আত্মসমর্পণ করে নি।

ভুল ?

অন্যায় ?

সবাই বলে আমরা দুজনেই ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। জানি না ওরা ঠিক বলে কি না। পৃথিবীতে কে ভুল করে না? কে অন্যায় করে না? আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, সীজর ভুল করেন নি? সম্রাট অশোক থেকে গান্ধী-জহরলাল পর্যন্ত নেতারা ভুল করেন নি? অন্যায় করেন নি? আমার বাবা-মা, তাদের বাবা-মা ভুল করেন নি? অন্যায় করেন নি? বড় বড় রাজা মহারাজা, নেতাদের ভুলের জন্য পৃথিবীর কত অসংখ্য নিরপরাধ নারী-পুরুষকে জীবনাহুতি দিতে হয়েছে, প্রিয়জনকে হারাতে হয়েছে, দেশত্যাগ করতে হয়েছে। করতে হয়েছে আরো কত কি। ইতিহাসের পাতায় এদের চোখের জলের কাহিনী লেখা হয় না, লেখা হতে পারে না। ঐতিহাসিকদের ক্ষমতা নেই, সাহস নেই। ইতিহাসের পাতায় পাতায় শুধু নেতাদের রাজাদের কীর্তিকাহিনী লেখা।

আমি ভুল করলেও, অন্যায় করলেও কাউকে ঘরছাড়া করিনি, কারুর প্রিয়জনকে বিসর্জন দিই নি। নতুন সংসার গড়তে পারি না, কিন্তু কারুর সুখের সংসার ভেঙে ছারখার করে দিই নি। তবে আমাকে, সুনীলকে এরা এত নিন্দা করে কেন! ঘৃণা করে কেন? যারা ভুলের প্রাসাদের উপর বসে আছে, যারা শত সহস্র ভুলের জন্য কোনদিন কোন মাশুল দিল না, আমাদের নিন্দা করার, ঘৃণা করার কি অধিকার আছে তাদের?

জানি না।

জানতে চাই না। কি হবে জেনে? শুধু এইটুকু জানি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলির সব চাইতে মধুর স্মৃতি সুনীলকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। ও আমাকে যে সম্মান, যে আনন্দ, যে পূর্ণতা দিয়েছে...

না না, পূর্ণতা কোথায় পেলাম? ও আমাকে কেন মা হতে দিল না? কেন আমাকে সন্তান দিল না? আজ যদি আমার একটা সন্তান থাকত, ছেলে বা মেয়ে থাকত, এত শূন্যতাবোধ করতাম না। বেঁচে থাকার অর্থ থাকত। যুক্তি থাকতো।

এইসব কথা রাত্রেই মনে পড়ে। একলা একলা বড় কষ্ট হয়। অসুবিধা হয়। অতৃপ্তি লাগে। রাত্রে বিছানায় এলেই মনে হয় ও কেমন করে আমাকে জড়িয়ে

বুকের মধ্যে নিয়ে শুতো। আদর করত। ভালবাসত। স্বপ্নময় করে তুলতো। ও যদি জানত ওকে চলে যেতে হবে, সংসারের জন্য, কর্তব্যের জন্য, ওকে ফিরে যেতে হবে ওদের রাঁচীর বাড়িতে। ও কেন আমাকে একটা সন্তান দিল না? এই রাত্রির অন্ধকারে বুকের মধ্যে একটা সন্তানকে নিয়ে শুতে পারলে অনেক দুঃখ ভুলতে পারতাম।

একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

ট্রেনটাও থামল। ভদ্রক। জানালা দিয়ে দেখলাম অনেক প্যাসেঞ্জার অনেক মালপত্র নিয়ে নামল। রাত দুটো বেজেছে। তারপর টিপটিপ করে বৃষ্টিও হচ্ছে। আমি বা আমরা এই এত রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি যেতে হলে বিরক্ত হতাম। বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়ত ঝগড়াই শুরু করতাম নিজেদের মধ্যে। অথবা গ্রামীণ ভারতবর্ষের অনগ্রসরতা, সরকারী অকর্মণ্যতার উপর একটা ছোটখাট বক্তৃতা করতাম। যারা নামল, দেশের মাটিতে তারা নামল, তারা খুশী মনেই নামল। মাথার উপর মালপত্র তুলে নিল।

শুনেছি যারা দীর্ঘদিন বিদেশে যুদ্ধ করে ঘরে ফেরে, নিজের দেশ নিজের আপনজনের বিচ্ছেদ বেদনা বহুকাল সহ্য করে তারা জাহাজে চড়ে নিজের দেশের মাটি স্পর্শ করলেই সেই পবিত্র জন্মভূমিকে চুম্বন করে। অনেকক্ষণ; অনেকবার।

ভদ্রক স্টেশনের এইসব প্যাসেঞ্জারদের দেখে কেন এই কথা মনে হলো?

মানুষের মন কখনও শূন্য থাকে না। আমার জীবন শূন্যতায় ভরে গেলেও মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত চিন্তার ঝড় উঠছে। এক চিন্তার ঝড় আরেক চিন্তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এক ভাবনা বিদায় নিয়ে নতুন ভাবনার উদয় হচ্ছে।

দুঃখের দিনে, বিপদের দিনের জন্যই আত্মীয়-বন্ধুর প্রয়োজন। বাংলা দেশে, বোধহয় সারা ভারতবর্ষে, দুর্যোগের দিনেই আত্মীয়বন্ধুকে পাওয়া যায় না। সমাজ এগিয়ে আসে না। দুর্দিনে আমাদের আত্মীয় বন্ধুরা বৈরী হয়, সমাজ উদাসীন হয়। আশ্চর্য। আমি যখন চোখের জলে বন্যা বইয়ে দিচ্ছি, অন্ধকারের মধ্যে ডুবছি, ভবিষ্যৎ বলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সময়েই আমার সব আত্মীয়-বন্ধুরা আমাকে অস্পৃশ্য মনে করে দূরে সরিয়ে রাখলেন। সবাই। আপামর নির্বিশেষে। শুধু এগিয়ে এলো আমাদের মেডিকেল কলেজের সার্জিক্যাল নার্স মেরিনা।

'চিত্রলেখা চিন্তা করো না। ইউ কাম অ্যান্ড স্টে উইথ মী।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মেরিনা। এই কটা দিন ফ্ল্যাটেই কাটিয়ে দেব।'

'না। না। দ্যাট ওন্ট বী। তোমার এখন একলা থাকা ঠিক নয়।'

আমি হাসলাম। 'তুমি কি ভাবছ আমি সুইসাইড করব?'

'ডোন্ট বী সিলি, চিত্রলেখা। আই সে তুমি এখন একলা থাকবে না।'

আমার কলকাতা বাসের শেষ কটা দিন আমি মেরিনার ওয়েলেসলীর ফ্ল্যাটেই

কাটিয়েছি। ফিরপোতে আমাকে ফেয়ারওয়েল ডিনার পর্যন্ত খাওয়ালো। অনেকবার বারণ করেছিলাম। শোনেনি। কিছুতেই আমার কথা শুনল না। শুধু মেরিনা ছাড়া কেউ জানে না আমি ঢেংকানলে যাচ্ছি। ওর ডিউটি থাকার জন্য স্টেশনে আসতে পারেনি। আমার দুটি হাত ধরে বার বার দুঃখ প্রকাশ করেছে আর বলেছে, 'সো লঙ আমি কলকাতায় আছি, তুমি যখন ইচ্ছা এসো। ছুটি পেলেই চলে আসবে। আসবে তো?'

'ছুটি নিয়ে কি করব?'

'কেন আমাকে দেখতে আসবে না?'

না বলতে পারিনি। কথা দিয়েছি আসব। হ্যাঁ মেরিনা, তোমাকে নিশ্চয়ই দেখতে আসব।

জানি না কবে আবার ডাউন পুরী এক্সপ্রেসে চড়ে কলকাতা যাব। তবে যাব। যেতে আমাকে হবেই। মেরিনার জন্যই আমাকে যেতে হবে। অন্ততঃ ওকে আমি ঠকাতে পারব না।

মেরিনার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি, জানতে পারিনি। হঠাৎ চোখে আলো লাগায় ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি কৃষ্ণস্বামী দম্পতি নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখলাম ওরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। এভারেডী ব্যাটারীর বিজ্ঞাপনবোর্ডে দেখলাম কটক এসেছি। দৃষ্টিটা কম্পার্টমেন্টের ভিতরে ঘুরিয়ে আনতেই দেখলাম মিসেস কৃষ্ণস্বামীর বার্থের এক কোণায় মিঃ সরকার বসে বসে সিগারেট টানছেন। আর তাঁর চোরা দৃষ্টিটা ঘুরে ফিরে আমার মধ্যে কি যেন খুঁজছে।

গাড়িটা তখনও কটক স্টেশনে দাঁড়িয়ে। সওয়া পাঁচটা বাজে।

তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে গভীর রাত থেকে।

হঠাৎ দৃষ্টিটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনতেই...

ছি ছি। ব্লাউজের দুটি বোতাম খুলে গেছে। ঘুমুবার সময় খুলে গেছে। টিপ-বোতামের এই ঝঞ্ঝাট। একটু টান লাগলেই খুলে যায়। জানি না ভদ্রলোক কতক্ষণ ধরে ওই দৃশ্য উপভোগ করেছেন! জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে কোনমতে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

ট্রেনটা লেট থাকায় ভালই হলো। তা নয়ত বড় বেশী ভোরেই পৌঁছতাম। হয়ত তখনও অন্ধকার থাকত।

আমার ভুবনেশ্বর বাসের মেয়াদ বড় জোর এক রাত্রি! হোটেল খোঁজাখুঁজি না করে রিটায়ারিং রুমের চেষ্টা করলাম। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম। উপরতলার ঘর! বিরাট বিরাট দুটো জানলা, করিডরের দিকের দরজা বন্ধ করলেও যথেষ্ট আলোবাতাস। অ্যাটাচড বাথ। ফার্নিচার-বিছানা-পত্রও বেশ পরিষ্কার।

ভালই। হোটেল হোটেল গন্ধ নেই। হাসপাতালে একটা গন্ধ থাকে! সেই রকম

হোটেলেরও একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে। বিচিত্র গন্ধ। আমার ভাল লাগে না। কেমন বমি বমি লাগে। এই ঘরটায় সেরকম গন্ধ নেই। স্টেশনের উপরতলার ঘর হলেও হৈ-হুল্লোড় চেঁচামেচি নেই। মানে খুব কম। হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশনের তুলনায় ভুবনেশ্বর স্টেশনের রিটায়ারিং রুমকে প্রায় স্যানাটোরিয়াম মনে হয়। তাছাড়া স্টেশন বিল্ডিংটা নতুন। এবং যথেষ্ট আধুনিক। 'হাওড়া-শিয়ালদা' বা দমদম জংশনের বনেদীপনা আভিজাত্য না থাকলেও এখানে থাকতে অনেক আরাম।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করলাম। কাঁচের দরজা, কাঠের দরজা। দুটোই। এবার প্ল্যাটফর্মের দিকের দুটো জানালাই খুলে দিলাম। জানলা খুলতেই দমকা হাওয়া এসে চুলগুলো উড়ে চোখে-মুখে পড়ল। প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিলাম। মনে হলো এতদিন যেন আমি জেলখানায় ছিলাম। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস পাইনি। এখানে এসে যেন আমি প্রথম মুক্তির স্বাদ পেলাম। বাঁচলাম। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে পুরনো ভুবনেশ্বর টাউনের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনতেই দূরে লিঙ্গরাজ মন্দিরের চুড়ো দেখলাম। দৃষ্টিশক্তির নতুন অনুভূতি! অনেকদিন পরে মনের মধ্যে এক ঝলক খুশির আলো দেখতে পেলাম।

এখনও সাতটা বাজেনি। তাড়াহুড়ো করার কোন কারণ নেই। দশটা-পাঁচটার মধ্যে যে-কোন এক সময় সেক্রেটারিয়েটে গেলেই চলবে। বিকেলের দিকে, সন্ধ্যার দিকে ঢেংকানল যাবার ইচ্ছা নেই। দরকারও নেই।

কাল সকালে যাব। বেশী দূরে তো নয়! দু আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য শুয়ে পড়লাম। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

বেশ লাগল। এখন আর টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে না। তবুও হাওয়ায় বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ। মনে হলো অনেকদিন পর একটু শান্তিতে নিশ্চিন্তে শুয়েছি। গত কয়েকটা মাস কি নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। মুহূর্তের জন্য নিশ্চিন্তে শুতে পারিনি, বসতে পারিনি। কোন না কোন শ্যেন চক্ষু, বিরূপ মন্তব্য আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে। ভুবনেশ্বর স্টেশনের এই রিটায়ারিং রুমে শুয়ে প্রথম অনুভব করলাম আমার চারপাশে ছদ্মবেশী শত্রুরা ভিড় করে নেই।

আঃ! কি শান্তি!

একলা একলা জীবন কাটাতে কার ইচ্ছ করে? কার ভাল লাগে? শুধু মানুষ কেন, অধিকাংশ জীব-জন্তুও একলা থাকতে চায় না। থাকে না। কিন্তু নিরুপায় হলে কি করা যাবে? যে সর্বজন পরিত্যক্ত, সে কি করবে? আমি কোনদিনই কঠোর নই, কঠিন নই। কাউকে একটা বড় কথা বলতে পারিনি। পারি না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, কাউকে না। নিজে মুখ বুজে কত অন্যায়, কত অত্যাচার সহ্য করেছি কিন্তু তার বিনিময়ে আমাকে দুঃখ দিতে কষ্ট দিতে কেউ কার্পণ্য করল না। ব্যতিক্রম রইল শুধু মেরিনা!

অথচ এই মেরিনাকে নিয়ে কত আলোচনা কত সমালোচনা শুনেছি। যারাই

ওকে সব চাইতে নিকট থেকে, সব চাইতে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে, পেয়েছে, তারাই ওর সমালোচনা করেছে। মাতৃহারা মেরিনা একটু বড় হতেই ওর বাবা নতুন জীবনসঙ্গিনীকে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিলেন। ঐ কাঁচা বয়সে রঙিন মন নিয়ে রুক্ষ জীবনের মুখোমুখি হতে হলো ওকে। কত কি ঘটলো! কত অঘটন। তবুও থামেনি। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। নার্স হয়েছে। ভাল নার্স। সার্জিক্যাল নার্স। ডাঃ সান্যাল বা ডাঃ চৌধুরীর মত সার্জেনরাও বলেন, মেরিনা, ইউ আর ইউনিক।

সারা হসপিটালে ওর মত নার্স নেই বললেই চলে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। কোন কোনদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ও যে কিভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে এতক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে তা আমি ভেবে পাই না।

'মেরিনা তুমি টায়ার্ড ফিল করো না ?'

ও হাসতে-হাসতে জবাব দেয়, 'সন্ধ্যার পর রাত্রিতে যে পেট্রল জোগাড় করি তাই দিয়ে সারাদিন গাড়ী চলে যায়।'

ঠিকই। দিনের বেলা মেডিক্যাল কলেজের মেরিনা আর সন্ধ্যার মেরিনা এক নয়। ভিন্ন। সম্পূর্ণ আলাদা। ডিউটি থেকে ফিরে স্নান করে। শাওয়ারের তলায় অনেকক্ষণ ধরে। একটা ভাল বাথরুমের প্রতি ওর খুব লোভ।

'জান চিত্রলেখা, একটা ভাল বাথরুমের বড় সখ।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। একটা চমৎকার বাথটাব থাকবে। হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার দিয়ে বাথটাব ভরে থাকবে। তারপর বেদিং সল্ট দিয়ে জলটাকে নাড়িয়ে ফেনায় ভরিয়ে দেব। একটু ওডিকোলন...

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? আমি আস্তে আস্তে নিজেকে ডুবিয়ে দেব বাথটাবের ফেনার মধ্যে। আর...'

ও হঠাৎ থেমে যায়!

'আর কি ?'

ও হাসে। 'এ রিয়েল গুড লাভার স্পঞ্জ দিয়ে আমার সারা দেহ ঘসে দেবে...'

এখানে ওর বাথটাব নেই। তবুও আমি জানি মাঝে মাঝে কোন কোন বয় ফ্রেন্ড স্পঞ্জ দিয়ে ওর সারা দেহে সাবান মাখিয়ে দেয়।

স্নান করার পর সাজগোজ করে। সারাদিন নার্সের ইউনিফর্ম পরে কাটায়। সন্ধ্যার পর, রাত্রিতে ও ভাল ভাল ড্রেস পরে। মেকআপ নেয়। বেড়াতে যায়। বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে যায়, রেস্তোরাঁয় যায়। ফিরে এসে একটু ড্রিংক করে। একটু গল্প, একটু নাচ, একটু হাসি, একটু ঠাট্টা। একটু আদর, একটু ভালবাসা। রাত্রি যত গভীর হয়, ঘরের আলোও তত কমতে থাকে। সুইচ্‌গুলো যেন নিজে থেকেই অফ হয়ে যায়। নাকি বাল্‌বগুলো একটা একটা করে ফিউজ হয়ে যায় ?

তারপর ?

সন্ধ্যাবেলায় যত্ন করে যেসব সাজগোজ করেছিল, সেগুলোকে অবান্তর অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। একটা একটা করে খুলে দেয়। খুলে ফেলে। খুলে যায়...

'ইউ নো চিত্রলেখা, হ্যাংলা পুরুষগুলোকে ভিক্ষা দিয়ে বেশ মজা লাগে। ভাল লাগে। একটা সেলফ স্যাটিশফ্যাকশন পাই।'

মেরিনা লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করে না। পছন্দ করে না। সব বলে। অনেককেই বলে। আমাকেও।

'জান চিত্রলেখা, তোমাদের বাঙালী মেডিক্যাল স্টুডেন্টরা আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে পারে, রাত কাটাতে পারে কিন্তু চৌরঙ্গীতে ঘুরতে পারে না, রেস্তোরাঁয় যেতে পারে না। লজ্জা করে, ভয় পায়।'

মেরিনা হাসে কিন্তু আমি হাসতে পারি না। চুপ করে থাকি।

মেরিনা একটু পরে বলে, 'নিঃসঙ্গ জীবনে দুঃখ থাকলেও স্বস্তি অনেক বেশি।'

ঠিকই বলেছে। এই রিটায়ারিং রুমে কয়েক মিনিট শুয়েই বেশ বুঝতে পারছি। আর কিছু না হোক মনে মনে অনেক স্বস্তি পাচ্ছি। বুকে জ্বালাটা অনেক কম মনে হচ্ছে।

খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে একটু রোদ্দুর আসছে। ঘরটা আস্তে আস্তে একটু গরম হয়েছে। উঠে গিয়ে নেটের জানলা বন্ধ করলাম। স্লো করে পাখাটাও চালিয়ে দিলাম।

হঠাৎ খেয়াল হলো নাইলনের শাড়ি পরে আছি। প্রিন্টেড নাইলনের শাড়ি। ট্রেন জার্নির পক্ষে বেশ ভাল। তবে একটুও হাওয়া যাতায়াত করতে পারে না। শীতের দিনে পরলে ভালই লাগে। কাল রাত্রে অসুবিধা হয়নি। এখন অস্বস্তি লাগছে। বিরক্ত লাগছে।

উঠে পড়লাম। দরজাগুলো দেখে নিলাম। হ্যাঁ, বন্ধই আছে। তবুও ভাল করে পর্দাগুলো টেনে দিলাম। না, আর কোন ভয় নেই। শাড়িটা খুলে শুধু-সায়া-ব্লাউজ পরে শুয়ে পড়লাম। আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। খোঁপাটা খুলে দিলাম। ব্রেসিয়ারের হুকটাও খুলে দিলাম। বাইরে বেরুবার সময় পরতেই হয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে শোওয়া-বসার সময় পরে থাকলে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ভাল লাগে না। ঠিক ফ্রি মনে হয় না।

আবার শুয়ে পড়লাম।

আঃ ! কি আরাম ! মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ি। না, এখন আর ঘুমাব না। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। তবুও এখন ঘুমাব না। সেক্রেটারিয়েট থেকে ঘুরে এসে বরং একটু ঘুমাব। এখন একটু শুয়ে থাকি। কাত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকি।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। চোখের ওপর রোদ্দুর এসে পড়ায় ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে দশটা বাজে।

এবার মনে হলো একটু ক্ষিদেও পেয়েছে। আর দেরী করলাম না। স্নান করতে উঠে পড়লাম।

চুলের জট ছাড়াতে গিয়ে দেখলাম মাথায় ভীষণ ময়লা জমেছে। কাল রাত্তিরে জানলা খুলে শুয়েছিলাম। ধুলো, বালি, কয়লা এসে মাথায় জমেছে। জট ছাড়িয়ে নিলাম। ঠিক করলাম শ্যাম্পু করব। সুটকেশ থেকে একটা ভাল তাঁতের শাড়ি, সাদা চিকনের ব্লাউজ, সায়া বের করলাম। তোয়ালে বের করলাম। এবার বাথরুমটা দেখে নিলাম। ভালই। শাওয়ারও আছে। বেশ পরিষ্কারও। বেশ শুকনো। মনে হলো কয়েকদিন ব্যবহার হয়নি। জানলাটানলা দেখে নিলাম। না, ভয়ের কিছু নেই। এই ঘরের মধ্যে দিয়ে ছাড়া বাথরুমে যাবার রাস্তা নেই।

সায়া-ব্লাউজ-ট্লাউজ খুলে রাখলাম। ওগুলো আর ভেজাব না। ঢেংকানল গিয়ে সাবান দিয়ে দেব। শ্যাম্পু, সাবান আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে গেলাম। বেশ অনেকক্ষণ ধরে, ভাল করে স্নান করলাম। সারা শরীরটা ঝর্‌ঝরে মনে হলো।

বাথরুমে ওয়াশ-বেসিনের সামনে একটা আয়না ছিল, কিন্তু সে আয়নার সামনে না দাঁড়িয়ে ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম। নিজেই নিজেকে দেখলাম। অনেকদিন পর এমনভাবে নিশ্চিন্তে নিজেকে দেখলাম। আমার এই দেহটার জন্য সুনীল কি পাগলামি করত! সব ছেলেরাই করে।

অ্যানাটমির ডিসেকশন ক্লাসে মেয়েদের ডেড বডি নিয়ে ছেলেরা কি করত! আশ্চর্য! মেয়েদের দেহের যে অংশগুলোর প্রতি ওদের সব চাইতে বেশি আগ্রহ, লোভ, সেগুলোকে যা তা ভাবে কাটাকাটি করত। দল বেঁধে, সবাই মিলে। ওদের সার্বজনীন উল্লাস দেখে আমরা মেয়েরা, অবাক হতাম। লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত। ডিমনস্ট্রেটর মেয়েদের ব্রেস্ট কাটার সময় যখন বলতেন অ্যান্টিরিওর আপার পার্ট অফ দি থোরাকস, তখন ছেলেদের কি মুচকি মুচকি হাসি! এই ম্যামারি গ্ল্যান্ডে কিছু বোঝাতে গেলেই ছেলেরা এমনভাবে ঝুঁকে পড়ত যে আমরা, মেয়ে স্টুডেন্টরা কিছু দেখতে বুঝতে পারতাম না। মেয়েদের ডেড বডি নিয়েই যারা অমনভাবে উল্লাস করতে পারে তারা জীবন্ত, প্রস্ফুটিত মেয়েদের দেহ পেলে...

ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালাম। কাপড়-চোপড় পরে নিলাম। চুল আঁচড়ে নেবার জন্যও আয়নার সামনে দাঁড়ালাম না। লজ্জা করল। মুখে একটু পাউডার-টাউডার মাখার সময় শুধু একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বেশ ক্ষিদে লেগেছে। কাল সন্ধ্যাবেলায় হাওড়া স্টেশনে খেয়েছিলাম। আর কিছু খাইনি। মেরিনা কিছু কেক-পেস্ট্রি আর এক প্যাকেট সন্দেশ দিয়েছিল। তারই কিছু খেলাম।

ব্যাগের মধ্যে টাকা-পয়সা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস-এর চিঠি ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নীচে নেমে সানগ্লাস

চোখে দিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে একটা রিকসা নিলাম।

স্টেশন থেকে সেক্রেটারিয়েট বেশি দূর নয়। মাইলখানেক মাত্র। রাস্তাগুলি বেশ চওড়া। পরিষ্কার। ফাঁকা ফাঁকা। সেক্রেটারিয়েট ভবনটি বিরাট হলেও বৈশিষ্ট্যপূ নয়। তবে আমাদের কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মত নোংরা নয়। পরিবেশটি নিঃসন্দেহে সুন্দর। মনোরম।

ডেপুটি ডাইরেক্টর ডাঃ মহান্তির ঘরে ঢুকতেই উনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন. আসুন, আসুন।

আমি বসলাম। খুশি মনেই বসলাম। ওঁর সৌজন্যবোধের জন্য ভাল লাগল

'কখন পৌঁছলেন?' ডাঃ মহান্তি জিজ্ঞাসা করলেন। যেমন গুরুজন প্রবীণর জানতে চান।

'বেশ ভোরেই পৌঁছেছি।'

'ট্রেন লেট ছিল নাকি?'

'বেশি না।'

'কোথায় উঠেছেন?'

'স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে।'

'কোন অসুবিধা হলে...'

'না না অসুবিধা কিছু হচ্ছে না।'

ডাঃ মহান্তির বেশ বয়স হয়েছে। পঞ্চাশের উপরেই হবে, কথাবার্তা ভারী সুন্দর। সুন্দর পরিষ্কার বাংলা বলেন।

'আপনার বাংলা শুনে মনে হয় আপনি বাঙালী।'

উনি হাসলেন। 'স্কুলে বাঙালী মাস্টার মহাশয়ের কাছে পড়েছি।'

'আমাদের স্কুলে অনেক বাঙালী ছেলে পড়ত। তাছাড়া ডাক্তারি পড়েছি, আর জি কর-এ। বাংলা জানব না?'

আমি হাসলাম।

কথায় কথায় একটু পুরনো দিনের কথা শোনালেন উনি। আমাদের ছেলেবেলা দেশ পিছিয়ে ছিল ঠিকই কিন্তু মানুষগুলো ভাল ছিল। আজকের মত তখনকার দিনে মানুষের মন বিষাক্ত ছিল না, এত স্বার্থপর ছিল না। এত লড়াই ঝগড় ছিল না। বন্ধুরা বন্ধুই ছিল; তারা বাঙালী না ওড়িয়া সে কথা আমরা ভাবতাম না। ভাববার দরকার মনে করতাম না।

বড় ভাল লাগল কথাগুলো। 'ঠিক বলেছেন। যত দিন যাচ্ছে তত বেশি আমরা মীন মাইন্ডেড হচ্ছি।'

চা খাবার পর কাজের কথা শুরু হলো।

'ঢেংকানল হাসপাতালে আপনার আগে কোন লেডি ডাক্তার পোস্টেড হননি আপনিই প্রথম।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ ?'

'কেন ?'

'মেয়ে ডাক্তাররা বড় বড় শহরের বাইরে যেতে চায় না। তার অবশ্য নানা কারণ আছে। অথচ প্রত্যেক হাসপাতালে গাইনি ডিপার্টমেন্টে দু-একজন মেয়ে ডাক্তার না থাকলে খুবই অসুবিধা হয়...'

'তাতো বটেই।'

'বড় বড় শহরের চাইতে ছোট ছোট শহরে মেয়ে ডাক্তার আরো বেশী দরকার।'

'কেন ?'

'আমাদের গ্রামের মেয়েরা খুব সাই হয়। অনেকেই পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। মেয়ে ডাক্তারের অভাবে তাই বহু মেয়ের চিকিৎসাই হয় না।'

নতুন উপলব্ধি হলো। 'আগে কোনদিন এসব কথা মনে আসেনি।'

ডাঃ মহান্তি হাসলেন।

আরো কিছুক্ষণ এমনি কথাবার্তার পর উনি বললেন, 'আপনাকে এখুনি, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ার্টার দেওয়া যাচ্ছে না তার কারণ যে ডাক্তারকে ট্রান্সফার করা হয়েছে, তার ফ্যামেলি এখনও ওখানে আছেন। যতদিন ঐ কোয়ার্টার খালি না হয় ততদিন আপনি ইনস্‌পেকসন্‌ বাংলোর একটা ঘরে থাকবেন এবং তার জন্য কোন রেন্ট দিতে হবে না...'

'কেন ?'

'ওখানকার সব ডাক্তাররাই কোয়ার্টারের বদলে টেম্পোরারি একটা-দুটো ঘরে অ্যাকোমোডেশন নিলে রেন্ট চার্জ করা যায় না।'

'ভালই।'

'তবে ইনস্‌পেকসন্‌ বাংলোয় আপনার অসুবিধা হবে না। একটা বড় ঘর আর বাথরুম ছাড়াও একটা অ্যান্টি-রুম পাবেন। ঐ অ্যান্টি-রুমেই আপনি রান্না-বান্না করবেন। ইনস্‌পেকসন্‌ বাংলো ফাঁকাই থাকে, সুতরাং কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।'

'না, না অসুবিধা কেন হবে ?'

'যদি কোন অসুবিধা হয়, তাহলে আপনি আমাকে জানাবেন। আই উইল ট্রাই টু হেলপ ইউ।'

'আপনার অত চিন্তা করার কোন কারণ নেই।'

'ঠিকই বলেছেন, তবে আপনার কাছে ভালো রিপোর্ট পেলে অন্যান্য মেয়েরাও হয়ত এদিকে চাকরি নিতে পারে।'

ভেবেছিলাম দশ-পনের বা বিশ মিনিট থাকব কিন্তু কথায় কথায় প্রায় দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেল। কেটে গেল অনেক দ্বিধা, সঙ্কোচ। অনেক ভয়, ভাবনা।

যারা সারাজীবন কলকাতায় কাটায়, আমার মত যারা শুধু কলকাতাকেই চেনে, জানে, বা হয়ত একটু ভালবাসে তারা কলকাতার বাইরে যেতে ভয় পায় নানা কারণে। কলকাতার বাইরে চাকরি নেবার কথা আগে ভাবতে পারিনি। পারতাম না। আমার জীবনে অঘটন না ঘটলে হয়ত কোনদিনই কলকাতা ছাড়তাম না। ডাঃ মহান্তির সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে মনে হলো বেরিয়ে পড়ে ভালই করেছি।

হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনি আছেন জানলে অনেক আগেই এখানে আসতাম।'

ডাঃ মহান্তি প্রথমে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের সাহায্য করার জন্য তো গভর্নমেন্ট আমাকে মাইনে দিচ্ছে। তাছাড়া সবাইকে ছেড়ে এতদূরে চাকরি করতে এসেছেন, আমি আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবব না?'

মনে মনে হাসি পেল। সবাইকে ছেড়ে এসেছি। উনি জানেন না এই পৃথিবীতে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই। আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও বহু পরিচিত আছে, কিন্তু তারা সবাই আমার সুদিনের জন্য। আমি যখন সঙ্কট আর সমস্যায় জড়িয়ে পড়লাম, স্বামী জীবিত থেকেও যখন বৈধব্যের ব্যথা-বেদনা আমাকে জর্জরিত করে তুললো তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে কাউকে খুঁজে পেলাম না। কেউ দেখা দিল না।

সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে এইসব কথাই ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ মাত্র। যারা পিছনে রইল, যারা অন্ধকারের মধ্যে আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল তাদের কথা ভাবব না। নতুন জীবন শুরু করছি। নতুন মানুষের কথা ভাবব, ভালবাসব, পুরনো দিনের স্মৃতি মুছে ফেলব, শূন্য মন পূর্ণ করব নতুন মানুষের ভাবে, ভাবনায়। কথায় কাহিনীতে।

রাস্তায় এসে ফাঁকা মাঠটার মুখোমুখি হতেই অনুভব করলাম রোদ্দুরের জেদ। ভীষণ রোদ্দুর। সানগ্লাস চোখেই ছিল কিন্তু তবুও মাথায় ঘোমটা না দিয়ে পারলাম না। ঘোমটা মাথায় দিলেই সুনীলের কথা মনে পড়ে। আজ এখনও মনে পড়ছে...

এই রকম গরমের দিন। বেলা আড়াইটা-তিনটে হবে। ডাঃ ব্যানার্জীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না বলেই এত দেরী হয়ে গেল। গাইনিতে গিয়ে রেখাকে পেলাম না। নিশ্চয়ই চলে গেছে। ইডেনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটু দাঁড়ালাম। অ্যাপ্রনটা খুলে হাতে নিলাম। সানগ্লাসটা চোখে দিলাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছিলাম। ট্রপিক্যালের কাছে এসে মাথায় ঘোমটা না দিয়ে পারলাম না। মাথাটা ভীষণ গরম হয়েছিল। ভূতের মত হাওয়ায় ভেসে সুনীল এসে হাজির হলো পাশে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাড়ি যাচ্ছি।'

'এক্ষুনি?'

'তবে এই রোদ্দুরে কি করব?'

'মাথায় ঘোমটা দিয়েছ কেন?'

'মাথায় রোদ্দুর লাগে না?'

'তাই বলে ঘোমটা দেবে?'

'কেন, কি হয়েছে?'

ও ভ্রূ কুঁচকে বেশ চিন্তিত হয়ে বলল, 'না, না, তুমি ঘোমটা দিও না।'

'কেন?'

মনে হয় ঐ ঘোমটার তলায় রক্তবর্ণ সিঁদুরের রেখাটা লুকিয়ে আছে।'

ভাবলেও হাসি পায়। ওর ছেলেমানুষীর কথা ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু কি অদৃষ্ট! সত্যি সত্যিই যেদিন আমার সিঁথিতে সিঁদুর উঠল, সেদিন বিধাতা পুরুষ সহ্য করতে পারলেন না। এইসব কথা ভাবতে গেলে মাঝে মাঝে সুনীলের ওপর দারুণ রাগ হতো। কেন ও আমাকে নিয়ে, আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলল? কি দরকার ছিল এই খেলা করার, এই অভিনয় করার।

ছি, ছি, ওকথা বলে না। ও আমার সঙ্গে অভিনয় করেনি। এক মুহূর্তের জন্যও নয়। তা আমি প্রাণ মন দিয়ে বিশ্বাস করি।

'জান লেখা, আকাশের তারাগুলোর মত আমি দিনেও আছি, রাত্রেও আছি অথচ'

'তার মানে?'

দিনের বেলাতেও আকাশে তারা থাকে। শুধুই থাকে। তাদের দীপ্তি থাকে না। প্রকাশ থাকে না। বৈশিষ্ট্য থাকে না। কিন্তু রাত্রে ঐ তারাগুলোই যেন ঝলমল করে হেসে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়। সার্থক হয়।'

আমি চুপ করেছিলাম। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে ভাবছিলাম। একটু পরে ও আমার মুখটা তুলে ধরে বলল, 'লেখা তুমি আমার সেই রাত্রি। তোমার কাছেই আমার সার্থকতা, অন্যত্র নয়।'

সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম। অনেক পরে।

কলকাতা ছেড়েছি। ছেড়ে এসেছি সবাইকে! চলে এসেছি। ভুবনেশ্বরে। আগামীকাল চলে যাব ঢেংকানলে। একলা একলা থাকব। নতুন জীবন গড়ব। অথচ এখন আবার সেই পুরনো দিনের কথা, পিছনে ফেলে আসা জীবনের কথা ভাবছি। ঐ সব স্মৃতি কি প্রেতাত্মার মত আমাকে সারা জীবনই ছায়ার মত অনুসরণ করবে?

না, আমি ভাবব না। কিছুতেই না। যারা অকৃপণভাবে আমাকে দুঃখ দিল, আমাকে নিঃসঙ্গ করল, তাদের কথা আমি ভাবব না। সত্যি ভাবব না। সুনীলকে খারাপ ভাবতে পারি না। কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। মনে মনে ব্যথা পাই কিন্তু ওর প্রতিও কি আমার কম অভিমান?

আগে ভেবেছিলাম সারাদিন ঘুরব। কিন্তু এখন আর ইচ্ছা করছে না। তাছাড়া বড্ড রোদ্দুর। বেশ বেলা হয়েছে। দুটো বাজে। ক্ষিদেও লেগেছে। একটা রিক্সায়

উঠে হোটেলে গেলাম। খেলাম। খেয়েই স্টেশনে ফিরে গেলাম।

ঘরে ঢুকেই খেয়াল হলো জানালাগুলোর পর্দা টেনে দিয়ে যাইনি। কাচের জানালাগুলো খোলা। গরম হাওয়ায় ঘরটা ভরে গেছে। তাড়াতাড়ি কাচের জানালাগুলো বন্ধ করে পর্দা টেনে দিলাম। ইচ্ছা করল স্নান করি, কিন্তু করলাম না। এত গরম থেকে এসেই স্নান করলে শরীর খারাপ হতে পারে। পাখার হাওয়ায় শরীরটাকে একটু ঠাণ্ডা করে বাথরুমে গেলাম। হাত-মুখ ধুয়ে এলাম। ভালই লাগল।

শুয়ে পড়লাম। ঘুম পাচ্ছে।

কলকাতা ছাড়ার আগে বহুদিন ভাল করে ঘুমুতে পারিনি। দিনের বেলায় বেশ পরিচিতদের দৃষ্টির বাইরে থাকার জন্য চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। রাত্রে ঘুম এলেও একটু পরে জেগে যেতাম। মনে হতো চারপাশের অজস্র মানুষ আমাকে দেখে অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়ছে। আরো কত কি মনে হতো। কাল রাত্রে প্রথমের দিকে ঘুমুতে পারিনি কিন্তু শেষের দিকে খুব ঘুমিয়েছি। সকালের দিকেও বেশ ঘুমিয়েছি। তবুও এখন ঘুম পাচ্ছে।

যখন ঘুম ভাঙল তখন আর রোদ্দুর নেই। শুধু মিষ্টি আলোয় ভরে আছে চারপাশ। টুকটাক কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করার আছে। তাই বিছানায় গড়িয়ে সময় নষ্ট না করে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়েও পড়লাম।

ইস্টার্ন টাওয়ার, ওয়েস্টার্ন টাওয়ারে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা শেষ করলাম। তারপর কি মনে করে হঠাৎ একটা রিকসায় চড়ে ওল্ড টাউনে লিঙ্গরাজের মন্দির দেখতে গেলাম।

বিশেষ কোন কারণ ছিল না ; তবুও গেলাম।

মন্দিরে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়েছে। একটু পরেই বিগ্রহের সন্ধ্যারতি হবে। পাণ্ডারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে গড়-গড় করে মন্ত্র বলছিল। আমি সেসব মন্ত্র আবৃত্তি করলাম না। প্রণাম করে মনে মনে শুধু বললাম, 'ঠাকুর তোমার কাছে তোমার দেশে এলাম। তুমি দেখ।'

মন্দির থেকে ফেরার পথেই অনুভব করলাম ভুবনেশ্বরের সন্ধ্যাবেলাটা সত্যি মনোরম। কলকাতায় বসন্তকালের সন্ধ্যায় এমন মিষ্টি বাতাস বয়ে থাকে। বর্ষার সময় ছাড়া এখানে নাকি সারা বছরই সন্ধ্যাবেলাটা এই রকম মনোরম। খুব ঘুরে বেড়ালাম। মিউজিয়াম, জনপথ, রবীন্দ্রমণ্ডপ, স্টেট গেস্ট হাউস, অ্যাসেমব্লী আরো কত কি! বাস স্ট্যান্ডটাও ঘুরে এলাম। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় এখান থেকেই আমাকে বাস ধরতে হবে। অ্যাডভান্স বুকিং হয় না। হলে টিকিটটা কেটে নিতাম।

রিকসার হুড খুলে দেওয়ায় ভাল লাগছিল। এত ভাল অনেকদিন লাগে নি। অনেকদিন পর আকাশ দেখলাম। বাতাসের মিষ্টতা অনুভব করলাম। আমি একলা। কথা বলতে পারছি না। পাশে কেউ থাকলে চিৎকার করে হয়ত বলতাম, না না, সারা পৃথিবীটা এখনও মরুভূমি হয়নি। প্রকৃতি এখনও মানুষের মত নির্মম হয়নি।

ছোট্ট একটা পাহাড়ের নীচেই বাসস্ট্যান্ড। ঐ পাহাড়ের মাথার উপরেই সার্কিট হাউস। পাহাড়টা ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। পিচের সুন্দর রাস্তা। পাহাড়ে উঠার মুখেই অফিসার্স ক্লাব। বোধহয় পরিত্যক্ত অথবা সীমিত ব্যবহারের জন্য এমন দৈন্যদশা। এদেশে ইংরেজদের আত্মীয়-বন্ধু ছিল না বলেই সহকর্মীদের নিয়ে ক্লাব গড়ত। নাচের আসরে, মদের আড্ডায় বিলিয়ার্ডরুমে ক্যাপিটালিস্ট ইংরেজ সিনিয়র জুনিয়রের ভেদাভেদ মানত না. জানত না আমরা সোস্যালিস্টরা জাতিভেদ মানতে চাই না কিন্তু অফিসারদের স্তর ভেদ রক্ষা করি। অফিসে, ক্লাবে সর্বত্র। ক্লাবে গিয়েও বড় অফিসার ও তাদের বিবিদের উমেদারী করতে হলে কী ক্লাব চলে? চলে না। চড়েরগড়ায় এই অফিসার্স ক্লাবেরও বোধহয় এই কাহিনী।

সার্কিট হাউসের কাছাকাছি ছোট ছোট দুটি কটেজ। বোধহয় অফিস-টফিস হবে। অথবা কেউ থাকে। জানি না। জানার দরকার নেই। সার্কিট হাউসটি বেশ বড়। সুন্দর! বড় ফাঁকা ফাঁকা। ভিজিটার্স বুকে আমার নাম-ধাম লেখার সময় দেখলাম মাসে দু-তিনজনের বেশি আসেন না। এলেও রাত কাটান না। দরকার নেই। কটক তো দেড়-দুঘন্টার পথ। ভাল। খুব ভাল। আমি মনে মনে দারুণ খুশি হলাম।

ঘর-বাড়ি ছেড়ে, শহর থেকে দূরে, আত্মীয় পরিজনের সতর্ক দৃষ্টির বাইরে নির্জন ডাকবাংলো বা রেস্ট হাউসে এসে বহুজনের মনে রং লাগে। সুপ্ত চেতনা, প্রবৃত্তি, অতৃপ্ত কামনা জেগে ওঠে। দারুণ জোরে জেগে ওঠে। হৃৎপিণ্ডের চাইতে পেশীগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়। অশান্ত, চঞ্চল হয় রক্ত। সবার নয়। অনেকেরই।

আমার হবে না তো?

ভাবতে গিয়েই হাসি পেল। আবার শিউরে উঠলাম। সদ্য এই সর্বনাশা অভিজ্ঞতার পর আবার চোখে রঙীন নেশা লাগবে? হৃৎপিণ্ডকে হারিয়ে পেশীগুলো উন্মত্ত হয়ে উঠবে? শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত দৌড়োদৌড়ি করবে? সারা শরীরটা দিয়ে আগুনের হলকা বেরুবে?

না, না, তাই কি হয়?

অসম্ভব।

চড়েরগড়া পাহাড়ের মাথায় এই সার্কিট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পানিগুলা ফরেস্ট, টুকুনিয়া হিলস, নোয়াপুকুরীর ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলাম। বেশ লাগল। সুন্দর, চমৎকার পরিবেশ। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা. মিষ্টি। চঞ্চল মন একটু শান্ত হলো।

কটক-সম্বলপুর রাস্তার উপরেই ঢেংকানল। শহরটি ছোট, গুরুত্বে নগণ্য। কলকাতায় থাকতে নাম পর্যন্ত শুনিনি। যেমন শুনিনি অনেক কিছু। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার বা মালদা-র সব মহকুমাগুলোর নামও জানি না। আমাদের দেশে এসব না জেনেও শিক্ষিত হওয়া যায়। আমিও হয়েছি। চতুর্দশ লুইয়ের দুর্বলতার কাহিনী

জানি কিন্তু পুরী-ভুবনেশ্বর-কটকের বাইরে যে ওড়িশা আছে, তা জানতাম না। শহরটি ছোট হলেও বেশ সুন্দর। পরিচ্ছন্ন। এখানকার মানুষগুলো গরীব কিন্তু হাহাকার নেই। সেই দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা উত্তপ্ত বাতাস। কটক-ভুবনেশ্বরে পোস্টিং না হয়ে ভালই হয়েছে। শান্তিতে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।

বাসে চড়ে শহরে ঢুকতে গেলেই পানিওলা ফরেস্টের কাছে, টুকুনিয়া পাহাড়ের ধারে আম্রকুঞ্জে ঘেরা বজনাথ বডেজনা হাই স্কুল। খুব পুরনো স্কুল। অতীতে নাম ছিল ঢেংকানল হাই স্কুল।

হাসপাতালের হেডক্লার্ক জগন্নাথবাবুর কাছে ঐ স্কুলের গল্প শুনেছিলাম। 'তখন সারা ওড়িশায় দুটোই নাম করা স্কুল। একটা র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল আর আমাদের ঢেংকানল স্কুল। সারা ওড়িশার অর্ধেক নামকরা লোক আমাদের এই স্কুলের ছাত্র...'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। কত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ইউনিভার্সিটির প্রফেসার, এম. এল. এ, এম-পি, আই. সি. এস. আই. পি. এস যে এই স্কুলে পড়েছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই।'

'সত্যি ?'

জগন্নাথবাবু হাসলেন। 'আপনাকে মিথ্যা কথা বলে আমার কি লাভ ?'

কথা শুনে লজ্জা পেলাম। জগন্নাথবাবু প্রবীণ লোক। ওকে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই নেই। না, না, মিথ্যা বলবেন কেন ? তবে ওরা কি ঢেংকানলের কথা মনে রেখেছেন ?'

জগন্নাথবাবু আবার হাসলেন। একটু শুকনো হাসি, আক্ষেপের হাসি। স্বাভাবিক। যাদের নিয়ে ঢেংকানলের মানুষ গর্ব অনুভব করেন, তাঁরা যদি এমন করে ভুলে যান তাহলে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক।

জগন্নাথবাবুর কাছে বসে গল্প শুনতে বেশ লাগে। ঢেংকানলের রাজার অনেক কুকীর্তি আছে। অনেক অন্যায়, অবিচারের স্মৃতি জগন্নাথবাবুর মত প্রবীণ লোকেদের স্মৃতিতে আজও অম্লান। আটত্রিশের সেপ্টেম্বরের কাহিনী বলতে গিয়ে গলার স্বর আজও কেমন নরম হয়ে যায়।

'কি হয়েছিল ?'

'রাজার অত্যাচারে পাগল হয়ে উঠেছিল ঢেংকানলের মানুষ। অকথ্য অত্যাচার। আজকের দিনে সেসব অত্যাচারের কথা শুনে বিশ্বাস করা কঠিন। শেষে উনিশ শ' আটত্রিশের বারোই সেপ্টেম্বর হাটতোটার আমতলায় পঁচিশ হাজার লোক জমায়েত হলো। বিদ্রোহ করতে চাইল রাজার বিরুদ্ধে। কদিন পরেই হাজার কে ও এস বি এস হাজির...

'কে ও এস বি কি ?'

'কিংস ও স্কটিশ ব্যাটেলিয়ান...'

'তারপর ?'

'মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা সারা শহর টহল দিল। এর পরেই এলো ইস্টার্ন স্টেটস্ পুলিশ...'

'কলকাতা থেকে এলো ?'

'না। পূর্ব ভারতের ছত্রিশটি দেশীয় রাজ্যের জন্য এই ফোর্স মজুত থাকত। এই ই. এস. পি আসার পরেই শুরু হলো অত্যাচার। নির্মম অত্যাচার। সারা শহরের ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায়। কত লোককে মারল আর কতজনকে যে জখম করল সে কি বলব !'

জগন্নাথবাবুর চোখমুখ দেখেই ঢেংকানলের সেই অন্ধকার দিনগুলোর কিছুটা আভাস পেলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। দুজনেই।

চোখদুটো বড় বড় করে একটু গর্বের সঙ্গেই উনি বললেন, 'কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে রাজার দারুণ উৎসাহ ছিল। প্রচুর খরচ করতেন। প্রাইমারী এডুকেশন কম্পালসারী ছিল। স্কুল থেকে নাম কাটাতে হলে দরবারের অনুমতি দরকার হতো।'

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। 'বলেন কি ?'

'হ্যাঁ।'

সকাল নটায় হাসপাতালে আসি। সাড়ে এগারোটা-বারোটার মধ্যেই কাজ শেষ হয়। গাইনি ওয়ার্ডে খুব বেশি ভিড় নেই। শহরেব পয়সাওয়ালা বা ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবারের মেয়েরা এখানে বিশেষ আসেন না। ওঁরা কটক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। তাছাড়া বেশি সিরিয়াস কেস হলে হাসপাতাল থেকেই কটক পাঠান হয়। অন্যান্য ডাক্তারদের রাউন্ড বারোটার মধ্যে শেষ হয়। হবেই। তারপর ডাঃ মহান্তির ঘরে বসে কফির আসর। রোজ। আমি প্রথম প্রথম যেতাম না। লজ্জা করত। নিজের ঘরেই বসে থাকতাম। মেডিকেল জার্নালগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে চা খেতাম। কিন্তু বেশিদিন পারিনি। ডাঃ মহান্তির মত রসিক মানুষের থেকে দূরে থাকা সহজ নয়। প্রায় অসম্ভব। হঠাৎ কোন সিরিয়াস কেস এলে আড্ডা ভেঙে যায়।

নার্স তাড়াহুড়ো করে ঢুকেই ডাঃ মহান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, 'পয়জনিং কেস এসেছে !'

'পুরুষ না মেয়ে ?'

'মেয়ে।'

'ইয়ং নিশ্চয়ই ?'

নার্স হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ।'

'জানতাম। ইয়ং মেয়ে ছাড়া অঘটন আব কারা করবে।'

ডাঃ দাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিরিয়াস মনে হচ্ছে ?'

ডাঃ মহান্তি নার্সকে জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই বললেন, 'মহারানীকে জিজ্ঞাসা কর উনি বাঁচতে চান নাকি মরতে চান?'

নার্স চলে গেল। ও জানে ডাঃ মহান্তি এই রকমই কথাবার্তা বলেন! আমি জানতে চাইলাম, 'সে-কথা জেনে আপনার লাভ?'

নির্বিকার হয়ে উনি জবাব দিলেন, 'ওকে মারবার না বাঁচাবার চিকিৎসা করব, জানব না?'

আমরা সবাই হাসতে হাসতে ডাঃ মহান্তির পিছনে পিছনে গেলাম। সীসা খেয়েছিল। অনেকক্ষণ হয়েছে। হেপাটিক ফেলিওর শুরু হয়েছিল। প্লাস্টিক অ্যাসপিরেশন আর ল্যাভেজের পর ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, ক্যালসিয়াম ডিসোডিয়াম ইত্যাদি দেওয়ার পর আমরা আবার ফিরে এলাম।

এক কাপ কফি খেয়েই ডাঃ মহান্তি উঠে দাঁড়ালেন। ডাঃ দাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় চললেন?'

'ইয়ং মেয়েদের কষ্ট দেখলেই 'ফোর্থ ইয়ারের ফিফথ্-ইয়ারের' দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ইয়ং মেয়েদের কষ্ট দেখলে তাকে সারাবার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টাই করতাম!'

আমরা তখনও কফি খাচ্ছি। উনি চলে গেলেন মেয়েটিকে দেখতে।

ডাঃ মহান্তি বড় ভাল মানুষ। বড় হাসি-খুশি ভরা। হাসপাতালে, বাড়িতে। সব সময়, সর্বত্র। ডাঃ পটনায়ক একটু বেশি গম্ভীর। বয়সেও সব চাইতে প্রবীণ। আমাদের বস্। তবে ওর স্ত্রী বেশ জমাটে। প্রথমদিন আলাপ করতে গিয়েই জমে গেলাম।

'তুমি বলে ডাকতে পারি তো?' নির্বিবাদে শ্রীমতী পটনায়ক জিজ্ঞাসা করলেন।

'নিশ্চয়ই। আমি আপনার চাইতে কত ছোট!'

'ওসব ছোট-বড় ছাড়। তুমিও আমাকে তুমি বলবে।'

'পারব কি?'

'মেয়ে হয়েও ডাক্তারী পাশ করেছ, আর তুমি বলে ডাকতে পারবে না?'

আমি হাসলাম। উনি বললেন, 'আপনি আপনি করে কথা বললে কি আড্ডা দেওয়া যায়?'

কথাটা ঠিকই। তবে কয়েকদিন আমাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল।

আমি কোনকালেই বেশি আড্ডা দিই না। দিতে পারি না। পছন্দও করি না। লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করি। তবে বেশিক্ষণ নয়। ইদানীংকালে বিশেষ করে। কাজকর্মের অবসরে মনের আকাশের দিকে তাকালেই দেখি অন্ধকার। ঘন কালো অন্ধকার। একেবারে পচা ভাদ্দর। ঢেংকানলে এসেও মনের খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। হতে পারে না। তবুও এদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে ভাল লাগে। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য নিঃসঙ্গ, বেদনাতুর নিজের জীবনের কথা ভুলে থাকি। মাঝে মাঝে

হাসি। সন্ধ্যার আগেই সার্কিট হাউসে ফিরে আসি। রোজ।

বেতের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় বসে দূরের আকাশ, ধূসর মাঠ দেখি, দেখি ক্ষেতের চাষী, আকাশের পাখি ঘরে ফিরছে। সারাদিনের ক্লান্তির পরেও কি উদ্দাম গতিতে পাখিরা ঘরের নিশানায় উড়ছে, দেখে অবাক হই। ওদেরও ঘর আছে, আপনজন আছে। আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, স্বপ্ন আছে, সাধনা আছে। আমার? আমার কি আছে?

'দিদি চা খাবেন?'

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি পরমানন্দ। শ্রীপরমানন্দ দাস। প্রথমদিন ওর নাম জিজ্ঞাসা করলে এই নামই বলেছিল। সার্কিট হাউসের দেখাশুনার ভার ওরই। বয়সে আমার চাইতে ছোট নয়। দু-তিন কি চার বছরের বড়ই হবে, তবু আমাকে দিদি বলে। বেশ ভাল লাগে শুনতে। আজ আমি কারুর মেয়ে না, কোন বোন না, স্ত্রীও না। কোন কিছুই না। পরমানন্দ দিদি ডাকলে একটু ভাল লাগার ছোঁয়া পাই মনে মনে।

আমি হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি খেলে, খেতে পারি।'

পরমানন্দও হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'আপনি একলা একলা কবে চা-খান?'

আমি রান্না করতে জানি। স্কুলে কলেজে পড়ার সময় মার কাছে শিখেছি। মাঝে মাঝে সারা বাড়ির রান্নাও করেছি। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পর আস্তে আস্তে অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে যায়। এখন আর ভালই লাগে না। অবশ্য আমার জীবনের ক্ষণস্থায়ী বসন্তে সুনীলকে রোজই কিছু না কিছু রান্না করে দিতাম। ভাল লাগত। ইচ্ছা করত। শুধু চাকরের রান্না দিয়ে ওকে খেতে দিতে পারতাম না। দেড়টা-দুটোর সময় হাসপাতাল থেকে এসেই রান্না করতাম বলে ও ভীষণ রাগারাগি করত। বকাবকি করত। ও রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কি করছ?'

'একটু মাছের ঝোল করছি।' আমি ওর দিকে না ফিরেই জবাব দিতাম।

'কেন? প্রমথ মাছ রাঁধতে পারে না?'

'ঠিক আমার পছন্দ মত পারে না।'

'ডাল-তরকারী পছন্দ হয় আর মাছের ঝোলটাই পছন্দ হয় না?'

'না।'

'আমার তো বেশ ভাল লাগে।'

আমি কড়ায় জল ঢালতে ঢালতে হাসি। বলি, 'আমার ভাল লাগে না।'

আমার নির্বিকার ভাব দেখে ও আরো রেগে যেত। 'এখন তুমি রান্না করবে, তারপর আমরা খাব?'

'তুমি জামা-প্যান্ট ছেড়ে হাত-মুখ ধুতে ধুতেই হয়ে যাবে।'

'তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় খাওয়ার কোন মানে হয়?' ও গজগজ করতে করতে ঘরে চলে যেত।

কোন কোনদিন আবার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপত। হাসপাতাল থেকে এসে ঝপাং করে বিছানায় শুয়ে পড়ত। প্রমথ মিছরির জল দিতে গেলেই বলত, 'একটু বৌদিকে পাঠিয়ে দে তো। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।'

প্রমথ রান্নাঘরে এসে বলত, 'দাদাবাবুর শরীরটা ভাল লাগছে না। আপনাকে ডাকছেন।'

আমি সবকিছুই বুঝতাম কিন্তু প্রমথর সামনে প্রকাশ করতাম না। ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'কি হয়েছে?'

গলাটা বেশ নীচু করে ও বলত, 'একটু এদিকে এসো।'

আমি ওর কাছে যেতেই ও খপ করে আমাকে জড়িয়ে-ধরে টেনে নিত।

'আঃ! কি হচ্ছে?'

'কি আবার হচ্ছে?'

'প্রমথ বুঝতে পারলে কি হবে বলো তো?'

'প্রমথ সব বোঝে সব জানে।'

'তাই বলে...'

আর তাই বলে? ঐ দুচার মিনিটের মধ্যেই কিছু দেওয়া-নেওয়া সেরে নিত সুনীল।

এখানে আসার পর শুধু নিজের জন্য রান্না করতে ইচ্ছা করে না। করিনি। টিফিন কেরিয়ার পাঠিয়ে হোটেল থেকে দুবেলা খাবার আনিয়ে নিতাম। কয়েকদিন মাত্র। পরমানন্দ বন্ধ করে দিল। ছোট অ্যান্টি রুমে রান্নার ব্যবস্থা করে লোক ঠিক করে দিয়েছে। সকালে বিকালে রান্না করে দিয়ে যায়। চা-টা আমি নিজেই করে নিই। পরমানন্দের হাতে কাজ না থাকলে তাও করতে হয় না।

'এই নিন দিদি' পরমানন্দ চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল।

'তুমি নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। এইত।'

পরমানন্দের সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করতে করতে কিছু সময় বেশ কেটে যায়। পরিত্যক্ত যতননগর প্যালেসের কাহিনী শুনি। কিন্তু তারপর? সার্কিট হাউসটা ফাঁকা হয়ে গেলে আমি কি করি? শুধু দূরের আকাশের তারা দেখে কি মন ভরে?

দিনের বেলা সবকিছু দেখতে পাই, শুনতে পাই। আশেপাশের দূরের কাছের। পরিচিত-অপরিচিতের। হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স-কম্পাউন্ডার-পেসেন্টরা দিনের বেলায় আমার চারপাশে ভিড় করে থাকে। চোখের সামনে মনের পর্দায় ভিড় করে থাকে। আরো কত মানুষ তখন সবাই আমার কাছে। শুধু আমিই আমার থেকে দূর থাকি।

কিন্তু রাত্রিতে? যখন আমার চারপাশে ভিড় থাকে না যখন অসংখ্য মানুষের

সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার কোরাসে আমার মনের সেতারে বেসুরো সুর বাজে না তখন? নিজেকে দেখতে পাই নিজের কথা শুনতে পাই। চড়েরগড়ার মাথায় এই সার্কিট হাউসের বারান্দায় একলা একলা বসে থাকি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নোয়াপুকুরী, যতননগর দেখতে পাই না। ভালই। বসে বসে ভাবি। নিজের কথা। অতীতের কথা, ভবিষ্যতের কথা। ভাবতে ভাবতে কোন সুদূরে চলে যাই, তাই নিজেই টের পাই না।

সার্কিট হাউসের বারান্দায়, ড্রইং রুমে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। তাই নিয়ম। লোকজন না থাকলেও জ্বলে। আমি বারান্দার আলো অফ করে দিই। অন্ধকারে চুপি চুপি নিজেকে দেখতে ভাল লাগে। ড্রইংরুমে আলো থাকলেও পর্দা টেনে দিই। সে আলো বারান্দায় আমার কাছে আসতে পারে না। অনুমতি নেই।

সার্কিট হাউসে লোকজন থাকলে আমি আমার ঘরে চলে যাই। রাতের আবছা আলোয় অপরিচিত পুরুষের কাছাকাছি থাকতে ভয় করে। আশঙ্কা হয়। শুয়ে থাকি, বসে থাকি। কখনও আগে খেয়ে নিই, কখনও পরে। সার্কিট হাউসে অফিসাররা না থাকলে কখনও কখনও এই প্যাহাড়ের উপর ঘুরে-ফিরে বেড়াই হাঁটতে হাঁটতে হয়ত একটা পাথরের ঢিপির ওপর বসি। হয়ত পায়ের কাছ থেকে ঘাস ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে হাত দিয়ে কাটি, ছিঁড়ি।

কোন কিছু ঠিক নেই। যা মন চায়, তাই করি। কোন মতে সময়টা কাটিয়ে দিই। কাটাতে হয়। উপায় নেই। আর কোন রাস্তা নেই! গতি নেই। প্রথম প্রথম দু-চারদিন ভালই লাগত। এখন আর ভাল লাগে না। বিশ্রী লাগে। একলা একলা কতক্ষণ, কতদিন ভাল লাগে? আপনজন কেউ কাছে নেই, কিন্তু একজন পরিচিত, একজন বন্ধুও তো থাকতে পারত। চা খেতে খেতে একটু গল্প করতাম, হাসি-ঠাট্টা করতাম। হয়ত একটু ঘুরে ফিরেও বেড়াতে পারতাম। আরো কত কিছু পারতাম। অন্যান্য ডাক্তারদের মত অফ-ডে-তে কটক যেতে পারতাম। সিনেমা দেখতাম। রেস্তোরাঁয় খেতাম। পরমানন্দ অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য। আমাকে সম্মান করে। বেশ লাগে ওকে। কিন্তু ওকে নিয়ে তো অফ-ডে কাটান যায় না। কাটাই না।

দিনের বেলায় নিজের হৃদয় স্পন্দন শুনতে পাই না। যত সমস্যা এই রাত্রি নিয়ে। দিনের মত রাত্রি সর্বজনীন নয়। এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে! চরিত্র আছে মাদকতা আছে। দিনের বেলা ফিল্মের গান শোনা যায়, কিন্তু সত্যিকার গানের আসর হয় না। রাত্রের অন্ধকারে, নিস্তব্ধতার মধ্যে শিল্পী সুর রাত্রিতেই পায়, শ্রোতা মন পায়। সুর আর সাধনার মিল দিনের বেলা হতে পারে না। এই রাত্রিতেই সৃষ্টির কারিগর ফুল ফোটান, সাধক সাধনা করেন, মানুষ ভালবাসে। দিনের বেলোয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস খোলা থাকে কিন্তু শুভদৃষ্টির রোমাঞ্চ, বাসরঘরের আনন্দ, ফুলশয্যার অনুভূতির জন্য রাত্রির প্রয়োজন। আর এই রাত্রিতে আমি সুরহীন, ছন্দহীন জড় পদার্থের মত পড়ে থাকি এই সার্কিট হাউসে।

আমার এই দুঃখের কথা কষ্টের কথা কাউকে বলি না। বলতে পারি না, পারব না। চুপ করে বসে থাকি। আপন মনে ভাবি। ভাবতে ভাবতে জ্বালা অনুভব করি। নিঃসঙ্গতার জ্বালা, যৌবনের জ্বালা, ব্যর্থতার জ্বালা। মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। গাছপালা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু—সবারই একটা স্বাভাবিক ধর্ম আছে। হিমালয়ের কোলে জন্ম হলেও সমুদ্রর সঙ্গে মিলনের মধ্যেই নদীর সার্থকতা। আমি ডাক্তার হলেও মেয়ে। আমি যুবতী। স্বামীর ভালবাসায়, পুত্র-কন্যার কলরবের মধ্যে নিজেকে বিলীন করলেই আমার আনন্দ। সার্থকতা। স্বামী-পুত্র তো দূরের কথা, একটা বন্ধুও পর্যন্ত আমার নেই। দিনের মধ্যে বারো ঘণ্টা বোবা হয়ে বসে থাকি। থেকেছি। এই সার্কিট হাউসের বারান্দায় অথবা আমার ঘরে। কিন্তু আর কতকাল?

সার্কিট হাউসে যারা এসেছেন, একবেলা বা একরাত্রির জন্য, তাদের থেকে আমি দূরে থাকি। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দু-একজন আমাকে দেখেছেন! আমি বুঝতে পেরেছি। ভাল লাগেনি। ভাল লাগে চৌকিদারের ছোট্ট ছেলেটাকে। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি হাসি, ডাক দিই। ও আসে না। চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে। বিস্কুট-টফি দিলেও কাছে আসে না। আমাকে নিশ্চয়ই ওর ভাল লাগে না অথবা অদ্ভুত মনে হয়। ওর মার সঙ্গে যে আমার অনেক পার্থক্য। ওর মা স্বামীর সেবা করে, পুত্রের তদারক করে। আমি? চাকরি করি। আমি বসে থাকি। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। হয়ত ওর মায়ের মত স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাতেও পারি না। আমাকে ওর ভাল লাগবে কেন? ভাল লাগার তো কোন কারণ নেই।

একটা মাস তবু কাটল। আর যেন কাটতে চায় না। হাসপাতালে কাজের চাপ একটু বেশি হলে ভাল হতো। আর-এম্-ও হয়ে সারা সময় হাসপাতালে থাকলেই হয়ত ভাল থাকতাম। ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে থাকতাম। রোগীদের চিন্তায় নিজের চিন্তা অনেকটা ভুলতে পারতাম। তাও হলো না। এই এক মাসের মধ্যে মাত্র দুদিন সন্ধ্যার পর আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। একবার একটা লেবার কেসের জন্য প্রায় সারা রাত হাসপাতালের লেবার রুমে কাটিয়েছিলাম। রাত আড়াইটার পর মাত্র দুজন নার্স নিয়ে সিজারিয়ান করলাম। ঢেংকানল আসার পর ঐ একটি রাত শুধু অপরের চিন্তায় মশগুল ছিলাম। নিজের চিন্তায় নয়। সে এক স্মরণীয় রাত্রি! একদিন কটকে গিয়েছিলাম। জরুরী কেনাকাটার কাজ ছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না বলেই গিয়েছিলাম। তাছাড়া হেলথ ডিপার্টমেন্টের জীপ এক্সরে মেসিনের একটা পার্টস দিয়ে খালি ফেরত যাচ্ছিল বলেই আরো গিয়েছিলাম। 'র‍্যাভেনশ' কলেজের ধারের দোকানগুলো থেকে কেনাকাটা সেরেই ফিরেছিলাম। দুটো অফ্‌ডের সঙ্গে এক-আধ দিনের ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে কত জায়গা বেড়ান যায়। কিন্তু একলা একলা ইচ্ছা করে না। একলা একলা দুঃখ ভোগ করা যায়, আনন্দ উপভোগ সম্ভব নয়। কোনারকের ঐ মিথুন মূর্তির সামনে আমি নিঃসঙ্গ

নির্বাক হয়ে থাকব ? কোন অর্থ হয় না। তাই তো সার্কিট হাউসের সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার নিয়ে বসে থাকি। মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালী হয়ে পাহাড় আর সমুদ্রের প্রতি আমার দারুণ আকর্ষণ। বাংলাদেশে নদী-নালার অভাব নেই কিন্তু আমরা কলকাতায় বাস করে লেকের ধারে বসে কবিত্ব করি, প্রেম করি। ফিল্মের শুটিংও হয়। সমুদ্রের কথা ভাবলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সমুদ্রের এত কাছাকাছি এসেও সমুদ্র দেখতে পারছি না। পারব না।

আমি এখনও কোয়ার্টার পাই নি। আগের ডাক্তারবাবুর ফ্যামিলী আছে। ওর ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করছে। স্কুল ছাড়ালেই পড়াশুনার ক্ষতি। উনি আরো কিছুদিন কোয়ার্টার রাখতে চান। আমার মতামত চাওয়া হয়েছিল। আমি আপত্তি করিনি। এখানে তবু মানুষ দেখতে পাই, চৌকিদারের ছোট্ট ছেলেটাকে চকোলেট দিতে পারি, ওর বিস্ময়ভরা চোখদুটো দেখতে পারি। কোয়ার্টারে থাকলে আরো বিচ্ছিন্ন আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ব।

কদিন ধরেই ভাবছি পরমানন্দকে জিজ্ঞাসা করব কিন্তু করিনি। পারিনি, লজ্জা করেছে! ভেবেছি পরমানন্দ যদি কিছু ভাবে। হয়ত কিছু ভাববে না, কিন্তু ভাবাটাই স্বাভাবিক। সামনের দিকের কটেজে একজন ভদ্রলোককে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে, লেখাপড়া করতে দেখি। আমি এই বারান্দায় বসে বসে দেখতে পাই উনি টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। মনে হয় ভদ্রলোক বেশ সিরিয়াস। কাজটিও বোধহয় বেশ দায়িত্বপূর্ণ। বারান্দায় বসে বসে যতটুকু দেখতে পাই তাতে মনে হয় বয়স বেশি নয়। আমার বয়সী হবেন। চড়েরগড়ার অন্ধকারের মধ্যে ওকে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কাজ করতে দেখলে বেশ লাগে। অনেকবার ভেবেছি পরমানন্দকে জিজ্ঞাসা করব উনি কে ? কি করেন ? কতদিন থাকবেন ?

ভদ্রলোক ঠিক কবে এসেছেন জানতে পারিনি। রোজ হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় ঐ কটেজের পাশ দিয়ে আসি কিন্তু খেয়াল করিনি। তাছাড়া ঐ সময় নিশ্চয়ই কটেজের জানালাগুলো বন্ধ থাকে। খোলা জানালার ধারে ভদ্রলোককে কাজ করতে দেখলে একবার না একবার চোখ পড়তই। পড়েনি। উনি নিশ্চয়ই সারাদিন বাইরে কাটান। সন্ধ্যার অন্ধকারে কখন আসেন তাও টের পাই না। রাত্রি একটু গভীর হলেই ভদ্রলোককে দেখতে পাই। উনি আলো জ্বেলে কাজ করেন। আমি অন্ধকারে বসে থাকি। আমি ওকে দেখতে পাই। উনি আমাকে দেখতে পান না। আমি অন্ধকারের মানুষ। আমাকে হয়ত কেউ দেখতে পান না। ভালই।

না, না। কেউ যদি আমাকে দেখতে না পায়, তাহলে আমি বাঁচব কি ভাবে ? আমার অতীত দিনের বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে দেখছে না দেখতে চায় না। কিন্তু কোন নতুন বন্ধু, নতুন শুভাকাঙ্ক্ষী কি আমাকে দেখবে না ?

সাড়ে সাতটা-আটটার পরই পরমানন্দ বাড়ি যায়। তারপরই খেয়ে নিই। তবে

রোজ নয়। কোন তাগিদ তো নেই। দুপুরের পর হাসপাতাল থেকে এসে খাওয়া-দাওয়া করে রোজই একটু ঘুমিয়ে পড়ি। তাই রাত্রে ঘুম আসতে চায় না। বারান্দায় বসে বসেই দেখতে পাই বাসস্ট্যান্ডের কর্মচাঞ্চল্য বন্ধ হলো। সার্কিট হাউসের সামনে পায়চারী করতে করতে দেখতে পাই সারা শহরটা ঘুমের ঘোরে ঢুলে পড়ছে। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা দিয়ে টুং টুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে সাইকেল রিকসা যাতায়াত করছে। অথবা দু-একটা সাইকেল। রাত একটু বেশি হলে তাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু মাঝে মাঝে মাল বোঝাই লরী বিকট আওয়াজ করতে করতে ছুটে যায় সম্বলপুরের দিকে।

আমার দুচোখে তখনও ঘুম আসে না। একটু বসি, একটু ঘুরে বেড়াই। আর বার বার দৃষ্টিটা চলে যায় সামনের কটেজের দিকে। ঐ ভদ্রলোকের কাছে।

বেশ লাগে দেখতে। এতদিন কাউকে দেখতে পেতাম না। দেখিনি। এখন ঐ কটেজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক সময় কেটে যায়। আগে আমার দৃষ্টি হাহাকার করে ঘুরে বেড়াত এই চড়েরগড়ার অন্ধকার পাহাড়ে। এখন একটা অবলম্বন পেয়েছি।

আমি ওকে দেখি। রোজ। সন্ধ্যায়, রাত্রিতে। কখনও বারান্দায় বসে, কখনও ঐ কটেজের একটু দূর দিয়ে পায়চারী করতে করতে। জানি না উনি আমাকে দেখেছেন কিনা। মনে হয় দেখেন নি। তাহলে নিশ্চয়ই আলাপ করতেন। আমার আলাপ করতে ইচ্ছা করে। ভদ্রলোককে দেখতে বেশ। বেশ শান্ত সমাহিত। চোখেমুখে কোথাও উগ্রতার ছাপ নেই। কোন মালিন্য নেই।

গত কয়েক মাসে আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে সুনীলকে দেখলেই কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করতাম। সারা শরীরে একটা বিচিত্র শিহরণ বোধ করতাম। ওকে বলতাম না। বললেই আমার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। এখন আর সেই শিহরণ বোধ করি না। দেহের দাবী, রক্ত মাংসের দাবী আজ চাপা পড়েছে। চাপা দিয়েছি। কিন্তু মনের ক্ষুধা, শূন্যতা বড় বেশি পীড়া দেয়। একলা থাকলেই মনের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করি। একজন বন্ধু পেলে একটু হাসতে পারলে, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলে নিশ্চয়ই ঐ অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতাম। কিন্তু ভগবান বোধহয় আমাকে কোন যন্ত্রণার হাত থেকেই রেহাই দেবেন না।

কটেজের আলো নিভে গেলে আমি আমার ঘরে যাই, শুয়ে পড়ি। এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু ঘুমের মধ্যেও ঐ কটেজের ছোট্ট টেবিল ল্যাম্পের আলো যেন আমাকে ইসারা করে ডাকে।

আগে কোনদিন আমি দুপুরে ঘুমুতাম না। ছাত্রজীবনের পরেও না। হাসপাতাল থেকে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে অনেক বেলা হতো। বেশ ক্লান্তবোধ করতাম, কিন্তু তবুও ঘুমুতাম না। ঘুমুতে পারতাম না, সুনীল ঘুমুতে দিত না।

কিছুতেই না। আমাদের খাওয়াদাওয়া মিটলে চাকরটা বাইরে যেত। রোজ। ফিরত পাঁচটার সময়। চাকরটা চলে যাবার পরই শুতে যেতাম বিশ্রাম করব বলে, কিন্তু বিশ্রামের চাইতে পরিশ্রমই বেশি হতো অধিকাংশ দিন। আমি ওকে বকাবকি করতাম।

'তুমি কি বল তো?'

'কেন? কি করলাম?' ও যেন কিছু বুঝতো না।

'তুমি ভীষণ অসভ্য হয়েছ।'

আমার অভিযোগ শুনে ও অবাক হতো, 'অসভ্য? কর্তব্য পালনকে তুমি অসভ্যতা বলো?'

'এত কর্তব্যপরায়ণ হতে তোমাকে কে বলেছে?'

'যার কর্তব্যবোধ আছে, তাকে কিছু বলতে হয় না!'

'তাই নাকি?'

ও আমার গাল টিপে বলত, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বাইরের আকাশে সূর্য ঢলে পড়ত কিন্তু আমার ঐ ছোট্ট শোবার ঘরের মনের আকাশে ঐ অপরাহ্ন বেলায় নতুন করে সূর্য উঠত। আনন্দে খুশিতে ভরে যেত আমার মন। আমার সত্ত্বা। এখন আমার মনের আকাশে নিত্য অমাবস্যার অন্ধকার। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর অপরাহ্ন বেলায় ম্লান সূর্যের আলোয় আমার মন ভরে যায়। রোদ্দুরের মধ্যে অতখানি পথ হেঁটে এসে চড়েরগড়ার পাহাড়ে উঠতে উঠতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এত ক্ষিদে পায় যে হাসপাতালের জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোবার ধৈর্য ধরতে পারি না। কোন কোন দিন হাত-মুখে সাবান দিয়েই খেতে বসি। এত ক্ষিদে পায় যে, খেতে বসার সময় রোজ মনে হয় খাবার কম পড়বে কিন্তু রোজই খাবার বেশি হয়। পড়ে থাকে।

পরমানন্দ বলে, 'আজও ভাত মাছ পড়ে রইল?'

আমি হাসতে হাসতে জবাব দিই, 'অনেক খেয়েছি। আর পারলাম না।'

'রাত্রে তো খান না বললেই চলে। তারপর দিনের বেলায়ও যদি ভাল করে খাওয়া-দাওয়া না করেন, তাহলে শরীর রাখবেন কি করে?'

দিনের বেলা তবু ক্ষিদে পায়। খাই। রাত্রে সত্যি ক্ষিদে পায় না। সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা চুপচাপ বসে থাকলে ক্ষিদে পাবে কেন? তাছাড়া একলা একলা খেতে ভাল লাগে না। অভ্যাস নেই। চিরকাল ভাই-বোনেরা এক সঙ্গে খেয়েছি। তারপর, স্বল্পস্থায়ী সংসার জীবনেও কোনদিন একলা খাই নি। একলা একলা খাওয়া-দাওয়া করতে, বেড়াতে, সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না। রাত্রে তাই খেতে ভাল লাগে না। প্রায়ই খাই না। খেলেও অতি সামান্য। তাও আবার অনেক রাতে।

প্রথম যেদিন বর্ষা নামল সেই দিনই প্রথম খেয়াল করলাম মন্থর গতিতেও জীবন এগিয়ে চলেছে। চলেছে। গ্রীষ্মের শেষ হয়েছে। আকাশের রং বদলেছে।

চার পাশের গাছপালা লতাপাতা আরো সবুজ হয়েছে। আমার ঢেংকানল বাস তিন মাস পূর্ণ হয়ে গেল। এই তিন মাসে নিজেকে আরো বেশি গুটিয়ে এনেছি। হাসপাতালের বাইরে আমার কোন জীবন নেই। অস্তিত্ব নেই। চোখের জল ফেলি না ঠিকই কিন্তু হাহাকার আর হতাশার পাহাড় জমে উঠেছে মনের মধ্যে। বুকের মধ্যে। দিবানিদ্রার পর মন্ত্রমুগ্ধের মত বারান্দায় এসে বসি। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ঐ দূরের রহস্য-ভরা যতননগর প্যালেসের দিকে। চোখের দৃষ্টিটা চারদিকে ঘুরে বেড়ালেও কিছু দেখতে পাই না। চোখ থাকলেই কি সব কিছু দেখা যায়?

না। কখনই না। আমি দেখতে পাই না। দেখতে চাই না। বাইরের দুনিয়ার কিছু দেখতে চাই না। ভাল লাগে না। ভাল লাগার মন হারিয়েছি। ভাল লাগার দিনগুলিও ফুরিয়ে গেছে।

সত্যিই কি ফুরিয়ে গেছে? নাকি চাপা পড়ে আছে? সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কি আর কোন দিন আমার দেহ মন ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়াবে না?

জানি না। বলতে পারি না। হলফ করে বলার মত সাহস বা ক্ষমতা আমার নেই। কারুরই নেই। মানুষের মনের কথা কি বলা যায়?

অসম্ভব। তাছাড়া আমার বয়সই বা কি? মনের আকাশ.ঘন কালো অন্ধকার মেঘে ভরে গেলেও দেহের মধ্যে যৌবনের আগুন লুকিয়ে আছে। চাপা পড়ে আছে। আমি মাঝে মাঝে বেশ বুঝতে পারি আমার দেহটা একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। ভেতরে গরম লাভা টগবগ করে ফুটছে। নিত্য। অহর্নিশি। দেখতে দেখতে অনেকদিন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছি। আর যেন পারছি না। সত্যি পারছি না। হাসপাতালে কত গরীব-দুঃখী মেয়ে চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসে। ওদের বাবা-মা বা স্বামীরা আমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরে। সকাতর অনুরোধ জানায় সুচিকিৎসার জন্য, সত্বর রোগমুক্তিব জন্য। সিজারিয়ান করার আগে স্বামীকে বণ্ডে সই করতে বললে ওরা যেন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। ওরা সাধারণ মানুষ, ওরা ভালবেসে ভালবাসা পায়। আমি জীবনে যা পেয়েছি তার অনেক কিছুই ওরা পায় নি। পাবে না। তবুও ওরা হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়। জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সংসারকে বাঁচায়। ওরা বুঝতে পারে না আমি ওদের চাইতে কত ছোট কত ক্ষুদ্র। কত অভাগা। ভাগ্যহীনা। আজ আমি যদি অসুস্থ হই, আমাকে যদি অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ ডাক্তারের হাত ধরে আমার জীবন ভিক্ষা চাইবে না, কেউ উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে অপারেশন থিয়েটারের বাইরে অপেক্ষা করবে না। যদি টেবিলেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলি, তাহলে কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না।

শুধু কি তাই? কেউ একটা পোস্টকার্ড লিখেও আমার খোঁজ নেয় না। আমার. বাঁচা-মরা ভাল-মন্দয় কারুর কিছু আসে যায় না।

শুয়ে শুয়ে এই সবই ভাবছিলাম। হঠাৎ মেরিনার কথা মনে হলো। বালিশের

তলা থেকে ওর লেখা চিঠিগুলো বের করে আবার পড়লাম। কয়েকবার। শেষ চিঠিটাই শুধু বড়। অন্যগুলো ছোট ছোট। পিকচার পোস্টকার্ডে লেখা। শেষ চিঠিটায় অনেক কথা লিখেছে। ওর নিজের কথা আমার কথা। ...অনেক দিন অনেকের সঙ্গে খেলা করলাম। আর ভাল লাগছে না! বিকেলে রং মেখে ভাল ভাল দামী দামী মিনিস্কার্ট পরে নিত্য নতুন বয়-ফ্রেন্ডের হাত ধরে বেড়াতে, গল্প করতে, নাচতে বা ড্রিঙ্ক করে এক বিছানায় রাত কাটাতে আর ভাল লাগে না। মন ভরে না। তৃপ্তি পাই না। তাই রোজ সন্ধ্যার অভিসার বন্ধ করেছি। কোন ডাক্তারকে ঘরে ঢুকতে দিই না। দেব না। ওরা চুরি করে মধু খেতে জানে। ভালবাসতে জানে না। জানবে না। পারবে না।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম।

...জান চিত্রলেখা, এবার বোধহয় আমি সংসার করব। আমারই মত একজন নিঃসঙ্গ মানুষের দেখা পেয়েছি। বয়স একটু বেশি। তবে স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল। ট্রাম-কোম্পানীতে অত্যন্ত সাধারণ চাকরি করে। ড্রিঙ্ক করা তো দূরের কথা, সিগারেট পর্যন্ত খায় না। নেশা শুধু বই পড়ার আর সিনেমা দেখার। ও এখন একজনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকে। বিয়ের পর আমি এই আপার্টমেন্টে থাকব না। এই বাড়ির পরিবেশ বড় খারাপ। এখানে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে রাত কাটান যায় কিন্তু স্বামীকে নিয়ে সংসার করা যায় না। তাই একটা ছোট ফ্ল্যাটের চেষ্টায় আছি।

মেরিনার চিঠিটা পড়তে বড় ভাল লাগছিল। এই পৃথিবীতে ওর চাইতে আপন আমার আর কেউই নেই। আমার জীবনের সব চাইতে অন্ধকার দিনে শুধু মেরিনাই আমার পাশে ছিল। আর কেউ নয়। দীর্ঘ চিঠির শেষে ও আমাকে লিখেছে, তোমাকে নিঃসঙ্গ রেখে আমি শান্তিতে স্বামীর ঘর করতে পারব না। তুমি অতীতকে ভুলতে পারবে না জানি। তবুও বলব এমন করে নিজেকে আর কষ্ট দিও না। কোন লাভ নেই। তাছাড়া আমরা মেয়ে। কখন কোথা থেকে বিপদ আসবে কেউ বলতে পারে না। নিঃসঙ্গ থাকলে একদিন না একদিন বিপদ আসবেই। সেই অপ্রত্যাশিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। লক্ষ্মীটি, সিস্টার আমার, তুমি আবার সংসারী ও। ভগবান তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন। তোমাকে আর দুঃখ ভোগ করতে হবে না। এবার তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কিছু অঘটন ঘটে। আগে বা পরে। কারুর কাহিনী জানা যায়, কারুর কাহিনী জানা যায় না। রিমেম্বার গড। রিমেম্বার ফাদার জেসাস্। তিনি তোমাকে দেখবেন।

চিঠিগুলো বালিশের তলায় রেখে টেবিল ল্যাম্প অফ করে দিলাম, কিন্তু ঘুম এলো না। শুয়ে শুয়ে মেরিনার কথা মেরিনার চিঠির কথাই ভাবলাম। বোধহয় ও ঠিকই লিখেছে। এমনভাবে থাকা ঠিক নয়। তাছাড়া কি প্রয়োজন? যাদের জন্য আমি এই দুঃখ, এই কষ্ট, এই যন্ত্রণা ভোগ করছি, তারা তো নির্বিকার হয়ে সংসারের সব আনন্দ, সব রস উপভোগ করছে। তবে আমি কেন একলা

একলা শান্তি পাব? এমন দাহ সহ্য করব? যাদের জন্য আমি ঘুমুতে পারি ন তারা তো নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তবে আমি কেন বিনিদ্র রজনী যাপন করব? নিজে বঞ্চিত রেখে কে কবে সুখী হয়েছে?

জানি না। ঠিক বুঝতে পারি না কোনটা কি, কোনটা অন্যায়। পাশের খো জানালা দিয়ে বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম, ম মনে বিচার করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। জবাব পেলাম না।

শুধু সে রাত্রে নয়, পরের কয়েক দিন ধরে শুধু মেরিনার চিঠির কথা ভাবলাম। সব সময়। হাসপাতালে, যাতায়াতের পথে, চড়েরগড়া পাহাড়ে উঠতে নামতে, গণেশ বাজার, মহাবীর বাজার, কাঞ্চন বাজার, আনন্দবাজারের পথে পথে ঐ এক চিন্তায় মশগুল হয়ে রইলাম দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

অ্যাডাভোকেট নটবরবাবুর বাড়িতে গিয়ে শুধু কিছুক্ষণের জন্য ভুলেছিলাম নেমন্তন্ন খেতে যাবার মত মনের অবস্থা আমার নয়, তবু গিয়েছিলাম। না গি উপায় ছিল না। নটবরবাবুর স্ত্রীর দুবার মিস্‌ক্যারেজ হয়েছে। দ্বিতীয়বার বে অ্যাডভান্স স্টেজে। এবার ওর ভীষণ ভয় ছিল। নটবরবাবুর স্ত্রী আমারই পেশে ছিলেন। আমিই ডেলিভারী করিয়েছি। তবে সি-এম-ও ডাঃ পট্টনায়ক নিজেও যথে ইন্টারেস্ট নিয়েছিলেন। ছেলেটি এক মাসের হলো। খুশিতে নটবরবাবু হাসপাতালে সব ডাক্তারদের নেমন্তন্ন করেছেন। এর আগে হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ প্রেজেনটেশন দিয়েছেন। অ্যাডভোকেট হিসাবে নটবরবাবুর প্রচুর খ্যাতি। বালেশ্বর সম্বলপুর থেকে গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত ওকে কেসে যেতে হয়। প্রচুর রোজগার করে খ্যাতি যশ, অর্থ থাকা সত্ত্বেও একটা সন্তানের অভাবে ভদ্রলোক সুখী ছিলেন ন

নটবরবাবু, সস্ত্রীক এসে বলে গিয়েছিলেন। তাছাড়া হাসপাতালের সব ডাক্তা যেখানে যাচ্ছে, সেখানে আমার না যাবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। গিয়েছিলাম ভালই করেছিলাম। ঢেংকানলে আসবার পর এমন আনন্দ আর কোন দিন পা নি। খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব শেষ করে উঠতে উঠতে প্রায় দশটা বেজে গেল

ডাঃ পট্টনায়েকের গাড়ি করে চড়েরগড়ার পাশে খেলার মাঠের ধারে নে পড়লাম। উনি সার্কিট হাউস পর্যন্ত আসতে চেয়েছিলেন। আমি বারণ করলাম হাজার হোক বয়েস হয়েছে। ওকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া কতটুকুই পথ।

ডাঃ পট্টনায়কের গাড়িটা যেতে না যেতেই টিপ-টিপ বৃষ্টি শুরু হলো আঁচলটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে একটু জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম বাস স্ট্যান্ডের মুখে আসতেই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় বড় হলো। আ আরো একটু তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এত বে খাওয়ার পর জোরে জোরে পাহাড়ে ওঠা সহজ কথা নয়। অফিসার্স ক্লা পিছনে ফেলে চড়েরগড়া পাহাড়ের মাঝামাঝি আসতেই একবার ওপরে

দিকে তাকালাম। ঐ দিকের কটেজে আলো দেখলাম, কিন্তু ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম না। কয়েক দিনই দেখতে পাই না। হয়ত কোথাও গিয়েছিলেন। অথবা অন্য কোন কারণে দেখতে পাই নি।

ঐ টিপ-টিপ বৃষ্টিতে আমি বেশ ভিজে গেছি। মাথার উপর থেকে ভেজা আঁচল ফেলে দিয়েছি। বৃষ্টিতে শাড়ি-ব্লাউজ বেশ ভিজে গেছে। হাঁটতে গিয়ে শাড়ি পায়ে আটকে আটকে যাচ্ছে। ব্লাউজটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। এখন রাত্রি। বেশ অন্ধকার। দূরের রাস্তার আলো এখন পৌঁছতে পারছে না। সার্কিট হাউসের আলোও এতদূর আসে না। ভালই। দিনের বেলা ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ পরে গেলে সবার নজরে পড়ত। কলকাতায় বৃষ্টির দিনে ভেজা কাপড় চোপড় পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভীষণ অস্বস্তিবোধ করতাম। এখন তেমন অস্বস্তিবোধ করার কারণ না থাকলেও পরমানন্দ বা অন্যান্যদের সামনে যেতে নিশ্চয়ই লজ্জাবোধ করতাম। এখন পরমানন্দ নেই। বাড়ি চলে গেছে। সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই ও বাড়ি যায়। এখন শুধু চৌকিদার আছে। ও বড় ড্রইংরুমের দরজায় বসে থাকে।

এইসব ভাবতে ভাবতে কটেজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়িই যাচ্ছিলাম। কটেজের দিকে তাকাই নি। তাকাবার প্রয়োজনবোধ করি নি। কটেজটাকে পিছনে রেখে সার্কিট হাউসের বারান্দায় উঠতে যাচ্ছি ঠিক এমন সময় অদ্ভুত গলায় পরমানন্দের ডাক শুনলাম, দিদি!

এত রাত্রে পরমানন্দ ডাকছে? চমকে উঠলাম। একটু ভয়ও পেলাম। মুহূর্তের জন্য মনে হলো দৌড়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যাই, কিন্তু পারলাম না। থমকে দাঁড়ালাম।

'দিদি, একটু এদিকে আসুন।'

আবার পরমানন্দের গলা। মনে হলো ও যেন কোন বিপদে পড়েছে। পিছন ফিরে তাকালাম। দেখি সামনের কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ঐ ভেজা কাপড়েই আস্তে আস্তে কটেজের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজার সামনে আসতেই দেখলাম, খাটের ওপর ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে ছটফট করছেন।

'দিদি চ্যাটার্জি সাহেব খুব অসুস্থ।'

'কে?'

পরমানন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, 'চ্যাটার্জি সাহেব।'

আমি এবার ঘরের দরজায় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কি হয়েছে?'

'বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছেন। তবে আজ বড় বাড়াবাড়ি। খুব ছটফট করছেন। মাঝে মাঝে ভুল বকছেন।'

ওর কথাটা শেষ করতে দিলাম না। বললাম, 'আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।'

'একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। আমি গিয়ে রান্না করলে বাচ্চারা খাবে।'

পরমানন্দের স্ত্রীর শরীর খারাপ, তা আমি জানি। আমি নিজেই তার চিকিৎসা

করছি। দু-সপ্তাহের জন্য হাঁটা-চলা একেবারে বন্ধ। আমি তাই আর কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলে স্টেথোটা হাতে করে কটেজে এলাম।

'কদিন ধরে জ্বর হচ্ছে, জান?'

'ঠিক জানি না, তবে বেশ কিছুদিন ধরেই অল্প অল্প জ্বরে ভুগছেন।'

'কোন ওষুধ খেয়েছেন কি?'

'মনে হয় না।' পরমানন্দ একটু থেমে থেমে বলল, 'আমি হাসপাতালে যেতে বলেছিলাম কিন্তু গেলেন না।'

'কেন?'

উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ওষুধ খেলেই তো ভাল হয়ে যাব।'

আমি কিছু বললাম না। শুধু একটু হাসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। নানা কারণে এমন জ্বর হতে পারে। টিউবারকিউলিসিস্ থেকে ফাইলেরিয়া পর্যন্ত। স্টেথোটা টেবিলে রেখে মিঃ চ্যাটার্জীর পাল্‌স দেখলাম। হাই টেম্পারেচার। হানড্রেড অ্যান্ড টু-থ্রি তো হবেই।

'দিদি।'

পরমানন্দ বাড়ি যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। বললাম, 'বলো।'

'জমাদার আর চৌকিদার এখানেই থাকবে। আমি এবার যাই।'

ওকে যেতে দিতেও ইচ্ছা করছিল না, আটকে রাখতেও মন চাইল না।

'যাও।'

পরমানন্দ অনেকটা অপরাধীর মত অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপেই ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। ইয়ংম্যান। পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি বয়েস হবে না। দেখতে খুব সুন্দর। কদিনের অসুস্থতার জন্য চোখের নীচে কালি পড়েছে। জ্বরের ঘোরে ভদ্রলোক ছটফট করছেন। এই রাত্রে এই রকম একজন রোগীকে নিয়ে কি করব, তাই ভাবছিলাম। হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব? যিনি ডাক্তার দেখাতেই চান না, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করব? তাছাড়া এত রাত্রে তো নিয়ে যাওয়াই যাবে না।

আমি তখনও ভাবছি। ভাবছি কি করব। মিঃ চ্যাটার্জি হঠাৎ একবার চীৎকার করে উঠলেন, মাগো!

হয়ত মাকে ডাকছেন। অথবা এমনি-এমনিই বলে উঠছেন। মানুষ বিপদে পড়লে, অসহায় হয়ে পড়লে মাকে স্মরণ করে। ইনিও হয়ত তাই করছেন।

পরমানন্দের কাছে শুনেছিলাম ভদ্রলোককে নানা জায়গায় খুব ঘুরতে হয়। তাহলে হয়ত পুরী জেলাতেও ঘুরেছেন। ভদ্রলোকের ফাইলেরিয়া হলো না তো? এমনি জ্বর হতে হতেই তো ফাইলেরিয়া হয়। তাছাড়া মশারী দেখতে পাচ্ছি না।

মশারী টাঙাবার কোন ব্যবস্থাও নেই। ঘরের চারপাশে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতেই এক জোড়া কাবুলি আর একজোড়া স্যান্ডেল দেখতে পেলাম। কাবুলি জুতোর কাদা-মাটি দেখেই বুঝলাম, ঐ জুতো পরেই ঘোরাঘুরি করেন। বুট জুতো-মোজা পড়লে পায় মশা কামড়াতে পারে না।

মিঃ চ্যাটার্জি আবার 'মাগো', মাগো করে চীৎকার করে উঠলেন।

ওষুধপত্র দেবার আগে ব্লাড পরীক্ষা করার দরকার। ফাইলেরিয়ার জন্য মিডনাইটের পরে ব্লাড নিতে হয়। আমার কাজে স্টেথো ছাড়া আর কিছুই দরকার হয় না। চৌকিদার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ওকে রেখে আমি টেলিফোন করতে গেলাম। তখনও টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এক দৌড়ে সার্কিট হাউসের বড় ড্রইংরুমে গেলাম। হাসপাতালে টেলিফোন করে কয়েকটা ওষুধপত্র ও ব্লাড নেবার জন্য নিডল স্লাইড ইত্যাদি ঠিক করে রাখতে বললাম। ঐ টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে আবার এক দৌড়ে মিঃ চ্যাটার্জির কটেজে এলাম। চৌকিদারকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। জমাদার বলল, 'মা আমি বারান্দায় বসে আছি। দরকার হলেই ডাকবেন।'

'আচ্ছা।'

এবার স্টেথো দিয়ে মিঃ চ্যাটার্জির বুক পরীক্ষা করলাম। না, কোন কম্‌প্লিকেশন নেই। ভালই। ফাইলেরিয়ায় পায়ের জয়েন্টগুলো ফুলে যায়। তাই ওর পায়ের জয়েন্টগুলো টিপে টিপে দেখছিলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না বলে বার বার দেখছিলাম। উনি জ্বরের ঘোরে ছটফট করছিলেন। মাঝে মাঝে নানারকম চীৎকারও করছিলেন। আমি চেয়ারটা টেনে চুপ করে বসে রইলাম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না। কে এই মিঃ চ্যাটার্জি? পুরো নাম কি? কি কাজ করেন? বাড়ি কোথায়? কোথায় ওর বাবা-মা ভাই-বোন-স্ত্রী?

স্ত্রী?

হ্যাঁ, হ্যাঁ স্ত্রী। মানসীই ওর স্ত্রী। যখনই কষ্ট হচ্ছে তখনই মানসীকে বা মাকে ডাকছেন। মনে হয় মার খুব আদরের ছেলে। তা না হলে এত বড় ছেলে কখনও মিনিটে মিনিটে মাগো মাগো বলে চীৎকার করে? টুকরো টুকরো কথা শুনে মনে হচ্ছে অনেক দিন মানসীকে দেখেন নি। মানসীর জন্য ওর মনটা বড়ই ব্যাকুল। এবার সমবেদনায় মন ভরে গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো মানসী এসেই ওর দেখাশুনা করুক। আমার এই ঝামেলা সহ্য করার কি দরকার?

ডাক্তার-নার্সরা রোগীর চিকিৎসা করে, সেবা করে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পুঁজ-রক্ত থেকে বেড-প্যান পর্যন্ত পরিষ্কার করতে হয় ডাক্তার-নার্সকে। অথচ কোন রোগী জ্ঞানে অজ্ঞানে একটি বারের জন্য ভুল করেও ডাক্তার-নার্সকে মনে করে না, ডাকে না। ডাকে প্রিয়জনকে, যারা দূরে থাকে, কাছে আসে না, কোন দায়-দায়িত্ব বহন করে না। হাসপাতালে চাকরি করতে হলে এসব অবজ্ঞা,

অকৃতজ্ঞতা সহ্য করতেই হয়। না করে উপায় নেই। কিন্তু এখন কেন করব? আমার কি দায় পড়েছে চ্যাটার্জী সাহেবের সেবা করার?

'একটু জল। জল।' শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভেজাবার চেষ্টা করতে করতে উনি জল চাইলেন।

জল দেবার জন্য চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা কুঁজো আর একটা বড় কাচের গেলাস পেলাম। অত বড় গেলাসে করে জল খাওয়ান যায়? তাছাড়া কুঁজোর জল কতদিন পাল্টান হয় না, কে জানে? দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে এক গেলাস জল আর একটা কাপ নিয়ে এলাম।

বাঁ হাত দিয়ে ওর মাথা ধরে ডান হাতে জলের কাপ নিয়ে ডাকলাম, জল খেয়ে নিন।

কোন জবাব পেলাম না। ওর মাথা ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বললাম, জল খাবেন না? নিন, জল খান।

মিঃ চ্যাটার্জী দু-এক ঢোক জল খেয়েই হঠাৎ মুখ বন্ধ করলেন। খানিকটা জল মুখ থেকে গলায় বুকে গড়িয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাতের কাছে কোন তোয়ালে না পেয়ে বাধ্য হয়েই আঁচল দিয়ে গলার বুকের জল মুছিয়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে চৌকিদার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে এগারটা বাজে। ঘণ্টাখানেকের আগে ব্লাড নেওয়া যাবে না। ভাবলাম খাওয়া-দাওয়া করে আসি। আবার ভাবলাম, না থাক। পরেই যাব। জমাদার-চৌকিদারকে বললাম, 'তোমরা যাও। আমি যাবার সময় তোমাদের ডেকে দেব।'

চৌকিদার কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জী হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, 'আঃ আলোটা সরাও না।'

চৌকিদারকে কিছু বলার আগেই ও টেবিল ল্যাম্পটা টেবিলের তলায় রাখল।

ওরা চলে গেল। আমি চুপ করে চেয়ারে বসে রইলাম। আবছা আলোয় মিঃ চ্যাটার্জীর কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ওর অসহায় অবস্থার কথা। ওর রোগ যন্ত্রণার কথা। ওর মাগোর কথা, মানসীর কথা। ওর চীৎকারে আর চিন্তা করতে পারলাম না। 'একটু মাথায় হাত দাও না উঃ বাবা! কি যন্ত্রণা।'

হাসলাম। আপন মনেই হাসলাম। আমাকে উনি কি ভেবেছেন যে এমন করে হুকুম করছেন? জ্বর সেরে যাবার পর কি এসব মনে থাকবে? ঘোড়ার ডিম মনে থাকবে।

চেয়ারটা টেনে খাটের পাশে নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম, দারুণ জ্বর। আগের চাইতে জ্বর আরো বেড়েছে। আবার দৌড়ে ঘরে গিয়ে আমার দুটো রুমাল এনে ওর কপালে জল-পটি দিচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে উনি আমার হাতটা চেপে ধরে নানা কথা বলছিলেন।

'আমি কি বাঁচব?'

'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপ করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরমানন্দ, মানসী এসেছে নাকি?'

'কি জবাব দেব। আমি কি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি?'

'মানসী?'

চুপ করে রইলাম।

'চুপ করে আছ কেন? মাথায় হাত দিতে বলেছি বলে রাগ করেছ?'

আমি কিছু না বলে আগের মতই ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ হাতের ঘড়িটায় নজর পড়ল। এবার তো ব্লাড নিতে হবে। দরজা দিয়ে মুখ বের করে চৌকিদারকে ডাকলাম। কোন জবাব পেলাম না। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন বৃষ্টিতে ঘুমিয়ে পড়াই স্বাভাবিক। সব ঠিক ঠাক করে কোন মতে একলা একলাই ব্লাড নিলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উনি বিকট চীৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। নিশ্চয়ই ওর ব্যথা লেগেছে। ওর কষ্ট হয়েছে। রোগীর ব্যথা লাগলে, কষ্ট হলে অনেক সময় ডাক্তার নার্সকে জড়িয়ে ধরে, জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে। কখনও কখনও বিপরীতটাও ঘটে। কিল, ঘুষি, লাথি পর্যন্ত। গালাগালির তো কথাই নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ-যন্ত্রণা রাত্রে বাড়ে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারেই এইসব ক্ষণস্থায়ী নাটক হাসপাতালে, রোগীর রোগশয্যায় অভিনীত হয়। দিনের আলোয় রোগ-যন্ত্রণা কমার পর রোগী এসব মনে রাখে না। রাখতে চায় না। পারে না। মিঃ চ্যাটার্জীও রাখবেন না কিন্তু আমি ভুলব কেমন করে? রাতের অন্ধকারে এমন করে জড়িয়ে ধরলে সে কথা, সে স্মৃতি কি ভোলা যায়?

না। অসম্ভব। তাছাড়া দীর্ঘকাল পর একজন পুরুষের আলিঙ্গনে যে আমার সারা শরীরে বিচিত্র অনুভূতির তরঙ্গ উঠেছিল, সে-কথা ভুলব কেমন করে? অনেকদিন পর এমন অনুভূতির স্বাদ পেলাম। ভালই লাগল, তাই না?

জানি না।

নিজের কাছেও স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করলাম। হয়ত ভয় পেলাম। দ্বিধা সঙ্কোচ করলাম। হয়ত সব কিছুই। মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছুই হয়, ঘটে, যা স্বীকার করা যায় না। বলা যায় না। হয়ত মেনে নেওয়াও যায় না। কিন্তু তাতে কি আসে? যা ঘটেছে, ঘটল, তা তো মিথ্যে হয়ে যায় না। হতে পারে না।

ভেবেছিলাম ব্লাড নেবার পর নিজের ঘরে চলে যাব। নিশ্চিন্তে ঘুমোব। আরাম করে ঘুমোব কিন্তু পারলাম কি? এই বিছানার এক ধারে বসে বসে সারা রাত্রি ওর মাথায় হাত দেবার কথা তো ভাবিনি। ভাবিনি তো অনেক কিছুই। ভেবেছিলাম কি এই অপরিচিত অসহায় লোকটির জন্য এমন দরদবোধ করব?

না, এসব কিছুই ভাবিনি।

টিউবারকিউলিসিস বা ফাইলেরিয়া নয়, হয়েছিল প্যারাটাইফয়েড। তবু পুরো দু সপ্তাহ ভুগতে হলো সাগরবাবুকে। পরমানন্দের সেবাযত্নের তুলনা হয় না। পরমাত্মীয়কে হার মানিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাই সব কিছু করত। অন্য কাউকে কিছু করতে হয়নি। হতো না। দিত না। আমাকেও না। দুপুরের পর হাসপাতাল থেকে ফিরে ঘরে না ঢুকেই কটেজে গেছি কিন্তু পরমানন্দ বসতে দেয়নি। বলেছে, যান দিদি, এখন আপনি খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করুন।

সত্যি আমি খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করতাম। ঘুমুতাম। ঘুম না এলেও শুয়ে থাকতাম। উঠতে উঠতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। একটু হাত-মুখে জল দিয়ে, সাগরবাবুর বিছানার পাশে চেয়ারটায় বসতাম। বসতাম অনেক রাত পর্যন্ত। উনি ভাল করে ঘুমিয়ে পড়ার পরই আসতাম। তার আগে নয়। কোনদিনই নয়। আমি শুতে যাবার সময় চৌকিদারকে ডেকে দিতাম। ও সারারাত সাগরবাবুর ঘরের দরজায় চেয়ার নিয়ে বসে থাকত।

এই ছিল নিত্যকার নিয়ম। ব্যতিক্রম হয়েছিল বৈকি। পরমানন্দের স্ত্রীর শরীর একদিন হঠাৎ বেশি খারাপ হওয়ায় ও আসতে পারল না। সেদিন আমিও হাসপাতালে গেলাম না। যেতে পারলাম না। তাছাড়া তখন ওর বেশ বাড়াবাড়ি। অমন একজন সিরিয়ান পেশেন্টকে একলা ফেলে যাওয়া সমীচীন মনে করিনি। নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে একলা একলা বিদেশে চাকরি করতে এসে এমন বিপদে তো আমিও পড়তে পারি। আরো ব্যতিক্রম হয়েছিল। এক রাত্রি সাগরবাবুর বিছানার পাশে বসেই আমাকে কাটাতে হয়েছে। সে-রাত্রে আমি নিজেও বেশ নার্ভাস হয়েছিলাম। ভোর হতে না হতেই ডাঃ পট্টনায়ককে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

স্বপ্নের মত দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। সত্যি স্বপ্ন। একলা একলা বেশ ছিলাম। পনের দিন সাগরবাবুর এত কাছাকাছি থেকে মনটাও কেমন যেন বদলে গেছে। রোগের যন্ত্রণায় কখনও উনি চেঁচামেচি করেছেন, কখনও বা আমার হাতদুটো চেপে ধরেছেন। কখনও আমি ওকে বকে ওষুধ খাইয়েছি, কখনও বা ওর মাথায় গায় হাত দিয়ে গল্প করে ঘুম পাড়িয়েছি। আরো কত কি হয়েছে। উনি ঘুমিয়ে পড়লে আমি হাঁ করে মুখের দিকে চেয়েছি। ওকে দেখেছি। আঙুল দিয়ে আলতো করে ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়েছি। যেদিন দারুণ বৃষ্টি হলো, সেদিন কি কাণ্ডটাই হলো!

দুপুর থেকেই বৃষ্টি শুরু হলো। দারুণ বৃষ্টি। আমি হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় ছাতি মাথায় দিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না। সম্পূর্ণ ভাবে ভিজে গেলাম। বিকেলবেলার দিকেও বৃষ্টি কমল না। অত বৃষ্টিতে পরমানন্দ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

'দিদি, আমি ভাবছি এখনই বাড়ি যাই।'

'কেন? তোমার স্ত্রীর শরীর আবার খারাপ হলো নাকি?'

'না। এত বৃষ্টিতে ঘরদোরের কি অবস্থা, তাই ভাবছি।' একটু থেমে আবার বলল, 'নিশ্চয়ই ঘরে জল পড়ছে, তাই ভাবছি চলে যাই।'

ওর বাড়ি আমি গেছি। কাঁচা বাড়ি। তাছাড়া শহরের উপকণ্ঠে। এত বৃষ্টিতে ছেলেমেয়েরা ভিজে গেল কিনা, কে জানে! আমি ওকে বাধা দিলাম না। পরমানন্দ চলে গেল।

মাথায় ছাতা, গায় চৌকিদারের বিরাট রেন-কোট চাপিয়ে সাগরবাবুর কটেজে গেলাম। তবু পায়ের দিকের শাড়িটা বেশ ভিজে গেল। ওকে ওষুধ খাইয়ে বসতে না বসতেই ভীষণ জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে বেশ বৃষ্টির ছাঁট আসছিল বলে জানালাগুলো বন্ধ করে দিলাম। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে বাতাস বইবার জন্য বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। মোটা-বেড কভার সাগরবাবুর গলা পর্যন্ত টেনে দিলাম। পায়ের কাছে শাড়ি ভিজে থাকায় আমারও বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে চেয়ারের ওপর জড়সড় হয়ে বসলাম। একটু গরম চা খেতে পারলে ভাল হতো। একবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চৌকিদারকে ডাকলাম, কিন্তু ও কোন জবাব দিল না। নিশ্চয়ই এই বৃষ্টি আর বাতাসের জন্য শুনতে পায়নি। কি করব? আবার চুপ করে চেয়ারে বসে রইলাম।

চড়েরগড়া পাহাড়ের চারপাশে প্রচুর গাছপালা। এত বৃষ্টি ও বাতাসের জন্য গাছপালাগুলো যেন ভেঙে পড়ছিল। ভীষণ আওয়াজ হচ্ছিল। সাগরবাবু মাঝে মাঝেই চমকে উঠছিলেন। আমি ওর মাথায়-গায় হাত দিতেই উনি আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। আস্তে আস্তে রাত একটু গভীর হলো। বৃষ্টি কমল না, কিন্তু বাতাসের বেগ কমল। একটু স্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু একটু পরেই দারুণ জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সারা ঘরটা আলোয় ভরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের গর্জন। শুধু সাগরবাবু বা আমি নয় সারা ঢেংকানল কেঁপে উঠল। ঐ আওয়াজে উনি ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন। আমি চেয়ার থেকে উঠে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বাচ্চাদের মত দুহাত দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরলেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওর হাত ছাড়াতে পারলাম না। কিছুতেই না, বাধ্য হয়েই ওর বিছানায় ওর পাশে বসলাম, আর অবোধ শিশুর মত উনি আমার কোমর জড়িয়ে ঘুমিয়ে রইলেন।

অসুস্থ হলে অনেকেই শিশুর মত হয়ে যায়। ভয় পায়, কাঁদে। ডাক্তার-নার্সকে রোগীর এই বিচিত্র খামখেয়ালীপনার খেলনা হতে হয়। তা হোক। কিন্তু ডাক্তার-নার্স তো শিশু নয়। তারা অসুস্থও নয়। রোগীর এইসব খামখেয়ালীপনার জন্য ডাক্তার-নার্সের মনে নানারকম প্রতিক্রিয়া হয়। নানারকম অনুভূতির সঞ্চার হয়, জন্ম হয়। সব ডাক্তার নার্সেরই হয়। সে অনুভূতি কারুর ক্ষণস্থায়ী, কারুর দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমার হয়েছিল। সে বিচিত্র অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা জানি না; তবে এখনও ভুলতে পারিনি। জানি না কবে ভুলব।

সাগরবাবু সুস্থ হয়েছেন। ওষুধ চলছে। কিছুদিন চলবে। বেশী ঘোরাঘুরি করা বন্ধ হলেও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন টুকটাক যা কিছু করতে হয় তা পরমানন্দই করে। আমাকে কিছু করতে হয় না। করি না। কদিন ওর ঘরেও যাইনি। কেন যাব? কি প্রয়োজন? আমার প্রয়োজন তো শেষ হয়েছে।

এই কদিন সন্ধ্যার দিকে বারান্দাতেও বসি না। বসলেই সাগরবাবুর কটেজের দিকে দৃষ্টি চলে যায়। বারবার ইচ্ছা করে একটু ঘুরে আসি, দেখে আসি। ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম কটা দিন। ভাল লাগে না। ভীষণ খালি খালি লাগছে। নিঃসঙ্গ লাগছে। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে যেন আমার আর কোন কাজ নেই। প্রয়োজন নেই। কোন দায়িত্ব কর্তব্য নেই। আমি যেন ভরশূন্য হয়ে মহাশূন্যে ভাসছি।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। বেশ রাত হয়েছে। নটা-সাড়ে নটা হবে। হাতের ঘড়িটা হাসপাতাল থেকে এসেই খুলে রেখেছি। রোজ রাখি। পরের দিন সকালের আগে আর ঘড়ি দেখার দরকার নেই। হয় না। তবে ফাঁকা বাস-স্ট্যান্ড দেখেই বুঝতে পারছি নটা-সাড়ে নটা বাজে। কদিন বৃষ্টির পর আজই প্রথম আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে। একটু ম্লান চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

'আসতে পারি?'

চমকে উঠলাম। ভাবতে পারিনি এই সময় এমন করে কেউ আমার ঘরে আসতে অনুমতি চাইবে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম সাগরবাবু।

'আসুন।'

আমি বিছানা থেকে নেমে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসুন।'

সাগরবাবু বসলেন। বুঝলাম উনি একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর জানতে চাইলেন, 'আপনি শুয়েছিলেন?'

মনে মনে বললাম, এখনই শুয়ে পড়ব? ঘুম আছে না কি আমার চোখে? একলা একলা এমন করে রাত কাটাবার জ্বালা আপনি বুঝবেন কি করে? ওসব কথা না বলে মুখে একটা শুকনো হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি আমার কোনদিনই ঘুম আসে না।'

'তাহলে বিশ্রাম করছিলেন নিশ্চয়ই?'

'বিশ্রাম না করে কি করব? কোন কাজ তো নেই।'

'এ-সময় এসে নিশ্চয়ই আপনাকে বিরক্ত করলাম?'

'আপনার কি তাই মনে হচ্ছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

দুজনেই একটু হাসলাম। হাসতে হাসতে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো আমাদের। ওর রোগমুক্তির পর আমি আর কোন খোঁজখবর নিইনি। তাই জিজ্ঞাসা

করলাম, 'শরীর ভাল আছে তো?'

'জ্বর-টর আর হয়নি, তবে কাল ভুবনেশ্বরে গিয়ে শরীরটা বেশ খারাপ লাগছিল।'

অবাক হলাম ওর কথা শুনে। 'সে কি! আপনি ভুবনেশ্বর গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে না বেরুতে বারণ করা হয়েছে?'

'হাঁ।'

'তবে?'

'না গিয়ে উপায় ছিল না।'

আমি জানি, জেনেছি, উনি প্ল্যানিং কমিশনে চাকরি করেন। ওর টেবিলের ওপর কাগজপত্র দেখে বুঝতে পেরেছি উনি কি ধরনের কাজ করেন। সোসিও-ইকনমিক সার্ভের কাজ কদিন বন্ধ থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, হতে পারে না। সুতরাং ভুবনেশ্বর গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত কারণে।

'আপনার স্ত্রীকে আনতে গিয়েছিলেন বুঝি?'

আমার প্রশ্নে সাগরবাবু যেন অবাক হলেন। 'আমার স্ত্রী?'

'তবে কি আমার স্ত্রী?'

'আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করলেন কবে?'

'অসুস্থতার মধ্যে আপনি কোন্ কথা বলতে বাকি রেখেছেন?'

সাগরবাবু একটু শুকনো হাসি হাসলেন। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'মানসীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মানসীকে তো আর কোনদিন পাব না।'

'তার মানে?'

'সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।'

'বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি?'

'না...'

'তবে?'

'ও মারা গেছে।'

সাগরবাবু খুব সহজভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু আমি যেন ইলেকট্রিক শক্ খেলাম। খুব উত্তেজিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবে?'

'অনেকদিন আগে। আমার ছাত্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ে।'

'কি হয়েছিল?'

'প্লেন অ্যাকসিডেন্ট।'

এ-বিষয়ে বেশি আলোচনা না করাই ভাল, উচিত, কিন্তু তবুও নিজেকে সংযত

করতে পারলাম না। 'কোথায় ?'

'কলকাতা থেকে শিলচর যাবার সময়।'

কিছুক্ষণ আমি আর কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। চুপ করে সাগরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম ; উনি মাথা নিচু করে বসেছিলেন। নিশ্চয়ই মানসীর কথা ভাবছিলেন।

'আপনার বাড়ি কি শিলচরে ?'

'হ্যাঁ।'

'মাগো ওখানেই আছেন ?'

'মাগোও নেই।'

আমি আরো অবাক হলাম। 'বাড়িতে কে কে আছেন ?'

'কেউ নেই।'

'ভাই-বোন ?'

মাথা নেড়ে সাগরবাবু বললেন কেউ নেই।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। আমি জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ভাল লাগল না। ইচ্ছা করল না। ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে বারবারই সাগরবাবুর দিকে তাকাচ্ছিলাম।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সাগরবাবু। 'আপনি মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন ?'

'হ্যাঁ।'

'মানসীও মেডিক্যাল কলেজে পড়ত।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই আমার চাইতে সিনিয়র ছিলেন, তা নয়ত জানতে পারতাম।'

একটু থেমে আমি প্রশ্ন করলাম, 'খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?'

'না।'

'এত রাত্তির পর্যন্ত না খেয়ে রয়েছেন ?'

'হোটেলের ঐ একঘেয়ে খাবার খেতে এত তাড়া কি ?'

আমি একটু ভাবলাম। তারপর বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। আমার খাবারও চাপা দেওয়া ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে দুজনের জন্য খাবার সাজিয়ে ডাক দিলাম, 'আসুন, আজ ভাগাভাগি করেই খাওয়া যাক্।'

সাগর উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'অদৃষ্ট ভাগাভাগি করা যায় না ?'

খুব মিহি-মিষ্টি গলায় উনি কথাটা বললেন, কিন্তু তাতেই আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। হাত থেকে মাছের পাত্রটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল আর কি! ভাবতে পারিনি, কল্পনা করতে পারিনি, এমন কথা, এমন প্রস্তাব শুনব। পাথরের মত

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর কথার জবাব দিতে পারলাম না।

সাগর যেন আরও একটু কাছে এগিয়ে এলো। আমি যেন ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। খুব ইচ্ছা করছে একবার ওকে দেখি। দুহাত দিয়ে মুখটা তুলে দেখি। ভাল করে দেখি। একটু আদর করি। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করি। ওকে প্রণাম করি। বলি, সাগর, তোমার হাতে আমাকে তুলে দেবার জন্যই কি ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন?

কিচ্ছু পারলাম না। অনেকক্ষণ চুপ করে ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খেতে বসুন।

সাগর একটিও কথা না বলে চুপটি করে খেতে বসল। আমার পাশে।

খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেল। যাবার সময়েও বলল না। বোধহয় বলতে পারল না। বলার প্রয়োজন বোধ করল না। যা বলেছে, তারপর আর কি বলবে? কিন্তু আমিও কিছু বলতে পারলাম না।

চার

চিত্রলেখার ঘর থেকে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিন্তু কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না। চুপ করে শুয়ে আছি ঠিকই অথচ ভিতরে দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি।

আমার প্রশ্নের জবাব ও দেয়নি। দিতে পারেনি। হাজার হোক মেয়ে। বাঙালী মেয়ে। লজ্জা পেয়েছে নিশ্চয়ই। তাছাড়া সঙ্কোচবোধ করাও স্বাভাবিক। আমার হয়ত অমন করে হঠাৎ ও-কথা বলাও ঠিক হয়নি। আমি কেন বললাম জানি না। ও-কথা বলতে আমি ওর ঘরে, ওর কাছে যাইনি। ভাবিনি এত বড় কঠিন কথা এত সহজভাবে ওকে বলতে পারব। মানসীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মিশেছি। খেলা করেছি, গল্প করেছি, মারামারি করেছি। আস্তে আস্তে আমরা দুজনে বড় হয়েছি কিন্তু তবুও দুজনে দুজনকে দূরে রাখতে পারিনি। কেউই পারতাম না। কোনদিনই না। ও যখন কলেজে পড়ে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ে তখনও না। ওর সঙ্গে সব রকম কথা বলেছি। শুনেছি। কেউই লজ্জা পেতাম না।

পরে আর কারুর সঙ্গে অমন করে মিশতে পারিনি। চাইনি। বুলার সঙ্গে মিশেছি, গল্প করেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল লেগেছে, কিন্তু দুর্বলতা বোধ করিনি। বুলা এলে ভাল লাগত, বুলার কাছে গেলেও ভাল লাগত। ওর হাঁটাচলা-কথাবার্তা। ওর সান্নিধ্যেই আমার ক্ষত-বিক্ষত আহত মন সুস্থ হয়। স্বাভাবিক হয়। ওকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে। বিচ্ছেদ বেদনার তীব্র জ্বালা অনুভব করেছি কিন্তু ওকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিনি। বুলা আমাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেনি তো?

জানি না।

এখানে এসে চিত্রলেখাকে দেখে, ওর সেবা যত্নে মুগ্ধ হয়ে বুলার প্রতি কোন অন্যায় করছি না তো ? আমি বুঝতে পারছি না। বুলা কোন প্রত্যাশা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কি ?

আমি চলে আসার পর ওর মন নিশ্চয়ই কিছুদিন খারাপ ছিল। খুবই স্বাভাবিক। ওর চিঠিতে আমি তার স্পষ্ট আভাস পেয়েছি। আস্তে আস্তে ওর চিঠির সুর পাল্টেছে। ...জানেন সাগরবাবু, আমার মনে হয় আমাদের এই মিষ্টিমধুর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হবে। যেভাবে আমরা মেলামেশা করেছি তাতে অনেক কিছু হবারই সম্ভাবনা ছিল। সুযোগ ছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়ত কিছু হওয়াই উচিত ছিল। কারণ ছিল। বোধহয় দুপক্ষেরই। সে স্মৃতি মধুর হতো নাকি তিক্ত হতো, বলতে পারব না। সম্ভব নয়। তবে আজ মনে হয় ভালই হয়েছে। এখন ম্লান হৃদ্যতার স্মৃতি সারা জীবন উপভোগ করব। আপনিও করবেন। তাই না ?

মানসী আমার জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে রইবে চিরদিন। কিন্তু বুলাকেও ভুলব না। কোনদিনই না। প্রথম প্রথম যখন জ্বর হচ্ছিল তখন ওর কথা খুব মনে হতো। মনে হতো মিসেস রায়ের কথা। তখন তো চিত্রলেখাকে কাছে পাইনি। পরমানন্দের কাছে মাঝে মাঝে ওর ডাক্তারদিদির কথা শুনেছি, তবে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনিনি। শুনতে পাইনি। পারিনি। আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। দেখাও হয়নি। মুখোমুখি দেখা হয়নি। দূর থেকে কয়েকদিন। তাও সন্ধ্যার পর। আবছা আলোয়, আবছা অন্ধকারে ওকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছি। ভালভাবে দেখতে পারিনি। তখন ভাবতে পারিনি, কল্পনা করতে পারিনি ওকে এত কাছে পাব।

প্রথম যখন জ্বর হলো তখন গ্রাহ্য করিনি। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম করেছি। পরমানন্দ বারণ করেছিল। শুনিনি। ডাক্তার দেখাতে বলেছিল। রাজী হইনি। পরে যখন ও চিত্রলেখাকে ডাকল তখন আর আমার মতামত দেবার অবস্থা নেই! জ্বরে বেহুঁস। কোন চৈতন্য নেই। অনেক রাতে জ্বর একটু কমলে বিছানার পাশে একজন মেয়ে ডাক্তারকে দেখে হঠাৎ ভেবেছিলাম মানসী। মানসী যে বহুকাল আগেই সমস্ত হিসাব নিকাশ চুকিয়ে পাড়ি দিয়েছে তা তখন খেয়াল হয়নি। মনে আসেনি। আমি নিশ্চয়ই ওকে মানসী বলে ডেকেছি, হুকুম করেছি, বকাবকি করেছি। হয়ত আরো কিছু।

অসুখ হলে আমার ভীষণ ভয় করে ছেলেবেলা থেকেই। কেন জানি না। অসুখ করলে একা থাকতে পারি না। আগে আগে অসুখ করলে মাগোকে আমার কাছে আটকে রাখতাম। কোন কাজকর্ম করতে দিতাম না। রান্না-বান্নার জন্য মাগোকে উঠতেই হতো। তখন মামা এসে বসতেন আমার কাছে। মামা অফিসে যাবার পর মাগোকে আমার কাছ থেকে উঠতে হলে মানসীকে ডিউটি দিতে হতো। একটু বেশি জ্বর-টর হলে তো মামার অফিস যাওয়া, মানসীর স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ হতো। এবার দেখলাম আমার সে-অভ্যেস এখনও বদলায়নি। সারাদিন

পরমানন্দকে কাছে রাখতাম। ঘরের বাইরে যেতে দিতাম না বললেই চলে। পরমানন্দও আমাকে একলা রেখে কোথাও যেত না। চিত্রলেখাকেও তাই। সকালে উঠেই ওকে হাসপাতালে যেতে হতো। যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো। কিন্তু আমার জন্য ওর রাত্রে বিশ্রাম হতো না। তখন আমি ওসব জানতে চাইতাম না। ওর সুখ-দুঃখের চাইতে আমার প্রয়োজনটাই তখন বড় মনে হতো।

প্রথম দিন রাত্রের কথা মনে নেই। পরের দিন সন্ধ্যায় চিত্রলেখাকে আমার জন্য অত ঝামেলা সহ্য করতে দেখে ভীষণ লজ্জিত হলাম। এক হাতে সেবা-যত্ন চিকিৎসা করা সহজ নয়। পরমানন্দ যাবার পরই ও ঘরদোর গুছিয়ে আমার বিছানা পরিষ্কার করে আমার টেম্পারেচার দেখল, স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করল, পেট টিপল, জিভ দেখল, পায়ের হাঁটুর জয়েন্টগুলো টিপল। আরো কত কি! আমাকে ওষুধ খাওয়ালো। আমি এতক্ষণ কোন কথা বলিনি। চুপ করে ওর কথা শুনেছি। এবার একটু বিশ্রাম করার জন্য চিত্রলেখা পাশের চেয়ারে বসল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'কেন?' চিত্রলেখা সত্যি অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'আমার জন্য আপনাকে কত কষ্ট করতে হচ্ছে অথচ...'

'ওসব কথা এখন থাক্।'

'আপনাকে কষ্ট দেবার কোন অধিকার আমার নেই, কিন্তু...'

এবার ও আমার কথা শেষ করতে দিল না, 'ডাক্তারের কর্তব্য আমি করেছি। রোগী হিসাবে এটুকু আপনার ন্যায্য প্রাপ্য।'

রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও আমি হাসলাম। আপন মনে আবৃত্তি করলাম, 'আমার প্রাপ্য।'

'নিশ্চয়ই।'

আবার হাসলাম। একটু চুপ করে রইলাম।

'আচ্ছা কাল রাত্রে আমি খুব চেঁচামেচি বকাবকি করেছি, তাই না?'

'কি করে জানলেন?'

'অসুখ হলেই আমি সবাইকে জ্বালাতন করি।'

'সব ডাক্তার-নার্সকেই এসব জ্বালাতন সহ্য করতে হয়।'

আমি কচি বাচ্চা নই। আমি জানতাম, আমার জন্য কোন ডাক্তারই এমন জ্বালাতন সহ্য করবে না, করতে পারে না। কেন করবে? তার কি গরজ? রোগীর চিকিৎসা করা এক কথা আর তার দেখাশুনা সেবা-যত্নের ভার নেওয়া অন্য কথা। তাছাড়া চিত্রলেখা যে দরদ দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে মনে-প্রাণে আমার চিকিৎসা আর সেবা-যত্ন করেছে তার তুলনা হয় না। আমি মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে ভেবেছি ও এমন করে কেন আমাকে দেখছে, আমার সেবা করছে। উত্তর পাইনি। তবে

ওকে দেখে দিনের পর দিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, সন্দেহ হয়ে
কোথায় যেন ও আঘাত পেয়েছে। কেউ যেন ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।

চিত্রলেখার বয়স বেশী নয়। আমার চাইতে একটু ছোটই হবে। টল টল কর
ওর যৌবন। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন মধু ঝরছে। মৃগনাভী হরিণীর মত ও তো এখ
পাগল হয়ে ছুটবে। মাতাল হয়ে ঘুরবে। ওর গন্ধ, স্পর্শ, চাঞ্চল্যে আর সবা
মদির হয়ে উঠবে। কিন্তু চিত্রলেখা কেমন যেন নির্লিপ্ত! উদাস। নির্বিকার। আ
অবাক হয়েছি, বহুদিন অবাক হয়েছি ওর নির্বিকার নির্লিপ্তভাব দেখে।

একবার নয়, দু বার নয়, এক-দু দিন নয়, দিনের পর দিন ওকে আ
ঘনিষ্ঠভাবে, নিবিড়ভাবে পেয়েছি। নানা সময়ে পেয়েছি। গোধূলির মিষ্টি আলোয়
রাতের অন্ধকারে, দারুণ বর্ষার দিনে, ঝড়ের রাতে। কখনো ঘুমের মধ্যে, কখন
তন্দ্রায়। জেগে জেগেও ওর মৃগানাভীর সঙ্গ পেয়েছি। দুর্বল শরীরেও চাঞ্চল্য বো
করেছি।

'ডাক্তার!'

'বলুন।'

'মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'মাথা টিপে দেব?'

'আপনার কষ্ট হবে না?'

ডাক্তার কেমন একটু হাসল। আপন মনে ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে বললো
'কষ্ট পাব বলেই তো এসেছি।'

আমি ওর হাসি, ওর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। তখন শরীর বা মন কোনটা
তা চায়নি। আমি চুপ করে গেছি। চোখ বুজে শুয়ে থেকেছি। চিত্রলেখা চেয়ারটাকে
আমার চৌকির পাশে টেনে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার কপালে। মাথায়
বেশ লাগত। মাথায় যন্ত্রণা কমত কিনা জানি না; তবে মনের যন্ত্রণা, অপরিতৃ
মনের ব্যথা নিশ্চয়ই কমত।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর ঘুমিয়ে পড়েছি। অঘোরে ঘুমিয়েছি। ক্ষিদে পেলে
ঘুম ভাঙেনি। চিত্রলেখা ঘুম থেকে তুলেছে।

'সাগরবাবু! সাগরবাবু!'

ঘুমের মধ্যেই একবার চোখ মেলেছি। দেখেছি ও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার মাথা
হাত বুলোতে বুলোতে ডাকছে, 'সাগরবাবু উঠুন।'

আমি তবুও উঠিনি। এবার ওর ডাকাডাকিতে চোখ মেলে দেখেছি চিত্রলেখ
আমার পাশে বসে গায় হাত দিচ্ছে। ঘুমের ঘোরে ওর কোলে হাত রেখেছি। হাত
হাত রেখেছি। বলেছি, 'আজ আর কিছু খাব না।'

'না, না, তাই কি হয়?'

'সত্যি খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও একটু খেতে হয়।'

চিত্রলেখা হরলিক্সের গেলাসটা পাশের টেবিলে রেখে আমাকে তুলেছে। মাথার তলায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে তুলেছে। আমার মুখের সামনে হরলিক্সের গেলাস তুলে ধরেছে। নিন আস্তে আস্তে খেয়ে নিন।'

আমি এক চুমুক খেয়েই মাথা কাত করেছি। ওর হাতে, গলার কাছে, বুকের ওপর। অসুস্থতার মধ্যে ঘুমের ঘোরেও আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছি। নতুন অনুভূতির রসে মনটা ভিজে গেছে কিন্তু চিত্রলেখার কোন পরিবর্তন কোন চাঞ্চল্য দেখতে পাইনি। কোনদিন পাইনি। মনে হয়েছে ও আমাকে কাছে নিয়েও যেন কত দূরে থাকত। হাতের পাশ থেকেও ও যেন দূরের আকাশে ভেসে বেড়াত। মহাশূন্যে বিচরণ করত।

ডাক্তারকে দেখতে ভারি সুন্দর। মুখটা ভারি মিষ্টি। কমনীয়। ও আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে যখন স্টেথো দিয়ে আমার বুক-পিঠ পরীক্ষা করত, তখন আমি এক দৃষ্টিতে ওকে দেখতাম। রোজ। না দেখে পারতাম না। দেখতে দেখতে মনে তৃপ্তি পেতাম। শান্তি পেতাম। আর? নতুন আশায় মন ভরে যেত।

মানসী চলে গেছে। আর কোনদিন ওকে পাব না। ওর গন্ধ স্পর্শ আর কোনদিন পাব না। অনেকদিন পাই না কিন্তু চিত্রলেখার গন্ধ-স্পর্শে পুরোনো দিনের স্বাদ পাচ্ছি। পেয়েছি।

'কি দেখছেন?' চিত্রলেখা হঠাৎ জানতে চাইল।

'অনেক কিছু।'

'তার মানে?'

'অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ--অনেক কিছুই দেখছি।'

স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করতে করতে আমার দিকে তাকাল। 'কার? আমার না আপনার?'

'হয়ত দুজনেরই।'

'আমাকে নিয়ে ভাববেন না।'

'কেন?'

'কেন?' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো ডাক্তার। একটু থামল। 'আমাকে নিয়ে কেউ ভাবে না। ভাববে না। আমিও ভাবি না।'

এসব কথা আমি বলতাম না। বলতে চাইনি। কিন্তু ডাক্তারকে যত দেখেছি তত বেশি মনে হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে আমার চাইতেও ওর অতীত ইতিহাস দীর্ঘ ও দুঃখের। আমার মনে অনেক ব্যথা, বেদনা। অনেক দুঃখ, অনেক চোখের জল। ডাক্তারের জীবনে যেন আরো কিছু, অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, চাপা পড়ে আছে। ওর চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায়।

'একদিন আমিও আমাকে নিয়ে ভাবতাম না।'

আমার কথায় ডাক্তার হাসল। 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা ?'

আমি আর ওর কথার জবাব দিইনি। কি দেব ? দেবার কি দরকার ? ও যেভাবে আমাকে দেখত, সেবা-যত্ন করত, চিকিৎসা করত তাতে আমি বেশ বুঝতে পারতাম ওর মনটা কত নরম কত দুঃখের। স্পষ্ট করে বুঝতে পারতাম আমার সেবা করে ও যেন ওর দুঃখের ভার লাঘব করার চেষ্টা করছে। অতীতের কোন ব্যথা-বেদনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

চিত্রলেখা এখানে না থাকলে আমার কি হতো জানি না। একা পরমানন্দ নিশ্চয়ই সামলাতে পারত না! মারা যেতাম না ঠিকই কিন্তু হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে পড়ে থাকতে হতো দু সপ্তাহ। না, না, ওসব ভাবার দরকার নেই।

পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে বসে আছি। ভাবছি। ওর ঘর থেকে ফেবার পর থেকেই ভাবছি। ঘুম আসছে না। ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে বেশ অন্ধকার। বেশ রাত হয়েছে। বোধহয় সাড়ে এগারোটা বারোটা। হঠাৎ টেবিলের ওপর নজর পড়ল। ফ্লাস্কটা রয়েছে। পরমানন্দ যেভাবে রেখে গেছে ঠিক সেইভাবেই রয়েছে। ঘুমুতে যাবার আগে ঐ ফ্লাস্কের দুধ খাবার কথা। রোজ। দুধ খাবার দশ-পনেরো মিনিট পরে একটা ট্যাব্‌লেট খেতে হয়। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই। ভাবি, ঘুমুবার আগে দুধ আর ট্যাব্‌লেট খেয়ে নেব। হয় না! ঠিক ঘুম আসবার সময় ভুলে যাই। ঘুমিয়ে পড়ি। চিত্রলেখা এসব জানে। ও নিজে দুধ আর ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছে বেশ কয়েকদিন। আজও দুধ খেতে ইচ্ছা করছে না। ভাল লাগছে না। নিজের জন্য বেশি ঝুট-ঝামেলা ভাল লাগে না। সারা মাস পরিশ্রম করে রোজগার করা সম্ভব কিন্তু নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরি করতে বা এক মুঠো ভাত ফুটিয়ে নিতে বড় বিষাক্ত লাগে।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। অসুখের সময় দুসপ্তাহ এই দরজা সারারাত খোলা থাকত। চিত্রলেখা অনেক রাত পর্যন্ত আমার এখানে থাকত। একদিন কি দুদিন সারারাত থেকেছে। চিত্রলেখা যাবার পর চৌকিদার চেয়ার নিয়ে দরজার গোড়ায় থাকত। এখন আবার দরজা বন্ধ করে শুতে হয়।

'কে ?' মনে হলো কে উঁকি দিল।

'আমি, চৌকিদার।' বোধহয় সার্কিট হাউসের দিকে যেতে যেতেই উত্তর দিল।

বোধহয় ঘরে আলো জ্বলছে বলে দেখে গেল। দেখে গেল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা। ওর উৎকণ্ঠা চিন্তা দেখে হাসি পেল। কই ডেরাডুনে এফ. আর. আই. এর গেস্ট হাউসে তো কেউ এমন করে দেখে যায়নি। কত রাত কাজ করতে করতে আলো জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু চৌকিদার আমার খবর নিতে আসেনি। আমি অসুস্থ হবার আগেও এই বুড়ো চৌকিদার এমনি করে আমাকে দেখত। বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করতে দেখলে বারণ করত। আজ তো কিছু বলল না ?

কে এলো?

চিত্রলেখা? এত রাত্রে? চৌকিদারের কাছে খবর পেয়েই এলো?

আমি কিছু ভাবনা-চিন্তার অবকাশ পেলাম না। ও প্রায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে ফ্লাস্কের দুধ একটা কাঁচের গেলাসে ঢেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, খেয়ে নিন।'

আমি একবার ওর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিছু না বলে দুধের গেলাসে চুমুক দিলাম। দুধ খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের গেলাস হাতে তুলে দিল। দুধের গেলাসটা টেবিলে রেখে ট্যাব্‌লেটটা তুলে নিলাম।

'ট্যাব্‌লেটটা খেয়ে নিন।'

নিলাম। কিছু না বলেই খেয়ে নিলাম। ও জলের গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, 'শুয়ে পড়ুন। আলো অফ্ করব।'

'আপনি যান। আমি একটু পরে শোব।'

'আর পরে নয়। এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে।'

'অনেক রাত হয়েছে বললেই কি ঘুম আসে?' একটু থেমেই আবার বললাম, 'এতো রাত হলো অথচ আপনার তো ঘুম আসেনি?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বললাম।

'চৌকিদার হয়ত কিছু ভাবছে। আমি যাই।'

ডাক্তার টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা অফ্ করে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে রইলাম। ঘুম এলো না। ডাক্তার কি ঘুমুচ্ছে? একবার দেখতে পারলে হতো। ওকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছা করছে। একবার যাব? ঘুরে আসব ওর ঘর? যদি চৌকিদার দেখতে পায়? জানতে পারে? তাহলে তো সর্বনাশ! মহা কেলেঙ্কারি হবে। সকালে আর কারুর কাছে মুখ দেখান যাবে না। চিত্রলেখাও মুখ দেখাতে পারবে না।

না, না, তা হয় না। আমার একটা মর্যাদা আছে। সুনাম আছে। সবাই আমাকে ভাল মনে করে। ভাল বলেই জানে। সামান্য একটু ভাবাবেগের জন্য এই সুনাম, এই মর্যাদা নষ্ট করা উচিত? নাকি সম্ভব?

অসম্ভব। কল্পনাতীত।

কিন্তু ওকে দেখতে যে-বড্ড বেশি ইচ্ছা করছে। দারুণ ইচ্ছা করছে! ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে। এক মুহূর্ত দেরি সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা চৌকিদার শুয়ে পড়েনি তো? ও তো মাঝরাতের পরেই সার্কিট হাউসের বড় ড্রইংরুমের দরজার ধারে বিছানা করে শুয়ে পড়ে। ঘুমোয়। রোজই ঘুমোয়। আমার অসুখের সময় আমার কটেজের দরজায় থাকত। ঘুমিয়ে থাকত। তবে মাঝে মাঝেই উঠত। আমাকে দেখত। জিজ্ঞাসা করত কিছু দরকার আছে কিনা। ওটা অভ্যাস। দরকার মত ঘুমুতে পারে, উঠতে পারে। এখন ঘুমুচ্ছে কি!

উঠতে গিয়েও পারলাম না। একবার নয়, অনেকবার। কিছুতেই পারলাম না। চিত্রলেখার জন্যই পারলাম না। আমার ঢেংকানলের কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমার যাবার পালা। আমি চলে যাবার পর লোকে নিন্দা করলে কিছু আসে যায় না। ওকে তো এখানে থাকতে হবে। চাকরি করতে হবে। আমি এমন কিছু করতে পারি না, যার জন্য ওর কোন ক্ষতি হয়।

উঠলাম না। শুয়েই রইলাম। ঢেংকানল ছাড়তে হবে। এবার কিছুদিন কটকে কাজ করতে হবে। তারপর ভুবনেশ্বরে। ঢেংকানল ছাড়তে, ডাক্তারকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। মানসী যেন নতুন করে আমার কাছে এসেছে। ধরা দিয়েছে। ও যেন কটি বছর লুকিয়ে ছিল। আমাকে পরীক্ষা করছিল। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ও খুশি হয়েছে। আমার তীব্র ভালবাসার টানে আবার আমার কাছে এসেছে। ও যদি আবার লুকিয়ে পড়ে তাহলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যাব। এই এত বড় পৃথিবীতে আর একলা থাকা সম্ভব নয়। একলা একলা সব দুঃখ সহ্য করলাম, করছি কিন্তু আনন্দের অংশীদার হবার সৌভাগ্য হলো না। হচ্ছে না।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই মনে হলো রাত ফুরিয়ে আসছে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। ঘড়িটা দেখলাম। পাঁচটা বাজে। চৌকিদার নিশ্চয় ঘুমুচ্ছে এখন আমি উঠতে পারি। এখনও অন্ধকার আছে ঠিকই তবে অন্ধকারও ফিকে হয়ে এসেছে। এখন কেউ আমাকে দেখলেও কিছু ভাবতে, সন্দেহ করতে পারবে না। মনে করবে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি।

সামনের দিক থেকে দরজাটা বন্ধ করে সার্কিট হাউসের দিকে এগুলাম। বারান্দায় উঠেই দেখলাম চৌকিদার মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।

বেশি দূর এগুতে হলো না। চৌকিদারকে পিছনে ফেলে কয়েক পা যাবার পরই দেখি ডাক্তার। ও সন্ধ্যেবেলায় এই বেতের চেয়ারে বসে থাকে জানি, কিন্তু এখন?

'এলেন?' খুব মিষ্টি শান্ত গলায় ডাক্তার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'এই শরীর নিয়ে সারারাত জেগে রইলেন?'

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাক্তার আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, ঘরে আসুন।'

আমি ওকে অনুসরণ করে ঘরে গেলাম। বসলাম। দুটো বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে ওর বিছানায় বসলাম। ডাক্তার সামনের চেয়ারে বসল। মুখ নিচু করে বসল।

'সারারাত বারান্দায় ছিলেন?'

'না।'

'এত ভোরে বারান্দায় গেলেন?'

'জানতাম, আপনি আসবেন।'

'জানতেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর কি জানেন?'

ও জবাব না দিয়ে কি যেন ভাবছিল। ভাবল। অনেকক্ষণ ধরে।

'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি আপনার কথা।'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ?'

'আমার কথা কি ভাবছেন?'

'ভাবছি না জেনে-শুনে আপনার কি ক্ষতি করলাম?'

'ক্ষতি?'

'ক্ষতি বৈকি।'

আমি হাসলাম।

'হাসবেন না সাগরবাবু। সত্যি ক্ষতি করলাম কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ক্ষতি করতে চাইনি...'

কথাগুলো শেষ হলো না। শেষ করতে পারলো না। গলার স্বরটা বন্ধ হয়ে এলো।

'না, না, আপনি ক্ষতি করবেন কেন?'

'ক্ষতি করেছি নিশ্চয়ই। তা না হলে আপনার চোখের ঘুম কে নিল কেড়ে?'

'সে অপরাধে তো আমিও অপরাধী।'

বাইরের আকাশ একটু একটু ফর্সা হচ্ছে। ঘরের মধ্যে এখনও বেশ আবছা অন্ধকার। তবুও আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডাক্তার কাঁদছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে গেলাম ওর কাছে। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বললাম, 'কাঁদছেন কেন? কাঁদবেন না।'

ওর চোখের জল বন্ধ হলো না। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আমি যে একজনকে নিয়ে ঘর করেছি। আমি তো আর...'

আর পারল না। আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমিও আর পারলাম না। দুহাত দিয়ে ওকে টেনে নিলাম। 'আপনি তো একজনের দ্বারা পরিত্যক্ত, আর আমি যে সবার দ্বারা পরিত্যক্ত!'

'আমিও। আজ আর আমারও কোথাও স্থান নেই।'

'আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করেও বলছেন কোথাও স্থান নেই?'

'চা করব?'

'না।'

'কেন?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'কেন?'

'আগে আসল প্রশ্নের জবাব দিন।'

'কোন প্রশ্নের?'

'আমি কি ঢেংকানল ছেড়ে চলে যাব?'

'কেন? আমাকে সহ্য হচ্ছে না?'

'ভীষণ অসহ্য লাগছে।'

দুজনেই হাসলাম। প্রায় একসঙ্গেই।

'সত্যি চলে যাবেন?' আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করল।

'আজকের মধ্যে কটকে যাবার কথা, কিন্তু ইচ্ছা করছে না।'

'এখান থেকে যাতায়াত করলে চলবে না?'

'চলবে।'

'তাহলে যাবেন কেন?'

'যাব না।'

ডাক্তার আবার মুখ নিচু করল। আমি আলতো করে ওর মুখ তুলে ধরে দেখলাম দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে কাঁদছে। আমি আমার শেষ প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলাম, 'যাব না?'

ও শুধু মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চীৎকার করলাম, 'ডাক্তার।'

'আপনি আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবেন না তো?'

আনন্দে খুশিতে, উত্তেজনায় হঠাৎ বলে ফেললাম, 'শেষে কি ছেলেমেয়েদের কাছে বকুনি খাওয়াবে?'

লজ্জায় ডাক্তার আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকোবার চেষ্টা করল। পারল না। হঠাৎ এক ঝলক প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'চা করি।'

'কর।'